সুদ
সমাজ
অর্থনীতি

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

সুদ
সমাজ
অর্থনীতি

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো

www.icsbook.info

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৯৯
এপ্রিল ১৯৯২
শাওয়াল ১৪১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
পৌষ ১৪১৯
ডিসেম্বর ২০১২
সফর ১৪৩৪

প্রকাশনায়
ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো
আল-রাজী কমপ্লেক্স (৭ম তলা)
১৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫১৫৬১৬, ফ্যাক্স : ৯৫১৫৬১৭
ই-মেইল : ierbbd@gmail.com
ওয়েব : www.ierb-bd.org

সত্ত্বাধিকার
লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

কভার ডিজাইন
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : টাকা ৩০০.০০ US $ 25

SUD SHAMAJ AURTHONITI (Interest Society Economy), Second Edition, November, 2012. Written by Prof. Muhammad Sharif Hussain and Published by Islamic Economics Research Bureau, Al-Razi Complex, 6th Floor, 166 Shaheed Syed Nazrul Islam Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone- 9515616, Fax-88-02-9515617, E-mail- ierbbd@gmail.com, Web : www.ierb-bd.org

www.icsbook.info

সুদমুক্ত অর্থনীতি
কামনা ও সাধনা যাঁদের
তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম সংস্করণ

ভূমিকা ০৮

প্রকাশকের কথা ০৯

লেখকের কথা ১০

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভূমিকা ১৩

চেয়ারম্যানের কথা ১৫

প্রকাশকের কথা ১৬

মুখবন্ধ ১৭

প্রথম খণ্ড

সুদ ও ক্রয়-বিক্রয়

প্রথম অধ্যায় : আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ **২৫–৫৪**

সূরাতুর রূম : (আয়াত-৩৯) ২৬

সূরাতুন্নিসা : (আয়াত-১৬০-১৬১) ৩৫

সূরাতু আলে-ইমরান : (আয়াত-১৩০-১৩৪) ৪১

সূরাতুল বাকারাহ : (আয়াত-২৭৫-২৮১) ৪৬

সুদ হারাম করার কারণ ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুন্নাহর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ **৫৫–৮৪**

ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত হাদীসের শ্রেণী প্রকরণ ৫৫

ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীস ৫৭

সুদ সংক্রান্ত হাদীস ৭১

সাধারণ নির্দেশনা সংক্রান্ত হাদীস ৮০

সুদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস ৮২

সুদের ফলাফল ও পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস ৮২

তৃতীয় অধ্যায় : অপরাপর ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ **৮৫–৯১**

অপরাপর ধর্মের দৃষ্টিতে সুদ ৮৫

ইহুদী ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ৮৬

খৃস্টান ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ৮৮

হিন্দু ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ৮৯

বৌদ্ধ ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ ৮৯

হাম্মুরাবি মতবাদে সুদ নিষিদ্ধ ৮৯

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ ৯০

প্ল্যাটো ৯০

www.icsbook.info

এ্যারিস্টোটল	৯০
থমাস একুইনাস	৯০
মিসাব্যু	৯১
অন্যান্য দার্শনিক	৯১
চতুর্থ অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা	**৯২–১৩২**
বাই বা ক্রয়-বিক্রয়	৯২
ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক শর্ত	৯৪
ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান	৯৬
সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়	৯৬
অসমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়	১১৪
বাই-এর আওতা ও পরিধি	১১৮
মুনাফা বা লাভ	১১৯
মুনাফার অর্থ ও সংজ্ঞা	১১৯
মুনাফার উৎস উৎপাদন	১২০
উৎপাদন কাকে বলে	১২০
বিনিয়োগ কাকে বলে	১২১
বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য	১২৩
লোকসান হয় কেন	১২৩
মুনাফার বৈশিষ্ট্য	১২৪
মুনাফার সীমা	১২৬
ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণীবিন্যাস	১২৯
ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার গুরুত্ব	১৩০
পঞ্চম অধ্যায় : রিবা বা সুদ	**১৩৩–২৬৭**
জাহিলী যুগে রিবা	১৩৩
রিবার অর্থ, সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য	১৩৯
রিবার আভিধানিক অর্থ	১৩৯
রিবার পারিভাষিক অর্থ	১৪৫
রিবার সমন্বিত সংজ্ঞা	১৪৫
রিবার শ্রেণীবিন্যাস	১৪৭
আল-রিবা অর্থ	১৫৯
সুদের বৈশিষ্ট্য	১৬৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্ভূত রিবা	**১৬৮–১৯৬**
বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা	১৬৮
মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা	১৯১
নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা	১৯২
এক নজরে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের তুলনা	১৯৫

www.icsbook.info

দ্বিতীয় খণ্ড

সুদের কুফল

ভূমিকা ১৯৯

প্রথম অধ্যায় : সুদের নৈতিক ও সামাজিক কুফল ২০৬–২১০

সুদ লোভ ও কৃপণতা সৃষ্টি করে ২০৬

সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ২০৭

সুদ নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে ২০৮

সুদ একটি নিদারুণ জুলুম ২০৯

সুদ ঋণের ভারে জর্জরিত করে ২১০

সুদ জীবনী শক্তির ক্ষয় ও কর্মক্ষমতা হ্রাস করে ২১০

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুদের অর্থনৈতিক কুফল ২১১–২৬৩

উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব ২১১

সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের ওপর ২১১

বিনিয়োগের ওপর ২১৯

উৎপাদনের ওপর ২৩১

বন্টন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব ২৩৬

স্থিতিশীলতার ওপর সুদের প্রভাব ২৪৫

ভোগের ওপর সুদের প্রভাব ২৬২

তৃতীয় অধ্যায় : সুদের রাজনৈতিক কুফল ২৬৪–২৭০

সুদ রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে ২৬৪

সুদ সমাজ কল্যাণধর্মী কাজে বাধা সৃষ্টি করে ২৬৫

জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণ পাওয়া যায় না ২৬৬

সুদ ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে ২৬৯

পঞ্চম অধ্যায় : সুদের আন্তর্জাতিক কুফল ২৭১-২৭৯

সুদ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সমস্যা সৃষ্টি করে ২৭১

সুদ ঋণ-দাসত্ব প্রথার জন্ম দেয় ২৭৩

সুদ দাতা দেশের স্বার্থ হাসিল করে ২৭৭

সুদ সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও বিলাসিতা বাড়িয়ে দেয় ২৭৮

সুদ আন্তর্জাতিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে ২৭৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২৮০–২৯৬

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ২৮০

মন্তব্য ২৯১

পরিশিষ্ট-১ : ব্যাংকিং সংকটের তালিকা ২৯২

পরিশিষ্ট-২ : অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার তালিকা ২৯৪

www.icsbook.info

প্রথম সংস্করণ

ভূমিকা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন রচিত "সুদ সমাজ অর্থনীতি" বইটির পাণ্ডুলিপি পড়লাম। আমার মতে, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের ওপর এত বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে সুদের বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে এর নৈতিক ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ যুক্তিসহ চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের গতিকে শ্লথ করে দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের হাতিয়ার হয়ে এই সুদ সমাজের ভিতরে ও বাইরে কিভাবে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে তার একটি অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে এই বইতে।

আসলে এর বিপরীত কোন ফলাফল আশা করাটাই ছিল অবাস্তব। কেননা ১৪ শত বছর পূর্বেই আল-কুরআনে "রিবা" সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বইটির আলোচনা থেকে দুটো জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ (ক) উক্ত "নির্দেশ" শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য এটা মনে করা সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক হবে এবং (খ) সুদের কু-প্রভাব থেকে সমাজ তথা দেশকে মুক্ত করার জন্য কেবলমাত্র অর্থনীতিবিদরাই দায়িত্ব বহন করবেন তাও হবে অযৌক্তিক। রিবামুক্ত অর্থনীতি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পূর্বশর্ত, এই সত্যটি আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যত তাড়াতাড়ি খোলা মন নিয়ে উপলব্ধি করতে পারব ততই মঙ্গল।

তবে, সুদের আর্থ-সামাজিক কুফলসমূহ সকল সচেতন মহলের সামনে তুলে ধরা উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক ধাপ মাত্র। এগিয়ে যেতে হবে আরও অনেক দূর। সুদের কার্যকরী বিকল্প "লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কারবার" পদ্ধতি দক্ষতা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতার সাথে চালু করতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেখানে যেখানে এই পদ্ধতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেখানকার গবেষণালব্ধ ফলাফল সকল সচেতন ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রায়োগিক গবেষণা চালাতে হবে।

বইটির বহুল প্রচারের মাধ্যমে এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি হোক এই কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হামিদ
ভাইস চ্যান্সেলর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া
মাঘ ২৬, ১৩৯৮
শাবান ০৪, ১৪১২
ফেব্রুয়ারী ০৯, ১৯৯২

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইনের "সুদ সমাজ অর্থনীতি" নামক বইটি আমাদের প্রকাশনা তালিকায় এক অনন্য সংযোজন। বইটি সুদের ওপর বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাপক চিন্তা, গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। ঈমান-আকীদা ও আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের অভিশাপ যে কত ভয়াবহ তা অত্যন্ত নিখুঁত ভাষায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। আমরা আশা করি সম্মানিত পাঠকগণ এ বই থেকে সুদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানতে পারবেন। আমাদের এ প্রকাশনাটি ছাত্র, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অধ্যাপক শরীফ হুসাইনের এ মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশের জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন অর্থ যোগান দেয়ায় এর প্রকাশনা সম্ভবপর হলো। আমরা ব্যুরোর পক্ষ থেকে তাই ব্যাংক ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বই পাঠে উপকৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেব। আল্লাহ পাক সকলের অবদান কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা
মাঘ ২৬, ১৩৯৮
শাবান ০৪, ১৪১২
ফেব্রুয়ারী ০৯, ১৯৯২

মীর কাসেম আলী
চেয়ারম্যান
ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো
ঢাকা।

www.icsbook.info

লেখকের কথা

সর্বপ্রথম পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি সুদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ফলাফল সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা এবং তা প্রকাশ করার তৌফিক দিয়েছেন।

বস্তুতঃ ইসলামের প্রভাবেই আরবের অসভ্য জাতি একদিন মানবতাকে অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের পথ দেখিয়েছিল; গুরুর আসনে বসে তারা ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছিল। ইসলাম-পরবর্তী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং স্পেন-করডোভার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসই এর জ্বলন্ত সাক্ষী। কিন্তু শত শত বছরের রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম জাতিকে তার আদর্শ থেকে কেবল দূরে সরিয়েছে তাই নয়, বরং এই মহান আদর্শের সৌন্দর্যকেও বিস্মৃত করে দিয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এর স্বার্থেই ইসলামী বিধি-বিধানের সত্যতা, কার্যকারিতা ও এর কল্যাণধর্মিতা সম্পর্কে নানা সংশয় ও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে।

এমনি একটি বিষয় হচ্ছে সুদ। ইসলামী শরীয়তে হারাম ঘোষিত কাজের মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা সবচেয়ে বেশী কঠোর। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে সুদ আজ সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে ছেয়ে ফেলেছে। পুঁজিবাদের প্রবক্তাগণ তাদেরই স্বার্থে সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করে চলেছে। এসব প্রশ্ন ও মন্তব্যের ধরন হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

- ইসলাম যে সুদ হারাম করেছে তা তৎকালে আরবে প্রচলিত সুদ; পরবর্তীকালের সুদ সেই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়;
- ইসলাম কেবল ভোগ্য ঋণের ওপর সুদের লেনদেনকে নিষিদ্ধ করেছে; উৎপাদনশীল ঋণের সুদকে ইসলাম হারাম করেনি;
- কুরআন মজীদ শুধুমাত্র চক্রবৃদ্ধি হারের সুদকে হারাম করেছে, সরল সুদকে নয়;
- ইসলাম উচ্চ হারের (usury) সুদকে হারাম করেছে, নিম্ন হারের সুদকে (interest) হারাম করেনি;
- ইসলাম মহাজনী সুদকে হারাম করেছে, আধুনিককালের ব্যাংকে প্রচলিত সুদকে নিষিদ্ধ করেনি এবং
- আধুনিককালে সুদ ছাড়া অর্থনীতি চলতে পারে না ইত্যাদি।

আলহামদু লিল্লাহ্, বিগত কয়েক দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদেশী গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত হবার পর মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলিম গবেষকগণ ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করছেন। সুদ,

www.icsbook.info

যাকাত তথা ইসলামী অর্থনীতির ওপরও ব্যাপক গবেষণা চলছে। এসব মনীষীদের গবেষণায় দেখা যায়, ইসলাম কোন বিশেষ ধরনের সুদকে হারাম করেনি বরং সকল প্রকার সুদকেই নিষিদ্ধ করেছে; সুদের হার উচ্চ হোক বা নিম্ন হোক, চক্রবৃদ্ধি সুদ হোক বা সরল সুদ হোক, ইসলামে সব সুদই হারাম। গবেষকগণ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তদানীন্তন আরবে কেবল ভোগ্য ঋণের সুদই চালু ছিল তা নয়, বরং বাণিজ্যিক ঋণ তথা উৎপাদনশীল ঋণের ওপরও সুদের প্রচলন ছিল। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে নবী (সাঃ) সুদকে হারাম ঘোষণার সাথে সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের পাওনা যাবতীয় সুদ ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আব্বাসের (রাঃ) নিকট থেকে বনু সাকিফ গোত্র যে ঋণ নিয়েছিল তা ভোগের জন্য নয়, বরং ব্যবসার উদ্দেশ্যেই নিয়েছিল। রাসূল (সা:) সে সুদকেও নিষিদ্ধ করেছেন।

গবেষকগণ এটাও প্রমাণ করেছেন যে, মহাজনী সুদী কারবার আর আধুনিক ব্যাংকের সুদী কারবারের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই; বরং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মহাজনী সুদের তুলনায় আধুনিক ব্যাংকের সংগঠিত সুদ অনেক বেশী ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক।

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থনীতি চলার জন্য ইসলাম যে পথ দেখিয়েছে, গবেষকগণ তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরাম, ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও গবেষকগণ সুদ হারাম হবার কারণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও গভীর অধ্যয়ন করেছেন। এরা সুদকে মানবতার জন্য একটি জঘন্য অভিশাপরূপে চিহ্নিত করেছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণও সুদের মারাত্মক ধ্বংসকারী ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছেন। এ সব অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের আলোচনায় সুদের যে মারাত্মক কুফলের উল্লেখ করা হয়েছে তারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ ক্ষুদ্র পুস্তকে। আলোচনার ভাষা যথাসম্ভব সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সাধারণ পাঠকগণও এ থেকে উপকৃত হতে পারেন।

বইটি লেখার কাজ প্রথম হাতে নিই ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'মাসিক পৃথিবী' ধারাবাহিক ক'টি সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশ করে। মাসিক পৃথিবীর অনেক পাঠক এবং সেন্টারের সম্মানিত ডাইরেক্টর অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদের পরামর্শে লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সভাপতি কমডোর (অবঃ) আতাউর রহমান বইটির পাণ্ডুলিপি দেখেন এবং ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ইসলামিক ইকোনমিক্স্ রিসার্চ ব্যুরোকে বইটি প্রকাশের অনুরোধ করেন। ব্যুরো এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাসিক পৃথিবীতে প্রকাশিত অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং আরও কিছু নতুন অংশ সংযোজন করে পুস্তকাকারে প্রকাশে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল।

www.icsbook.info

পুস্তকটি প্রণয়নকালে যাঁরা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব শাহ আবদুল হান্নান, ড. সালাহউদ্দিন আহমদ, জনাব লুৎফর রহমান সরকার, জনাব এম. আযীযুল হক, জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, জনাব তাজুল ইসলাম ও জনাব এস.এম. আলী আক্কাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম.এ. হামিদ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং বইটির ভূমিকা লিখে এর মান বৃদ্ধি করেছেন।

জনাব হাসান রহমতী বইটির প্রুফ দেখার মত কঠিন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। ব্যুরোর ডেপুটি ডাইরেক্টর জনাব ফেরদৌস কোরায়েশী বইটি ছাপার কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এজন্য বেশ পরিশ্রম করেছেন।

মোটকথা, উল্লেখিত সকলের সহযোগিতা, পরামর্শ ও শ্রমের ফলেই পুস্তকটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হলো। এঁদের এ ঋণ শোধ করার সাধ্য আমার নেই। মেহেরবান আল্লাহ তাঁদের জাযা দান করুন এটাই কামনা করি।

বইটি প্রধানত অর্থনীতির অত্যন্ত জটিল বিষয় নিয়ে লেখা বিধায় এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া যথার্থ পরামর্শ ও সহযোগিতা বইটিকে আরও সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে সুধী পাঠক, সম্মানিত উলামায়ে কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের এ শ্রমকে কবুল করুন এবং সুদের অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত করুন- আমীন।

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

ঢাকা
তারিখ :
বৈশাখ ১৫, ১৩৯৯
এপ্রিল ২৮, ১৯৯২
শাওয়াল ২৩, ১৪১২

www.icsbook.info

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভূমিকা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন তার প্রণীত 'সুদ সমাজ অর্থনীতি' পুস্তকে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সম্পর্কে এ যাবত চলে আসা গতানুগতিক চিন্তাধারার উর্ধ্বে উঠে সুদের একক ও সমম্বিত সংজ্ঞা উদঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন। ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা হালাল এবং সুদ হারাম হওয়ার কুরআন-সুন্নাহ সম্মত প্রকৃত কারণসহ ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় তার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া সুদের আর্থ-সামাজিক ধ্বংসকর পরিণতির এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন। জনাব শরীফের চুলচেরা বিশ্লেষণ, আকাট্য যুক্তি এবং কুরআন-সুন্নাহ ও বাস্তবতার সাথে সংগতিশীল ব্যাখ্যা বইটিকে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারে এক চমৎকার সংযোজন করে তুলেছে সন্দেহ নেই; তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের ব্যাপারে বিভিন্ন ফিক্বাহ, গবেষক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে বিদ্যমান বহু মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তির অবসানে বইটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইনসাফ ও আদলের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে যথার্থ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু কাল পরিক্রমায় নিছক মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ও আগ্রাসী তৎপরতা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়, ইনসাফ-আদলের অনুভূতি এবং বৈধ-অবৈধের পার্থক্যকে বিলীন করে দিয়েছে। ফলে যেন-তেন প্রকারে অর্থ উপার্জনের স্পৃহা সামষ্টিক স্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে এবং পুঁজিবাদী শোষণ বঞ্চনার কাছে অর্থনৈতিক সুবিচার পরাভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদের বাইবেল হিসেবে পরিচিত হারবার্ট স্পেন্সারের Social Darwinism এবং অ্যাডাম স্মিথের The Wealth of Nation পুস্তকদ্বয় অর্থশাস্ত্রে পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মানবিক মূল্যবোধকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সহায়তা করে। পুঁজিবাদের আদলে অনুসৃত নিছক ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফা কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা বিশ্ব-অর্থনীতিতে একাধিকবার সর্বগ্রাসী মন্দার সৃষ্টি করে প্রমাণ করেছে যে, এই ব্যবস্থাটি মানবতা-বান্ধব নয়। এই অবস্থায় ইসলামের ইনসাফভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন সময়ের দাবী। সুদ সমাজ অর্থনীতি পুস্তকটি এই দাবী পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

www.icsbook.info

পুস্তকে শিল্প বাণিজ্য ও অর্থ খাতে পরিচালিত লেনদেনের ইসলামী পদ্ধতি, সুদের কারণ, সুদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং এর ধ্বংসকারিতা বিশদ ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে ইসলামী অর্থনীতি চালু না থাকায় আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যেমন এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তেমনি বেশিরভাগ আলেম উলামার মধ্যেও এর যথার্থ চর্চা না থাকায় মুসলিম উম্মাহ কোথাও পুঁজিবাদ, আবার কোথাও সমাজবাদের গোলামী করতে বাধ্য হয়েছে। অধ্যাপক শরীফ হুসাইন তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে জ্ঞানের যে দ্বার উন্মোচন করেছেন তা নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটাবে এবং এই গোলামী থেকে মুক্ত হতে আমাদের উজ্জীবিত করবে ইনশাআল্লাহ্। পুস্তকটি গবেষক, চিন্তাবিদ, আলেম-উলামা, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনা বিশারদ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে বলে আমি মনে করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন॥

কার্তিক ১৭, ১৪১৯
নভেম্বর ০১, ২০১২
জিলহজ্জ ১৫, ১৪৩৩

ড. মানাজির আহসান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
লেস্টার, ইউ.কে.

www.icsbook.info

চেয়ারম্যানের কথা

'সুদ সমাজ অর্থনীতি' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ১৯৯২ সালে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে; পাঠক সমাজে বইটি বেশ সমাদৃত হয়। বিষয়ের গুরুত্ব ও চাহিদা বিবেচনা করে বেশ কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনীসহ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন বইটিতে একদিকে কুরআন, সুন্নাহ ও সম্মানিত ফক্বীহদের মতামতের ভিত্তিতে সুদের প্রকৃত ও সমন্বিত সংজ্ঞা উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদের ভয়াবহ অভিশাপ ও ধ্বংসকর পরিণতির চিত্র তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ সুদের ওপর বাংলা ভাষায় রচিত এ পুস্তকটি গভীর চিন্তা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও দীর্ঘ গবেষণার ফল।

লেখক, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার এবং শিক্ষক-ছাত্রসহ পাঠকবৃন্দ বইটি দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন॥

ঢাকা : কার্তিক ১৭, ১৪১৯
নভেম্বর ০১, ২০১২
জিলহজ্জ ১১, ১৪৩৩

শাহ্ আব্দুল হান্নান
চেয়ারম্যান
ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সুদ সম্পর্কে মানুষকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। শুধু মুসলিম মনীষীগণই নন, অনেক অমুসলিম অর্থনীতিবিদও সুদের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কেবল সচেতনই নন, তাঁরা সুদ ভিত্তিক লেনদেন বাতিল করে এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন তাঁর লিখিত **'সুদ সমাজ অর্থনীতি'** গ্রন্থে খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের গভীর অধ্যয়ন, ব্যাপক চিন্তা ও গবেষণার ফসল হিসেবে এ বিষয়ে এক অনবদ্য সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

গ্রন্থটি ২৮ এপ্রিল ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রুত এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি আলেমে দ্বীন, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি পুনঃপ্রকাশের দাবী আসতে থাকে। লেখক এ বিষয়ে কৈফিয়ত দিয়েছেন। বিলম্বে হলেও বর্ধিত কলেবরে তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের এ প্রকাশনাটি ছাত্র, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা ও গবেষকদের উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পরিবর্ধিত এ গ্রন্থ উপহার দেয়ার জন্য লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুকরিয়া জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়াতে পরম করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমীন॥

ঢাকা : কার্তিক ১৭, ১৪১৯
নভেম্বর ০১, ২০১২
জিলহজ্জ ১৫, ১৪৩৩

ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
প্রকাশনা সেক্রেটারী
ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো

www.icsbook.info

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে সুদ লেনদেন অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সকল দেশেই আইন করে সুদকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে সুদ আদায় করে নেওয়ার জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, সুদের ভয়াবহ ধ্বংসকর প্রতিক্রিয়া সর্বত্র অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। "বস্তুতঃ আজকের দুনিয়ায় সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যত ব্যাপক ও প্রকট হয়ে উঠেছে, অতীতে কখনও তা হয়নি। পূর্বকালে সুদী ভোগ্য ঋণ লেনদেন হতো ব্যক্তি পর্যায়ে, আর এর কুফল সীমিত থাকতো ঋণগ্রহীতা পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিককালের সুদী ঋণব্যবস্থা যেমন ব্যাপক, এর কুফল, জুলুম ও বেইনসাফীও তেমনি বিস্তৃত। এ ঋণের কুফল ছড়িয়ে পড়ে গোটা অর্থনীতিতে, বিপর্যস্ত করে দেয় সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে।"[১]

সুদের ধ্বংসকর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানব জাতিকে বহু পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন, আর সাদাকাহকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন।" (২:২৭৬) আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও তাঁর বাণীতে সুদের পরিণতির কথা বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ সমৃদ্ধি আনে কিন্তু সুদের আসল পরিণতি হলো অভাব ও সংকোচন (scarcity and contraction) (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৩৭৫৪)। অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন, "যিনা ও সুদ যে কোন জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।" (মুসনাদে আহমদ)

বস্তুতঃ দুনিয়াজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার পর থেকে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত সুদের এই ধ্বংসকর পরিণতি মানুষ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিবিদগণও সুদের ধ্বংসকর পরিণতি দেখে আঁতকে উঠেছেন; তাঁরা সমস্বরে চিৎকার করছেন সুদের এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে মানব সভ্যতাকে বাঁচানোর জন্য।

লক্ষণীয় যে, সুদের একক ও সমন্বিত সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। তাফসীরকার, ফিক্বাহবিদ ও মুফাস্‌সিরদের আলোচনায় দেখা যায় তাদের সকলেই আল-কুরআনে বর্ণিত রিবা ও আল-হাদীসে উল্লেখিত রিবাকে পৃথক পৃথক ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রিবার আলোচনায় এমন জিনিসকে রিবার আওতাভুক্ত করা হয়েছে যার অস্তিত্ব আসলে কুরআন-সুন্নাহয় নেই। অপরদিকে, বহুল প্রচলিত যেসব সংজ্ঞা রিবার সংজ্ঞা

---

[১] উসমানী, মুহাম্মদ তকিঃ *সুদ নিষিদ্ধঃ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়;* বাংলা অনুবাদ, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮, পৃঃ ৬৭-৬৮।

www.icsbook.info

হিসেবে চালু হয়ে আছে তার প্রায় সবগুলোই কেবল বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত রিবা সংক্রান্ত; নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্ভূত রিবা এর আওতায় আসেনি। তদুপরি বিনিময়হীনতাই যে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ এ কথাটি যেন সর্বত্র অস্পষ্টই থেকে গেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, বিভিন্ন মযহাবের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ফক্বীহ রিবার প্রকৃত ও সমন্বিত সংজ্ঞাও দিয়েছেন। কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অভাবে সে সংজ্ঞাগুলো যথার্থ মূল্যায়ন পায়নি।

এমতাবস্থায় সুদের সঠিক ও সমন্বিত সংজ্ঞা কি তা উদঘাটন এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহে ব্যবহৃত 'মিসলান বিমিসলিন'-এর ভাষাগত স্বাভাবিক অর্থ মানগত সমতাকে উপেক্ষা করে এর অর্থ করা হয়েছে পরিমাণগত সমতা; আর 'ইয়াদান বিইয়াদিন'-এর অর্থ করা হয়েছে নগদ বিনিময়। ফলে একদিকে সমজাত অথচ ভিন্ন ভিন্ন মানের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে বেইনসাফীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; অন্যদিকে সম ও অসম জাতের বস্তুর বাকি ক্রয়-বিক্রয় বিতর্কিত হয়ে পড়েছে এবং রিবা সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা ও বিভ্রান্তি।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ত্রয়োদশ শতকে বৃটিশের তৈরী সুদ সংক্রান্ত আইন এবং এ প্রেক্ষিতে অভিধানে উল্লেখিত ইন্টারেস্ট ও ইউসারীর পৃথক পৃথক অর্থের আলোকে ব্যাংকের সুদকে বৈধ বলার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এক-দুই জন আলেমকেও এতে সায় দিতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, মুনাফা ও ভাড়ার পার্থক্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিতো আছেই। শুধু যে সাধারণ জনগণ এ বিভ্রান্তির শিকার তা নয় বরং গবেষক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও এ ধারণাসমূহ জটিল তত্ত্বে আবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের পার্থক্য যেমন স্পষ্ট হওয়া দরকার, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও মুনাফা হালাল এবং সুদ হারাম হওয়ার কারণও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।

সর্বোপরি সুদ দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়া, সুদের নানাবিধ ধ্বংসকর পরিণতি প্রত্যক্ষ করা এবং সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠার পরও সুদ ছাড়া অর্থনীতি চলবে না- এই ভুল ধারণা প্রভাবশালী হয়ে আছে। এ অবস্থায় সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোর সম্যক উপলব্ধি জরুরী।

উপরোক্ত বাস্তবতা সামনে রেখে এ লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুদের সমন্বিত সংজ্ঞা উদঘাটন এবং এর যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা;

২. ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের আলোকে ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম হওয়ার যথার্থ কারণ তুলে ধরা;

৩. বাস্তবতা ও যুক্তির আলোকে সুদের ধ্বংসকর পরিণতির ওপর আলোকপাত করা।

www.icsbook.info

উপরোক্ত লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে পুস্তকটিকে প্রধান দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডে সুদ ও ক্রয়-বিক্রয় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সুদের কুফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতঃপর প্রথম খণ্ডকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম অধ্যায়ে আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ শিরোনামে আল-কুরআনের চারটি সূরার মোট পনেরটি আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে মূলতঃ বিনিময় না দিয়ে পরের সম্পদ খাওয়া, ভক্ষণ, গ্রাস বা আত্মসাৎ করার একটি বড় হাতিয়ার ও জুলুম হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং প্রধানত এ কারণেই সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুদ শিরোনামে প্রথমে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান সম্পর্কিত হাদীস এবং পরে সুদ উদ্ভূত হওয়ার কারণ সম্বলিত হাদীসগুলো সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে। অপরাপর ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ, বড় বড় সকল দার্শনিকই সুদের নিন্দা করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা সংক্রান্ত আলোচনায় ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার সংজ্ঞা; ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান এবং ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার গুরুত্ব এবং তা হালাল হওয়ার কারণ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জাহিলী যুগে প্রচলিত রিবা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার সাথে সাথে রিবার অর্থ, রিবার সমন্বিত সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় তা দেখানো হয়েছে। পরিশেষে এক নজরে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের তুলনার দ্বারা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ করা হয়েছে।

বইটির দ্বিতীয় খণ্ডকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে ভূমিকায় সুদী কারবারের স্বরূপ, প্রথম অধ্যায়ে সুদের নৈতিক ও সামাজিক কুফল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থনৈতিক কুফল, তৃতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক কুফল, চতুর্থ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক কুফল তুলে ধরা হয়েছে; আর পঞ্চম অধ্যায় উপসংহারে সুদের ধ্বংসের কিছু চিত্র পেশ করে বইটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। পরিশিষ্টে সুদের সৃষ্ট ব্যাংকিং সংকট এবং অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার দু'টি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে প্রধানত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সূত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৯৯২ সালে বইটির প্রথম প্রকাশের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই সবগুলো কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি দাবী সত্ত্বেও বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হলো। এ ব্যাপারে কৈফিয়ত দেওয়া জরুরী। অতঃপর সহৃদয় পাঠকসমাজ বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

www.icsbook.info

বস্তুতঃ দীর্ঘকাল ধরে ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা, ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্টতা, ইসলামী ব্যাংকের জন্য জেনারেল ব্যাংকিং ম্যানুয়াল ও বিভিন্ন মোডের বিনিয়োগ ম্যানুয়াল তৈরীতে ভূমিকা পালন এবং বিশেষ করে সুধী সমাবেশ ও বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেনিং প্রোগ্রামে সুদ, বিনিয়োগ-মুনাফা বিষয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে এসব বিষয়ে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশ্ন হচ্ছে, রিবা আসলে কোন্ বৃদ্ধিকে বলা হয়; আল-কুরআনের রিবা আর হাদীসের রিবা কি সত্যিই ভিন্ন ভিন্ন, আল-রিবার দ্বারা সকল রিবাকে বুঝানো হয়েছে নাকি বিশেষ কোন রিবাকে বুঝানোর জন্য তা ব্যবহৃত হয়েছে, বহুল প্রচলিত সংজ্ঞাগুলো সুদের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা কিনা, সুদ নিষিদ্ধ করার হেকমত (দর্শন) ও ইল্লাত (তাৎক্ষণিক কারণ) আসলে কি, এক মাযহাবের মতে যা সুদ অন্য মাযহাবের মতে তা সুদ নয়– একটি সুস্পষ্ট হারামের ব্যাপারে এরূপ হলো কেন, মানগত তারতম্য সত্ত্বেও সমজাতীয় দু'টি পণ্যের কেবল পরিমাণ সমান সমান করে বিনিময় করা হলে যে বেইনসাফী হয় তা কি সত্যিই বিবেচনার অযোগ্য, মুদ্রা (সরফ) ও পণ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয় কি সত্যিই নিষিদ্ধ, বাকির মেয়াদ কি আসলেই রিবা নাসা, হাদীসে বর্ণিত মিসলান বিমিসলিন, ইয়াদান বিইয়াদিন, হা'য়া ওয়া হা'য়া, দাইনান, নাসীয়াহ পরিভাষাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি, রিবাবী ম্যাটেরিয়াল বলে কোন পণ্য আসলে আছে কি? আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজীদে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে রিবার তুলনা করেছেন আর আমরা ব্যবসা ও মুনাফার সাথে সুদের তুলনা করি, এটা সঠিক কিনা, রিবা অর্থ বৃদ্ধি, মুনাফাও বৃদ্ধি– তাহলে রিবা হারাম, মুনাফা হালাল কেন, সর্বোপরি ক্রয়-বিক্রয় থেকে সুদ কিভাবে উদ্ভূত হয় ইত্যাদি। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বইটি বিশেষ করে, এর সুদ ও ক্রয়-বিক্রয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ নতুন করে লিখতে হলো। আর বিলম্বের প্রধান কারণ এখানেই।

বইটি রচনায় যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আইয়ুবুর রহমান ভুঞা। অধ্যাপনা ও গবেষণা ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, সংশোধন করেছেন, ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। আর দ্বিতীয় যার নাম আসে তিনি হচ্ছেন ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো'র সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা, বর্তমানে ব্যুরোর গবেষণা সেক্রেটারী জনাব জুনায়েদ মাশরুর খান। তিনি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে না দিলে গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম এই পুস্তক লেখা সম্ভব হতো না; আল্লাহ তাঁদের জাযা দান করুন। তাঁর এবং অধ্যাপক ভুঞার ঋণ পরিশোধের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত না করে উপায় নেই। ব্যুরোর ত্রৈমাসিক জার্নাল থটস অন ইকোনমিক্স-এর সম্পাদক জনাব মো.

www.icsbook.info

নূরুল আমিন পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পড়েছেন, সংশোধন করেছেন এবং বেশ কিছু অংশ জার্নালে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল-এর সদস্য মওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম হাদীসগুলোর অনুবাদ ও সংযোজিত মন্তব্য দেখে দিয়ে একে ক্রটিমুক্ত করতে সাহায্য করেছেন। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য মওলানা আব্দুল হাকিম মাদানী বইতে উল্লেখিত হাদীসসমূহের নম্বর সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়ে এর নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সাবেক সদস্য সচিব প্রিন্সিপাল মওলানা মুহাম্মদ ছেরাজুল ইসলাম, বর্তমান সদস্য অধ্যাপক মওলানা ড. হাসান মঈন উদ্দীন, একই ব্যাংকের সাবেক এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রকিব, শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মুরাকিব মওলানা শাসমুল হুদা, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য সচিব মওলানা আ. ন. ম. রশিদ আহমদ লিখিত মন্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। দেশের প্রথিতযশা আলেম মুফতী সাঈদ আহমদ, অধ্যক্ষ মওলানা সাইয়েদ কমালউদ্দীন জাফরী, মওলানা আ. ন. ম. রফিকুর রহমান আল মাদানী, ড. মো. মানজুরে ইলাহী এবং অর্থনীতিবিদ ড. এস. এম. আলী আক্কাস, অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. কবির হাসান, জনাব এম. শফিউল্লাহ, জনাব আব্দুল আউয়াল সরকার, প্রখ্যাত ইসলামী ব্যাংকার জনাব এম. আযীযুল হক, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, জনাব নূরুল ইসলাম খলিফা, জনাব এ. টি. এম. সালেহ, ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ মূল্যবান মন্তব্য, পরামর্শ ও সংশোধনী দিয়ে বইটির মান বৃদ্ধি করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশের জন্য অনুমোদন করার লক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ড. এস. এম. আলী আক্কাস তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও প্রচুর সময় দিয়ে বইটির পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এবং কমিটিতে আলোচনা করে ব্যুরো কর্তৃক বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও চেয়ারম্যানকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি ব্যুরোর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান পূর্ণাঙ্গ বইটি পড়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং ব্যুরোর পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর পুরস্কার মহান আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকবে আশা করি।

গ্রন্থটি টাইপ করা এবং বহুবার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে ব্যুরোর কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো. সালাউদ্দিনকে প্রচুর শ্রম ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তার সাথে ব্যুরোর হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মো. জাকির হোসেন ও ম্যাসেঞ্জার জনাব মোহাম্মদ হোসেন বাবুলকেও বেশ খাটতে হয়েছে। দৈনিক সংগ্রামের প্রুফ বিভাগের জনাব হাসান রহমতী বইটির প্রুফ দেখেছেন এবং মেসার্স আল-ফালাহ

www.icsbook.info

প্রিন্টিং প্রেস বইটি ছাপার দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ এদের সকলের শ্রম কবুল করুন। দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ.কে.-এর মহাপরিচালক ড. মানাজির আহসান দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এ জন্য তাঁকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

পরিশেষে যিনি এই গ্রন্থটি রচনার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহাশক্তিধর ও রহমানুর রাহীম আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাঁর অপার মেহেরবানী দ্বারা আমাদের সকলের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং পরকালে নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন॥

ঢাকা

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন

তারিখ :
কার্তিক ১৭, ১৪১৯
নভেম্বর ০১, ২০১২
জিলহজ্জ ১৫, ১৪৩৩

www.icsbook.info

প্রথম খণ্ড

সুদ ও ক্রয়-বিক্রয়

www.icsbook.info

www.icsbook.info

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ

সুদ নিষিদ্ধ করেছে আল-কুরআন। অবশ্য তার পূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল গ্রন্থেই সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। আর মহান আল্লাহর নাযিলকৃত সকল গ্রন্থই (দ্বীনই) হচ্ছে মূলত ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামই হচ্ছে দুনিয়ায় মানুষের জন্য আদি এবং একমাত্র জীবন বিধান; আর এই ইসলামেই সুদ নিষিদ্ধ। সুদ কি? কেন সুদকে হারাম করা হলো– এসব বিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমেই এ বিষয়ে আল-কুরআন কি বলে তা জানা দরকার।

আল-কুরআনে সুদকে বলা হয়েছে *রিবা*। আল-কুরআনের চারটি সূরার মোট ১৫টি আয়াতকে *রিবা* সংক্রান্ত আয়াত বলা হয়। নাযিলের ক্রমিক ধারা অনুসারে সূরার নাম ও আয়াত নম্বরগুলো হচ্ছে :

১. সূরাতুর রূম, ৩৯;
২. সূরাতুন্নিসা, ১৬০-১৬১;
৩. সূরাতু আলে ইমরান, ১৩০-১৩৪ এবং
৪. সূরাতুল বাকারাহ, ২৭৫-২৮১

এসব আয়াতে '*রিবা*' শব্দটির উল্লেখ আছে মোট আট বার। সূরাতুর রূমের ৩৯ নম্বর আয়াতে ১ বার, সূরাতুন্নিসার ১৬০ আয়াতে ১ বার, সূরাতু আলে ইমরানের ১৩০ আয়াতে ১ বার এবং সূরাতুল বাকারাহ্‌র ২৭৫ আয়াতে ৩ বার, ২৭৬ আয়াতে ১ বার ও ২৭৮ আয়াতে ১ বার।

বস্তুতঃ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুদ হচ্ছে পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা এবং একটি বড় জুলুম; আর আল-কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে মানবসমাজ, তথা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে এ জুলুমের অবসান ও নির্মূল করে ক্রয়-বিক্রয়ে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা চারটি ধারাবাহিক পর্যায়ে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে শিক্ষা। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাঁর বাণী নাযিল করে সুদের বাস্তব ও প্রকৃত চেহারা ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ মুমিনদের সুদ খেতে নিষেধ করে পরিবেশ তৈরী করেছেন। ঈমানদারগণ যাতে সুদ বর্জন করে চলতে পারে সেজন্য তাঁদের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। আর চতুর্থ বা সর্বশেষ পর্যায়ে আইন নাযিল করে সুদকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছেন। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সুদী লেনদেন আইনত নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং প্রকৃত পক্ষে সুদ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়। নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুসারে উক্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

www.icsbook.info

সূরাতুর রূম

সূরাতুর রূমের ৩৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

"মানুষের সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায় এজন্য তোমরা যে সুদ দাও, আল্লাহর কাছে তা (সুদ) বাড়ে না; আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, তারাই (সেই যাকাত দানকারীরাই) তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে।"

পটভূমি

আল-কুরআনের সুদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম, নববী ৫ম সাল তথা ৬১৫ খৃঃ নাযিল করা হয়। এ সময়ে সারা মক্কায় মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকশত লোক ঈমান এনেছেন। পরবর্তীকালে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে সেখানে সুদকে আইনত নিষিদ্ধ এবং যাকাতকে ফরয করা হবে, এই লক্ষ্য সামনে রেখে মহামহিম আল্লাহ এই প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমানদারদেরকে সুদ ও যাকাতের তাৎপর্য শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সুদী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা এবং যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের একটা শাশ্বত চিত্র তুলে ধরেছেন।

মূল বক্তব্য

আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে সুদদাতাদের লক্ষ্য করে সুদ সম্পর্কে দু'টি কথা বলেছেন ঃ ১) সুদদাতারা সুদ হিসেবে যা দেয় তা অপর লোকদের (সুদগ্রহীতাদের) সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাদের ধনী বানায় এবং ২) কিন্তু তা (সেই সুদ) আল্লাহর কাছে বাড়ে না। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'য়ালা যাকাতদাতাদের সম্বোধন করেছেন এবং যাকাত সম্পর্কেও দুটো কথা বলেছেন ঃ ১) যাকাত দিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন; আর ২) যাকাতদাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রথমে সুদ সংক্রান্ত দুটি এবং পরে যাকাত সংক্রান্ত দুটি কথার ব্যাখ্যা নিচে পেশ করা হলো ঃ

সুদ

১. সুদ সম্পদ হস্তান্তর করে

সুদ লেনদেন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুদের মাধ্যমে সুদদাতাদের সম্পদ সুদগ্রহীতাদের কাছে চলে যায় এবং তারা আরও ধনী হয়। সুদ সংক্রান্ত প্রথম কথায় আল্লাহ এই কথাই বুঝিয়েছেন। বর্তমানে সুদী বিশ্বে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের সাথে

www.icsbook.info

প্রধানত দুই শ্রেণীর মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এরা হচ্ছে ঃ ১) অভাবের তাড়নায় সুদী ঋণ গ্রহণে বাধ্য জনগোষ্ঠী এবং ২) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে সুদী ঋণগ্রহীতা। এছাড়া সরকারও দেশী-বিদেশী ঋণদাতার কাছ থেকে সুদী ঋণ নিয়ে থাকে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অভাবের তাড়নায় যারা সুদী ঋণ গ্রহণ করে তারা সে ঋণের সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে অভাব পূরণার্থে ব্যয় করে ফেলে। এ ঋণ উৎপাদন কাজে খাটানো হয় না। সুতরাং এ ঋণের দ্বারা আয় বা সম্পদ বর্ধিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতঃপর ঋণগ্রহীতাগণ এ ঋণের সুদ পরিশোধ করে তাদের পূর্বার্জিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে– ভিটে-মাটি-স্ত্রী-সন্তান বিক্রি করে। ফলে তাদের সম্পদ প্রদত্ত সুদের সমপরিমাণে হ্রাস পায় এবং সেই সম্পদ গিয়ে ঋণদাতা পুঁজিপতিদের সম্পদ সমপরিমাণে বৃদ্ধি করে তাদের ধনী বানায়; এই লেনদেন মোট জাতীয় সম্পদে কোন বৃদ্ধি ঘটায় না।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাগণ তাদের নিজ নিজ ব্যবসা, শিল্প বা কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য সুদ প্রদানের শর্তে যে ঋণ গ্রহণ করে সেসব ঋণের সুদ তারা নিজেরা দেয় না; বরং ধার্যকৃত সুদকে উৎপাদন ব্যয় হিসেবে পণ্য-সামগ্রীর দামের সাথে যোগ করে দেয়। বিষয়টা এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ Cost of Production = Rent+Wages + Interest + Profit = Price'. অতঃপর বিনিয়োগকারীগণ দ্রব্যমূল্যের আকারে এ সুদ চূড়ান্ত ক্রেতা-ভোক্তা জনগণের কাছ থেকে আদায় করে ঋণদাতা ব্যাংক বা মহাজনের হাতে তুলে দেয়। ফলে ভোক্তাগণ প্রতিদিন তাদের ক্রীত প্রতিটি পণ্য-সামগ্রীর দামের সাথে সুদ দিতে বাধ্য হয়। এভাবে ক্রেতাদের প্রদত্ত সুদ ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ঋণদাতা পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়, পুঁজিপতিদের সম্পদের অংক বৃদ্ধি পায়; আর ভোক্তাদের সম্পদ সমপরিমাণে হ্রাস পায়; মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

তৃতীয়ত, সরকার তার বাজেট ঘাটতিপূরণ, দুর্যোগ মুকাবিলা ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশী-বিদেশী ঋণদাতা পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সুদের ভিত্তিতে যে ঋণ গ্রহণ করে তার সুদও সরকার বর্ধিত কর আকারে জনগণের কাছ থেকে আদায় করে এবং দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করে। ফলে করদাতাদের সম্পদ সুদ আকারে সরকারের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে চলে যায়। এতে পুঁজিপতিদের সম্পদ যে পরিমাণে বাড়ে করদাতাদের সম্পদ সমপরিমাণে হ্রাস পায়; মোট সম্পদ বাড়ে না। সাইয়েদ কুতুব শহীদ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাটিই নিম্নরূপে লিখেছেন ঃ

“সুদের ভিত্তিতে মূলধন নিয়ে যারা কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলে, তারা সুদ নিজেদের মূলধন বা মুনাফার অংশ থেকে দেয় না, তারা সেটা পণ্যের মূল্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। ফলে এই সুদ কার্যত ব্যবহারকারী বা ভোক্তাদেরই দিতে বাধ্য করে। অন্যদিকে, সরকার যখন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয় কিংবা

www.icsbook.info

গ্রহণ করে, তখনও সুদ দেওয়ার কাজটি শেষ পর্যন্ত জনগণের ওপরেই বর্তায় এবং পরিণামে তাদেরকেই সর্বস্বান্ত হতে হয়।"[১]

তাফসীরে আল-মারাগীতে বলা হয়েছে যে, "সুদখোরের মাল বাহ্যত বৃদ্ধি পেলেও তা বৃদ্ধি পায় অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেওয়ার কারণে। কতকগুলো লোকের সম্পদ একজনের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়, তাতে গোটা সমাজের সম্পদ অপরিবর্তিতই থেকে যায়।"[২]

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণও বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। এ ব্যাপারে জেমস রবার্টসনের বক্তব্য হচ্ছে, "The pervasive role of interest in the economic system results in the systematic transfer of money from those who have less to those who have more.....it applies universally. It is partly because those who have more money to lend get more interest than those who have less; it is partly because the cost of interest repayments now forms a substantial element in the cost of all goods and services and the necessary goods and services looms much larger in the finances of the rich."[৩] "অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে সুদের ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকার ফলে যাদের সম্পদ কম তাদের কাছ থেকে যাদের সম্পদ বেশি তাদের কাছে অর্থ নিয়মিতভাবে হস্তান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়া সর্বত্র সক্রিয় (universal)। এই হস্তান্তর অংশত এই কারণে হয় যে, যাদের ঋণ দেওয়ার মত বেশি অর্থ আছে তারা যাদের অর্থ কম তাদের চেয়ে অধিক সুদ পায়; আর অংশত এ কারণেও হয় যে, বর্তমানে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয়কে সকল পণ্য-সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন খরচের অন্যতম উপাদান হিসেবে ধরা হয়; আর বিত্তশালীদের অর্থায়ন দ্বারাই প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্য-সামগ্রী ও সেবার ব্যাপক উৎপাদন হয়ে থাকে।"

রবার্টসন অন্যত্র লিখেছেন, "The transfer of revenue from poor people to rich people, from poor places to rich places, and from poor countries to rich countries by money and finance system is systematic.... One cause of the transfer of wealth from poor to rich is the way interest payments and receipts work through the economy."[৪] অর্থাৎ "অর্থ ও

---

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ: *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, বাংলা অনুবাদ, ২য় খণ্ড, আল-কোরআন একাডেমী, লন্ডন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০১, পৃ. ৭০-৭২।

২. *তাফসীরে আল-মারাগী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭৮।

৩. James Robertson: *Transforming Economic Life: A Millennial Challenge*, Green Books, Devon, 1998, p. 51-54.

৪. James Robertson: *Future Wealth: A New Economics for the 21st Century*, Castle Publications, London, 1990, p. 130-131.

www.icsbook.info

আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমে গরীব লোকদের থেকে ধনী লোকদের কাছে, দরিদ্র এলাকা **থেকে বিত্তশালী এলাকায়, এবং গরীব** দেশ হতে ধনী দেশে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে **আয়/সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে থাকে**..... । বিত্তহীনদের থেকে বিত্তশালীদের নিকট **এইরূপে সম্পদ হস্তান্তরের অন্যতম কারণ হচ্ছে** সুদের লেনদেন যা গোটা অর্থনীতিতে **পরিব্যাপ্ত** ।"

একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে **বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট হবে**। বাংলাদেশে বিগত কয়েক **বছরের তথ্যে** যে চিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ এদেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বছরে সুদ বাবদ আয় হয় ১৫-২০ হাজার কোটি টাকা। এই সুদ দেয় ভোক্তা-ক্রেতা জনগণ। আর তা পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের সব দেশেই সুদের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে এভাবে শোষণ করে পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদী ঋণব্যবস্থায় ধনী দেশগুলো এই একই পদ্ধতিতে গরীব, বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছ থেকে সুদ আকারে সম্পদ শোষণ করে নিচ্ছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) মতে, ১৯৮২ হতে ১৯৯০ সময়কালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি মোট সম্পদ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সম্পদের বেশির ভাগই ছিল ঋণ। স্বাভাবিকভাবেই এ ঋণের ওপর সুদ পাওনা হয়েছে। ১৯৮২-১৯৯০-এর একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহ কেবল ঋণ পরিশোধ বাবদ (আসল ও সুদ) ঋণদাতা দেশগুলোকে ফেরত দিয়েছে ১,৩৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিত্তশালী দেশগুলোর অনুকূলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৪১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অস্বাভাবিক (Extra ordinary) অধিক পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদান সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট ঋণের পরিমাণ কি বিন্দু মাত্রও হ্রাস পেয়েছে! দুর্ভাগ্য যে তা হয়নি। বরং ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ১৯৮২ সালের তুলনায় শতকরা পূর্ণ ৬১ ভাগ অধিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯৯০ দশকের যাত্রা **শুরু করেছে**।"[৫]

উক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতের এই অংশের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে, সুদ **এর দাতা বহু লোক, বিশেষ করে** ভোক্তা জনগণের কাছ থেকে সম্পদ হস্তান্তর করে **কতিপয় পুঁজিপতির সম্পদ বর্ধিত করে তাদের ধনী বানায়**। এই বৃদ্ধি আসলে বৃদ্ধি নয়, **সম্পদের হস্তান্তর মাত্র**। **সুদগ্রহীতাদের সম্পদের বৃদ্ধি** = সুদদাতাদের সম্পদের হ্রাস **অথবা প্রদত্ত সুদ = প্রাপ্ত সুদ**। **সুদ হচ্ছে সম্পদ হস্তান্তরের** একটি অতি বড় হাতিয়ার।

---

[৫] সূসান জর্জ: *দি ডেব্‌ট বুমেরাং, হাউ দি থার্ড ওয়ার্ল্ড ডেব্‌ট হারমস আস অল;* প্লুটো প্রেস, লন্ডন, ১৯৯২।

www.icsbook.info

২. সুদ আল্লাহর কাছে বাড়ে না

কিছু কিছু লোক প্রশ্ন করেন, সুদের ভিত্তিতে ঋণ এনে বিনিয়োগ করার পর তাতে লাভ হয়; এই লাভ থেকে ঋণদাতার ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করা হয় এবং বিনিয়োগকারীও এর অংশ পায়। এখানে সম্পদতো বাড়ছেই। সুতরাং 'সুদ সম্পদ বাড়ায় না'– এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি? কেউ কেউ আবার বলেন, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতেও তো জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে সুদ সম্পদ বৃদ্ধি করে না এ কথা কি যথার্থ?

সম্ভবত এসব প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, "আল্লাহর কাছে সুদ বৃদ্ধি পায় না"– এর তাৎপর্য হচ্ছে, এর জন্য পরকালীন জীবনে কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না।"[৬] কেউ কেউ আবার বলেছেন, এর তাৎপর্য হচ্ছে সুদী কারবারে আল্লাহর আনুকূল্য ও বরকত থাকে না।[৭]

তবে আল্লামা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব শহীদ ও ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীসহ বেশ সংখ্যক গবেষক মনে করেন যে, কেবল পরকাল নয়, বরং এ পার্থিব জীবনেও আল্লাহর উক্ত বাণীর বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়।[৮]

আসলে আল্লাহই হচ্ছেন যাবতীয় সম্পদের মূল উৎস। এই উৎসে সম্পদের বৃদ্ধি না হলে বাস্তবে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই "আল্লাহর কাছে সম্পদ বৃদ্ধি পায় না" এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে উৎসে সম্পদ বাড়ে না, মূলে বাড়ে না, আসলে বাড়ে না তথা মোট সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। এই দিক থেকে আল্লাহর এ কথার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে উৎপাদন; আর উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন বিনিয়োগ। এক কথায়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগের দ্বারা। কিন্তু সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হলে সেখানে কেবল গৃহীত ঋণের আসলটাই বিনিয়োগ করা হয়; এর ওপর ধার্যকৃত সুদ বিনিয়োগ করা হয় না– বিনিয়োগ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন বিনিয়োগকারী ১৫% সুদ প্রদানের শর্তে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শিল্পে বিনিয়োগ করলো। এক্ষেত্রে সে কেবল ১.০০ লক্ষ টাকাই বিনিয়োগ করতে পারবে। ১৫% ধার্যকৃত সুদ ১৫,০০০/- টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে না। সুতরাং সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সে বৃদ্ধি হয় আসল ঋণ ১.০০ লাখ টাকা বিনিয়োগের ফলে; সুদের

---

৬. উসমানী, মুহাম্মদ তকি: পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

৭. সিদ্দিকী, এম, এন: *Riba Bank Interest and The Rationale of its Prohibition*; Islamic Development Bank (IDB), Islamic Research and Training Institute, Jeddah, KSA, 2004, p. 37 এবং উসমানী, উপরোক্ত, পৃ: ১৫।

৮. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা : *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪-১৫; সিদ্দিকী : এম, এন, উপরোক্ত, পৃ. ৪৪; সাইয়েদ কুতুব শহীদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৭২।

www.icsbook.info

কারণে নয়। বস্তুতঃ সুদের সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সম্পর্ক শুধু এতটুকু যে, সুদ ধার্য করতে রাজী হওয়ার কারণে বিনিয়োগের জন্য ঋণ পাওয়া যায়। সুদের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যায় এজন্য সুদই সম্পদ বাড়ায় একথা বলা যায় না; কারণ সুদ ছাড়াও পুঁজি সংগ্রহের আরও উপায় আছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতার বিনিয়োগে যদি লোকসান হয় তাহলে তার পূর্বের সম্পদ থেকে পুঁজির লোকসানজনিত ঘাটতি পূরণ করে আসল ঋণসহ ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করতে হয়। এ অবস্থায় তার মোট সম্পদ অবশ্যই হ্রাস পায়। সুতরাং সুদের দ্বারা মোট সম্পদ কখনও বাড়ে না বরং সুদ ঋণগ্রহীতার সম্পদ কমিয়ে দেয়। সুদ সম্পদ বাড়ায় না, অর্থনীতিতে এর আরও অনেক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অর্থনীতিতে বলা হয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক ইতিবাচক (Positive) অর্থাৎ বিনিয়োগ বাড়লে সম্পদ বাড়ে; আর বিনিয়োগ কমলে সম্পদ কমে। কিন্তু সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক পরস্পর বিপরীতমুখী। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়; আর সুদের হার কমলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সর্বজনবিদিত এ বিধি অনুসারে এ সত্যই প্রতিভাত যে, সুদের হার শূন্যে থাকলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান হয়, সুদের হার শূন্য থেকে বেশি হলে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সেই সর্বোচ্চ স্তর থেকে নেমে যায় এবং সুদের হার শূন্য অপেক্ষা বেশি থাকা অবস্থায় আর কখনও তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে পারে না, অবশ্য যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। সেজন্য লর্ড কীনসের মতো অর্থনীতিবিদ সুদের হারকে শূন্যে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ লক্ষ্যে সরকারকে তার Coercive power প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।[৯]

লর্ড কীনস পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সাথে সুদের হারের সমতা বিধির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সুদের হার বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছতে দেয় না; বরং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন সেখানেই থেমে যায়। অথচ সুদের হার শূন্য হলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ হতো।[১০]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুদ দ্রব্যমূল্যের আকারে জনগণের সম্পদ শুষে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়। এর ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা কমে যায়; ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস করতে হয়; এমনকি, এক পর্যায়ে মন্দা-মহামন্দা সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতিকে স্থবির করে দেয়। বিনিয়োগ ও উৎপাদন প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। বেকারত্বের ব্যাপক ভারে অর্থনীতি ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। এছাড়া সুদ ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে, বিনিয়োগকে ফটকা খাতে ঠেলে

---

৯. জে. এম. কীনস: *জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি*, পৃ. ৩৫১।

১০. জে, এম, কীনস: উপরোক্ত, পৃ. ৩৫১।

www.icsbook.info

দেয় এবং বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে। সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে দেয়। মানুষ ঝুঁকি গ্রহণপূর্বক পরিশ্রমের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা অপেক্ষা নিশ্চিত নির্ধারিত সুদে অর্থ লগ্নি করার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। যা বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেয়। (সুদের কুফল পর্যায়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।)

আল্লামা মওদূদী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাই বলেছেন, "একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শটি একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায় নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসার সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগানোর সুযোগ পাবে না।"[১১] মওদূদী তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, "সুদের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন অবশেষে তা কম হতে বাধ্য।"[১২] (আহমদ)

আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সুদ সম্পদ হস্তান্তর করে, মোট সম্পদ বাড়ায় না। সম্পদ বৃদ্ধি হয় বিনিয়োগের দ্বারা, আর সুদ বিনিয়োগ করা যায় না, সুতরাং সম্পদ বৃদ্ধিতে সুদের কোন ভূমিকা নেই; বরং যে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধি করা হয় সুদ সে বিনিয়োগকেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে দেয় না; নানাভাবে বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে ও নিম্নতর স্তরে ঠেকিয়ে রাখে।

'আল্লাহর কাছে সুদ বাড়ে না', আল্লাহ প্রদত্ত সুদের এই প্রাকৃতিক (natural) বিধি সত্য ও যথার্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। সুদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা যথাবিহিত কার্যকর রয়েছে; অর্থনীতিবিদগণও সে বিধি খুঁজে পেয়েছেন– আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সুদ সম্পদ বৃদ্ধিকে ঠেকিয়ে রাখে, বাড়তে দেয় না। তবে এ কথার অর্থ এটা নয় যে, অর্থনীতিতে বর্তমানে মোট যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা আর কখনও বাড়বে না, বরং সুদ একে কমিয়ে দিবে। আসল কথা হচ্ছে, সুদী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাগণ প্রধানত সুদের ভিত্তিতে পুঁজি ধার নিয়ে বিনিয়োগ করে, অনেকেই নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে, আর অনেকেই আবার করযে হাসানাহ, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি পন্থায় পুঁজি সংগ্রহ করে কারবারে বিনিয়োগ করে। এসব বিনিয়োজিত অর্থের দ্বারা জমি ক্রয় বা ভাড়া নেয়া হয়, যন্ত্রপাতি কেনা হয়, শ্রম নিয়োগ করা হয়, কাঁচামাল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়; ফলে পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়। এতে

---

[১১] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

[১২] উপরোক্ত, পৃ. ১৫ পাদটীকা-১।

www.icsbook.info

মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া বা সম্পদ পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে তা হয় পুঁজি বিনিয়োগের ফলে; সুদের কারণে নয়। তাছাড়া, অর্থনীতির বিধির সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছা সম্ভব যা সুদী অর্থনীতিতে কখনও সম্ভব নয়।

যাকাত

১. যাকাত দিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন

বস্তুতঃ যাকাত হচ্ছে সুদের বিপরীত। সুদ সাধারণ মানুষের সম্পদ শোষণ করে এনে কতিপয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয়, তাদের আরও ধনী বানায়; আর সাধারণ মানুষ ক্রয়-ক্ষমতা হারিয়ে নিজেদের অভাব পূরণে অক্ষম হয়ে পড়ে। অপরদিকে, যাকাতে বিত্তশালী, ধনী, পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সম্পদ তুলে নিয়ে যাদের সম্পদ নাই তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ফলে গরীব লোকদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসে, তারা নিজেদের অভাব পূরণে সামর্থবান হয়ে উঠে, তারা উপকৃত হয়। আল্লাহর নিঃস্ব অভাবী বান্দাগণ উপকৃত হওয়ায় আল্লাহ খুশী হন, সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই যাকাত দেওয়া হয়; একমাত্র এই নিয়তেই যাকাত দেওয়া বিধেয়।

২. যাকাত দাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, যাকাত যারা দেয় তাদের সম্পদ প্রদত্ত যাকাতের সমপরিমাণে হ্রাস পায়। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ এখানে এর বিপরীত কথা বলেছেন। আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন তারাই, মানে সেই যাকাত দানকারীরাই; অতঃপর সম্পদ বৃদ্ধি করে বলেননি, 'বৃদ্ধি করতে থাকে' (continuous) বলেছেন। যাকাতদাতারা কিভাবে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকে সে বিষয়টি বুঝা দরকার। যাকাত লেনদেন ও তার বাস্তব ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

উপরে বলা হয়েছে, যাকাতের সম্পদ পাওয়ার ফলে যাকাত গ্রহীতা দরিদ্র জনসাধারণের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। তারা এ সম্পদ দ্বারা নিজেদের অভাব পূরণার্থে প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে। ফলে বাজারে পণ্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা (effective demand) বেড়ে যায়। পণ্য-সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মুনাফার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয়; অধিক মুনাফা পাবার আশায় তারা দ্রুত পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। আর বিনিয়োগ কেবল তারাই করে যারা যাকাত দেওয়ার যোগ্য– সাহিবে নিসাব। কারণ, বিনিয়োগ করার মত পুঁজি কেবল সাহিবে নিসাব কিছু লোকের কাছেই থাকে; যাকাত প্রদানে অযোগ্য লোকদের কাছে পুঁজি থাকে না। সুতরাং যাকাতদাতাদের মধ্যে যাদের হাতে পুঁজি আছে তারাই বিনিয়োগ করে; পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রি করে তারাই লাভ পায়। আর এসব

www.icsbook.info

পণ্য-সামগ্রী যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তারাই ক্রয় করে যারা যাকাতের সম্পদ পেয়েছে। সুতরাং যাকাতদাতাগণ যাকাত হিসেবে যে অর্থ প্রদান করে পণ্য-সামগ্রীর দাম আকারে তা আবার যাকাতদাতা বিনিয়োগ ও উৎপাদনকারীদের কাছেই ফিরে আসে। তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না; বরং প্রথমবার বিনিয়োগ ও উৎপাদন করতে বাড়তি শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। ফলে বেকার লোক যাদের আয়-রোজগার, ক্রয়-ক্ষমতা নেই, তাদের কর্মসংস্থান হয়; শ্রমের মজুরী পাওয়ায় তাদের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব শ্রমিক তাদের অভাব পূরণার্থে প্রাপ্ত মজুরী ব্যয় করে পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে। ফলে পণ্যের কার্যকর চাহিদা আবার বৃদ্ধি পায়। যাকাতদাতা বিনিয়োগকারীদেরকে আবার তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হয়। এভাবে পুনরায় তারা উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে। ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। বরং দ্বিতীয়বার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আবার শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। আবার কিছু বেকার লোক কাজ পায়, মজুরী পায়। নতুন করে তাদেরও ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এই ক্রয়-ক্ষমতা ব্যয় করে তারা আবার পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে। যাকাতদাতা বিনিয়োগকারীগণ আবারও বিনিয়োগ-উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তৃতীয়বার বিনিয়োগে আবার শ্রমিক লাগে। এইভাবে ধাপে ধাপে চলতে থাকে। মোট কথা, যাকাত ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে অপরিহার্য করে তোলে। অতঃপর যেহেতু বিনিয়োগ কেবল যাকাতদাতারাই করে সেহেতু আল্লাহ বলেছেন, 'সেই যাকাত দানকারীরাই'। আর তারা একবার বৃদ্ধি করে থেমে যায় না, ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করতে থাকে। এজন্য বলেছেন, 'বৃদ্ধি করতে থাকে'। আল্লাহর শব্দ প্রয়োগ যে কত বাস্তব তা অবশ্যই অনুধাবন করার বিষয়।

আল্লামা মওদূদী সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদাকাহ দান করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়। শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে উঠে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়.... সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং সব পরিবারই হয় সমৃদ্ধিশালী।"[১৩]

উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, আল্লাহ এই আয়াতের দ্বারা সুদ ও যাকাতের প্রকৃত অর্থনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। একদিকে আল্লাহ সুদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন এবং তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন; অপরদিকে, যাকাতের সুফলের কথা জানিয়ে যাকাতদাতাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

---

১৩. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

www.icsbook.info

সূরাতুন্নিসা

সূরাতুন্নিসার ১৬০-৬১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) .وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

"ইহুদী নীতি অবলম্বনকারীদের জুলুমের কারণে আমরা তাদের জন্য এমন অনেক পবিত্র জিনিস হারাম করে দিয়েছি যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল। আর এ কারণেও যে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকত এবং অন্য লোকদেরকেও ব্যাপকভাবে বিরত রাখতো; আর এ কারণেও যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো যদিও তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল; আর তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমরা পীড়াদায়ক আযাব তৈরী করে রেখেছি।"

পটভূমি ও মূল বক্তব্য

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর ৩য় হিজরী সালের শেষার্ধ থেকে ৪র্থ সালের শেষ অথবা ৫ম সালের ১ম ভাগের মধ্যেই সূরাতুন্নিসা নাযিল হয়েছে। মদীনায় সেকালে বেশ সংখ্যক ইহুদী গোত্র বাস করত। আর সেখানে ইহুদী গোত্র ও ঈমানদারদের বসবাস ছিল পাশাপাশি। সেখানে প্রধানত ইহুদীরাই সুদী কারবার করত। এই প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

সূরাতুন্নিসার এই আয়াতে আল্লাহ ইহুদীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন যে, ইহুদীদের জন্য সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; কিন্তু ইহুদীরা সে নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে সুদ গ্রহণ করেছে আর পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছে। সুদ গ্রহণ ও অন্যায় ভক্ষণসহ অন্যান্য জুলুমমূলক কাজ করায় ইহুদীরা দুনিয়ায় আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছে এবং পরকালে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়া-আখেরাতে ইহুদীদের এই ভয়াবহ পরিণতির ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরে আল্লাহ মানব জাতিকে সজাগ, সচেতন ও সতর্ক করেছেন, যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইহুদীদের আচরণ অনুসরণ না করে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে সুদের বাস্তব চেহারা উন্মোচন করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিলকৃত এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সুদের বাস্তব পরিণতির ঐতিহাসিক তথ্য-চিত্র তুলে ধরেছেন।

www.icsbook.info

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে সুস্পষ্টভাবে অন্যায় ভক্ষণের মধ্যে শামিল করেছেন এবং একে অতি বড় জুলুম বলে অভিহিত করেছেন। আর এই জুলুমকেই দুনিয়া-আখেরাতে গযব ও আযাবের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

১. সুদ একটি অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম

জুলুম শব্দ দ্বারা সাধারণত অবিচার ও বেইনসাফীকে বুঝায়। শব্দটি ইনসাফ বা সুবিচার শব্দের বিপরীত। সুবিচার হচ্ছে 'আদল' বা ন্যায়বিচার। আদল বা ন্যায়বিচার অর্থ হচ্ছে, ভারসাম্য ও সুষমতা এবং ন্যায্য অংশ নিশ্চিত করা। এর বিপরীত কাজ করার নাম হচ্ছে জুলুম। আল্লামা মওদূদী লিখেছেন, জুলুম শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, কারও অধিকার হরণ করা।[১৪] সে হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যাবতীয় অধিকার যথাযথভাবে ও সততার সাথে প্রদান করা হচ্ছে সুবিচার। আর এর বিপরীত, কোন ব্যক্তির প্রাপ্য বা তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করা বা তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হলে তাই হয় অবিচার বা জুলুম। আকরাম খান বলেছেন, "Zulm refers to all forms of inequity, injustice and exploitation."[১৫] অন্যায় ভক্ষণ একটি জুলুম; কারণ, এতে অপরের সম্পদ নেওয়া হয়, অথচ যার সম্পদ নেওয়া হয় তাকে কোন বিনিময় বা দাম দেওয়া হয় না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, জুয়া এগুলো সবই অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম।

আল্লাহ তা'য়ালা সুদগ্রহণ ও অন্যায় ভক্ষণকে একই আয়াতে এনে সুদকে অন্যায় ভক্ষণের মধ্যে শামিল করেছেন।[১৬] কারণ, সুদ গ্রহণ করে গ্রহীতা তার বিনিময় দেয় না। ড. সিদ্দিকী লিখেছেন, "......riba amounting to unlawful appropriation of other people's property is indicated in the verse."[১৭] আল-মারাগী বলেছেন, "সুদ বিনিময় ছাড়াই পরের ধন কেড়ে নেয়, এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে।"[১৮] তিনি বিনিময় ছাড়া মূলধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করাকেই সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] এ বিষয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, "জাহেলিয়্যাতের যুগে নাসিয়া সুদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাতে ঋণ ফেরত

---

১৪. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ *তাফহীমুল কুরআন*, সূরা লোকমান, টীকা-২১।

১৫. Khan, Mohammad Akram: *An Introduction to Islamic Economics,* The International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, Islamabd, 1994, p. 133.

১৬. চাপরা, এম, ওমর, *The Nature of Riba,* Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 6, No. 3, July-September, Summer Issue, 1989, p. 7.

১৭. সিদ্দিকী, এম, এনঃ *পূর্বোল্লেখিত*, পৃ. ৪৩।

১৮. *তাফসীরে আল-মারাগী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪-৮৭।

১৯. উপরোক্ত, উদ্ধৃত, আব্দুর রহীমঃ *আল-কুরআনে অর্থনীতি*, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ২৪২।

www.icsbook.info

দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো এবং সেই হিসেবে ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি করে দেওয়া হতো। একশত টাকা কয়েক শত গুণ বেড়ে হাজার টাকায় পরিণত হতো। ফলে এ সুদে ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত তীব্র ও সাংঘাতিক রূপ পরিগ্রহ করতো। ঋণগ্রহীতার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তিই গ্রাস হয়ে যেত এবং সে সুদ বাবদ বিপুল সম্পদ দিয়ে দিতে বাধ্য হতো তার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হওয়া ছাড়াই। আর ঋণদাতা অতিরিক্ত সম্পদ নিয়ে নিত তার ভাইকে কোন রূপ ফায়দা না দিয়েই। ফলে ভাইয়ের সম্পদ বাতিল ভক্ষণে পরিণত হতো; আর তার ভাই সে কারণে কঠিন বিপদে পড়ে যেত। এই প্রেক্ষিতে সুদ হারাম করা হয়েছে, যা জনগণের জন্য মারাত্মক জুলুম।"[২০]

২. ইহুদী জাতির সুদখোরী

বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ইহুদী স্বর্ণকারদের (Goldsmiths) হাতে হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে মনে করা হয়। সুদূর অতীতে এক সময়ে স্বর্ণই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। সে সময়ে কেউ সোনা সঞ্চয় করলে নিরাপদ হেফাজতের জন্য তা ইহুদী গোল্ডস্মিথদের কাছে গচ্ছিত রাখত এবং এ মর্মে একটি রসিদ লিখে নিত। কালক্রমে এই রসিদগুলোই বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠে। ফলে দরকার না হওয়ায় সোনা জমাকারীগণ তাদের গচ্ছিত স্বর্ণ তুলে নিতে আসতো না। সোনা সারা বছর গোল্ডস্মিথদের সিন্দুকেই পড়ে থাকতো। এই সুযোগে গোল্ডস্মিথগণ গচ্ছিত সোনা ধার দিয়ে তার ওপর সুদ আদায় করতে লাগল। অতঃপর গোল্ডস্মিথগণ যখন বুঝতে পারল যে, স্বর্ণ ঋণগ্রহীতারাও রসিদ দিয়েই বিনিময়ের কাজ চালাচ্ছে, স্বর্ণ তুলে নিতে খুব কম ঋণগ্রহীতাই আসছে, তখন তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। এবার তারা একই সোনার বিপরীতে বহুসংখ্যক জাল জমার রসিদ তৈরী করে সেই (জাল) রসিদগুলো ধার দিয়ে তার ওপর সুদ গ্রহণ করতে লাগলো। গোল্ডস্মিথেরা এভাবেই সম্পূর্ণ ভুয়া মুদ্রার আকারে শতকরা ৯০ ভাগ জাল মুদ্রা তৈরী করে তার মালিক সেজে প্রভূত পরিমাণে সুদ অর্জন করত।

নিঃসন্দেহে এটি একটি অতি বড় প্রতারণা ও জালিয়াতি ব্যবসা। কিন্তু দেশের রাজা, মন্ত্রী, আমীর-উমারা সবাই পুঁজিপতিদের ঋণের জালে আটকা পড়েছিল। এমনকি, যুদ্ধ এবং অন্যান্য সংকট মুকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারও তাদের কাছ থেকে বড় বড় ঋণ নিয়েছিল। ফলে সুদখোরদের এই জালিয়াতি ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নৈতিক বল ও শক্তি-সাহস কারও ছিল না। এভাবেই এই বিরাট প্রতারণা ও জালিয়াতি কারবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে; শুধু তাই নয়, বরং সরকারসমূহের দুর্বলতার সুযোগে পুঁজিপতিগণ নানা কৌশলে একে আইনত বৈধ করে নিয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত সকল আইন যাতে তাদের স্বার্থের পক্ষে থাকে তারও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা

---

[২০] উদ্ধৃত, আব্দুর রহীমঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

www.icsbook.info

তারা করে নিয়েছে। আধুনিককালে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকের জাদুকরী ক্ষমতা বলে খ্যাত Multiple credit creation-এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো যা করছে তা গোল্ডস্মিথদের এই জালিয়াতি পদ্ধতি বৈ কিছু নয়।

ইহুদীরা যে সুদ গ্রহণ করতো, তা আরবে প্রচলিত সুদের অনুরূপ ছিল। আল-তাবারি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "তারা (ইহুদীরা) যে সুদ গ্রহণ করতো তা আসল পরিমাণের ওপর পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানোর বিনিময়ে অতিরিক্ত হিসেবে ধার্য করা হতো।[২১] এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে সে কালে "ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্ট দায়ের ওপর রিবা ধার্য করা হতো।"[২২]

বনি ইসরাঈলদের মধ্যে প্রচলিত সুদের বর্ণনা দিয়ে বাদাবী বলেছেন, "বনি ইসরাঈলদের সুদ মুদ্রার ওপর ধার্য করা হতো। আর সেকালে রৌপ্য ও খাদ্য-দ্রব্যই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[২৩] তিনি বলেছেন, বনি ইসরাঈলদের মধ্যে প্রচলিত সুদ ও জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত সুদ ছিল এক ও অভিন্ন এবং আজও ইহুদীদের মধ্যে সেই সুদই চালু রয়েছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে প্রচলিত সুদ হচ্ছে, ঋণের ওপরে সময়ের ভিত্তিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত, যদিও সুদের হারে পরিবর্তন হয়েছে।"[২৪]

বস্তুতঃ ইহুদীরা সুদী কারবারে এতটাই অভ্যস্ত ও মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সুদের নিষেধাজ্ঞাকে নিজেদের পক্ষে পরিবর্তন করে নেওয়ার দুঃসাহস দেখাতেও কুণ্ঠিত হয়নি। সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদী কারবারের বিভিন্ন পর্যায়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয়। ফলে সুদ মানুষের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন মানসিকতার জন্ম দেয়।[২৫] ঝুঁকিমুক্ত, নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিবেচনা, আচার-আচরণ, এমনকি, বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং মানুষের ন্যায়-অন্যায়বোধকে বিকৃত করে দেয়। স্বার্থের কারণে মানুষ যে কোন ন্যায়কে অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইহুদী জাতির এই অবস্থাই হয়েছিল।

---

২১. আল-তাবারি: *জামে আল-বয়ান*, ভলি-৬, পৃ. ১৭।

২২. বাদাবী, যাকি আল-দ্বীন: *Theory of Prohibited Riba,* ইংরেজী অনুবাদ, ইমরান আহসান খান নিয়াজী, info@nyazee.com, ২০০৪, পৃ: ৭৮।

২৩. বাদাবী, যাকি আল-দ্বীনঃ উপরোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

২৪. বাদাবী, যাকি আল-দ্বীন, উপরোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

২৫. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

www.icsbook.info

৩. ইহুদী জাতির শাস্তি

সুদের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে সুদ গ্রহণ ও পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস ইত্যাদি জুলুম করার কারণে আল্লাহ এ দুনিয়াতে ইহুদীদের জন্য কতিপয় পবিত্র ও হালাল খাদ্য হারাম করে দিয়েছেন। এ নিষেধাজ্ঞা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং শেষ দিন পর্যন্ত তারা এ শাস্তি ভোগ করবে।

কুরআন মজীদের অন্য আয়াত থেকে জানা যায় ইহুদীদের জন্য যেসব হালাল জিনিস হারাম করা হয়েছিল সেগুলো ছিল খুর বিশিষ্ট সকল জন্তুর গোশ্‌ত এবং গাভী ও ছাগলের চর্বি (৬:১৪৬)। আল-কুরআন এ কথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল (ইয়াকুব আঃ) নিজে এসব জিনিস ব্যবহার করতেন না (৩:৯৩)। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করে ইহুদীদের জন্য এসব খাদ্য হারাম করেছেন– ব্যাপার আসলে তা নয়; বরং নবী ব্যবহার না করায় পরবর্তী বংশধরেরা তা বর্জন করেছে। কালক্রমে তাদের আলেম ও ফকীহ্‌গণ এসবকে হারাম মনে করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া জুলুমবাজ, কৃত্রিম ও জাল আইন প্রণেতারা এসব ভাল ও পাক জিনিস হারাম করে আইন প্রণয়ন করে আল্লাহর বিধান বলে জারি করে দিয়েছে এবং পরবর্তীতে তাওরাতে সংযোজন করে নিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বর্তমান ইহুদী শরীয়ত লিপিবদ্ধ করার কাজ দ্বিতীয় খৃস্টাব্দের শেষের দিকে .....ইয়াহুদার হাতে সম্পন্ন হয়েছে।[২৬]

উপরোক্ত শাস্তি ছাড়াও সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ দুনিয়াতে ইহুদীদের ওপর নিপতিত গযবের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে ঃ

"এরা যেখানে গিয়েছে সেখানেই এদের ওপর অপমানের মার পড়েছে, আল্লাহর দায়িত্বে কিংবা মানুষের দায়িত্বে কোথাও কিছু আশ্রয় পেয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। আল্লাহর গযব তাদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে; তাদের ওপর অভাব, দারিদ্র্য ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এসব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করেছে এবং পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। বস্তুতঃ এটা তাদের নাফরমানি ও অত্যধিক বাড়াবাড়ির ফল।" (৩:১১২)

আল্লাহর আদেশ অমান্য, আল্লাহর নাফরমানি ও বাড়াবাড়ি করার কারণেই ইহুদীরা উক্ত গযবে নিপতিত হয়েছে আয়াতে স্পষ্ট করেই সে কথা বলা হয়েছে। আর সুদের নিষেধাজ্ঞা লংঘন, সুদ গ্রহণ ও পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়াও আল্লাহর আদেশ অমান্য, আল্লাহর নাফরমানি ও বাড়াবাড়ি করার মধ্যে শামিল। ইহুদীরা সুদের

---

২৬. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ *তাফহীমুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

www.icsbook.info

নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সুদ খেয়েছে শুধু তাই নয়, তারা সুদের আয়াত পরিবর্তন করার ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করেছে। এছাড়া আল্লাহর কিতাবে প্রদত্ত খাদ্য সংক্রান্ত বিধানকেও তারা বদলিয়ে ফেলেছে।

বস্তুতঃ দুনিয়ায় যারা সুদ খায় তারা সমাজে সুদখোর-শোষক বলে ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়। দুনিয়ার সর্বত্র সুদখোর মহাজনদের দিকে তাকালে এর সত্যতা পাওয়া যায়। ইহুদীরা জাতি হিসেবে সুদখোর; আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা তাদের বৈশিষ্ট্য। তাদের শাস্তি অনেক বেশি ও ব্যাপক। মার্চেন্ট অব ভেনিসের শাইলক হচ্ছে ইহুদীদের প্রতিভূ-শোষক-ঘৃণ্য। "পৃথিবীর অন্যান্য জাতি দুনিয়ায় যে সব উত্তম জীবিকা উপভোগ করে, সুদীর্ঘকাল ইহুদীদের সেসব থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।[২৭] দুই হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও তারা সম্মানজনক আশ্রয় পায়নি। দুনিয়ায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই বিশ্বের কোথাও না কোথাও তাদের লাঞ্ছিত ও পদদলিত করা হয়েছে। অগাধ ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার কোথাও তাদের এক বিন্দু শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়নি। দুনিয়ার বুকে এ জাতিকে না-মৃত্যু না-জীবন-এর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যেন কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জাতিসমূহের জন্য এরা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। এদের ইতিহাস যেন চিরদিন দুনিয়াকে এ শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহর কিতাব নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ অবলম্বন করার দুঃসাহসের পরিণতি কি হয়। এরপর পরকালের আযাবতো আরও অধিক ভয়ঙ্কর হবে।"[২৮] বস্তুতঃ সুদ দুনিয়ায় ঘৃণা, অপমান, জিল্লতি আর পরকালীন আযাবের বাহক। ইহুদী জাতি তার সাক্ষী।

---

২৭. আসাদ, মুহাম্মদ: *দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন*, দারআস্‌সালাম, জিব্রালটার, ১৯৮০, পৃ. ১৩৫।

২৮. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা: পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

www.icsbook.info

সূরাতু আলে-ইমরান

সূরাতু আলে ইমরানের ১৩০-১৩৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

"হে ঈমানদারগণ, দ্বিগুণ-চতুর্গুণ-বহুগুণ বর্ধিত সুদ খেয়ো না; আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। আর সেই আগুনকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। তোমার রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও, যা আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় বিস্তৃত এবং যা সেই মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থাতেই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে, যারা ক্রোধ হজম করে এবং মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ মুহ্সিন লোকদের ভালবাসেন।"

পটভূমি

বিশিষ্ট তাফসীরকারদের মতে, আল-কুরআনের সুদের আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখিত আয়াত কয়টি তৃতীয় পর্যায়ে উহুদ যুদ্ধের পরে নাযিল করা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রথমে বিজয়ী হয়েছিল; কিন্তু শেষে মুসলিমগণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ নিজে উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে– সম্পদের লোভ। এই লোভ তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, এই লোভই তাদেরকে নেতা তথা নবীর (সাঃ) আদেশ লংঘনে ঠেলে দিয়েছে; এই লোভই মহাবিপর্যয় বয়ে এনেছে (৩:১৫২)। আল্লামা মওদূদী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "প্রকৃত সাফল্য ও বিজয় লাভের সময়ে মুসলিম সৈনিকগণ দুনিয়ার ধন-সম্পত্তির লোভে পড়ে গিয়েছিলেন এবং শত্রু সৈন্যদেরকে খতম করে নিজেদের বিজয়কে পূর্ণ করার পরিবর্তে গনীমতের মাল সংগ্রহে লেগে গিয়েছিলেন। যে তীরন্দাজ বাহিনীকে পশ্চাৎ দিকের প্রতিরক্ষার জন্য নবী করীম (সাঃ) মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন দেখলেন যে, শত্রুসৈন্য পলায়ন করছে, আর মুসলিম সৈনিকগণ শত্রুদের ফেলে যাওয়া ধন-মাল সংগ্রহ করছেন, তখন তারা এই দুশ্চিন্তায়

www.icsbook.info

পড়ে গেলেন যে, গনীমতের মাল সবই বুঝি সেই সংগ্রহকারীরাই নিয়ে যাবেন; আর তারা নিজেরা গনীমত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন। এই চিন্তা করে নবীর (সাঃ) আদেশ স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।[২৯] আর এই গিরিপথ দিয়ে মুসলমানদের ওপর বিপর্যয় নেমে এলো। শত্রুবাহিনী গিরিপথ দিয়ে ঢুকে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো; আর সামনে যারা পালিয়ে যাচ্ছিল তারাও ফিরে দাঁড়ালো। এই সাঁড়াশী আক্রমণের মুকাবিলায় গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের অর্জিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো।[৩০]

আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নেতৃত্বে সংগঠিত ঈমানদারদের এই দলটিকে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন করবেন এবং বিশ্বমানবতার কল্যাণে তাদের নিয়োজিত করবেন। কিন্তু মনের কোণে সম্পদের মোহ ও লোভ, উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতার অভাব, অনৈক্য ও নেতার আদেশ পালনে নিষ্ঠার অভাব বিদ্যমান থাকলে কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে মানুষের কল্যাণার্থে মহৎ ও বৃহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা উহুদের পরীক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে যাদের অন্তরে এইসব রোগ ছিল তাদের সে রোগ বের করে আনার ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ নিজে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন, তাদের বিপর্যয়ের কারণ কি, কোন্ কোন্ দুর্বলতার কারণে তাদের এই বিপর্যয় হলো; তারা মর্মাহত ও অনুতপ্ত হয়েছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব অবস্থায় ঈমানদার এ বাহিনীকে সম্পদের মোহমুক্ত, নির্লোভ, পরকালমুখী ও একমাত্র আল্লাহনির্ভর, সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সুদরূপী অতি লোভনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে আয়াত কয়টি নাযিল করা হয়।

মূল বক্তব্য

এই আয়াতগুলোর শুরুতেই মহান প্রভু আল্লাহ ঈমানদারদের সম্বোধন করেছেন এবং সুদ খেতে মানা করেছেন; কারণ সুদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি পায় যা অতি বড় শোষণ, অবিচার ও জুলুম। অতঃপর ঈমানদারগণ যাতে সফল হতে পারেন আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত পেয়ে ইহ-পরকালীন জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারেন সে লক্ষ্যে আল্লাহ কতিপয় হেদায়াত দিয়েছেন। হেদায়াতগুলো হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহকে ভয় করা তথা তাকওয়া অবলম্বন করা;
২. জাহান্নাম তথা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা;

---

[২৯] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬, ৭৮, ৮০।

[৩০] সিদ্দিকী, নাঈম, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)*, বাংলা অনুবাদ, আকরাম ফারুক, সম্পাদনা, আব্দুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫১-৩৫৪।

www.icsbook.info

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা;
৪. আল্লাহর ক্ষমা ও বেহেশত পাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা;
৫. নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা এবং
৬. ক্রোধ হজম ও অপরকে ক্ষমা করা।

দেখা যাচ্ছে, সুদ বর্জনে মুমিনদের অভ্যস্ত করা এবং পরিবেশ গড়ে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। নিচে কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো :

১. আদয়াফাম মুদায়াফাহ

আলোচ্য আয়াত কয়টির প্রথমেই আল্লাহ সুদ খেয়ো না বলেছেন এবং 'আদয়াফাম মুদায়াফাহ' বিশেষণ দ্বারা সুদকে বিশেষায়িত (qualify) করেছেন। কোন কোন তাফসীরকার ও অনুবাদক এর অর্থ করেছেন চক্রবৃদ্ধি সুদ।[৩১] এতে কিছু কিছু লোক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করে থাকে। তারা বলে আল-কুরআনতো কেবল চক্রবৃদ্ধি ও উচ্চ হারের সুদ নিষিদ্ধ করেছে, সরল ও নিম্ন হারের সুদ হারাম করেনি। তারা এ পর্যন্ত বলে যে, ব্যাংক ঋণে সুদের হার যদি সরল ও নিম্ন হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ সুদের আওতায় পড়বে না।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এখানে সুদের কোন বিশেষ ধরন নয় বরং সুদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য তথা স্বভাবধর্ম (Nature) কে বুঝিয়েছেন। সুদের স্বভাব হচ্ছে, সময়ের গতির সাথে ধাপে ধাপে গুণে গুণে বৃদ্ধি পাওয়া। ইমাম শাওকানী লিখেছেন, শব্দ দুটি বুঝিয়ে দেয় যে, সুদের মাত্রা বারবার বৃদ্ধি করা হতো।[৩২] একইভাবে সাইয়েদ কুতুব শহীদ লিখেছেন, "সুদী কারবার একদিক দিয়ে পুনরাবৃত্তিসম্পন্ন ব্যবস্থা, আর অপরদিক দিয়ে তা যৌগিকও; তা সময়ের অগ্রগতির সাথে বারবার আবর্তিত হওয়ার দরুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এটা সুদী ব্যবস্থার স্বভাবধর্ম।"[৩৩] ইংরেজীতে রচিত তাফসীর ও তরজমা গ্রন্থসমূহে 'আদ্‌য়াফাম মুদায়াফাহ'-এর অর্থ করা হয়েছে, Double, Redouble, Multiple. এর দ্বারা সুদ বৃদ্ধি পাওয়া তথা দ্বিগুণ, চর্তুগুণ, বহুগুণ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। ড. হাসানুজ্জামান বলেছেন যে, সুদের হার যত কমই হোক, সময়ের সাথে তা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ– এই গতিতে বাড়তে থাকে। সুদ যদি সরলও হয় তা হলেও এভাবেই বৃদ্ধি পায়। তিনি অতি নিম্ন হার ও সরল সুদের হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, বার্ষিক সরল সুদের হার যদি মাত্র ২.০০ টাকা হয় তাহলে ১০০.০০ টাকার ১ বছরে সুদ হবে ২.০০ টাকা, দুই বছরে ৪.০০ টাকা, তিন বছরে ৬.০০ এবং চার বছরে সুদ হবে

---

[৩১] আব্দুর রহীমঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫। সাইয়েদ কুতুব শহীদঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫, শাফী, মুফতী মুহাম্মদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

[৩২] উদ্ধৃত, আব্দুর রহীমঃ *তফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

[৩৩] কুতুব, সাইয়েদ শহীদঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

www.icsbook.info

৮.০০ টাকা; অর্থাৎ প্রথম বছর একগুণ, দ্বিতীয় বছরে এর দ্বিগুণ, তৃতীয় বছরে তিনগুণ, ৪র্থ বছরে চারগুণ। প্রতিবছর একগুণ করে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সুদ এভাবে এই গতিতে বাড়তে থাকে যদি আসল পরিশোধ করা না হয়। সুদ যদি চক্রবৃদ্ধি হারের হয় তাহলে বৃদ্ধির গতি আরও বেশি হবে সন্দেহ নেই।[৩৪] সুতরাং 'আদ্‌য়াফাম-মুদায়াফাহ'-এর অনুবাদ চক্রবৃদ্ধি সুদ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়ার পরিবর্তে এর অনুবাদ গুণে গুণে বৃদ্ধি পাওয়া করাই ভাল। এটাই হচ্ছে সুদের স্বভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি।

২. তাকওয়া

বস্তুতঃ তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহভীতি। আল্লাহ সর্বশক্তিমান (Omnipotent), আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান (Omnipresent) এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ এই ধারণা মনে বদ্ধমূল করে নেওয়া, সর্বদা আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও ভয় জাগরূক রাখা এবং দুনিয়ার কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখেন, দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ জানেন, দুনিয়ার কোন পুলিশ ধরতে না পারলেও আল্লাহর কাছে ধরা পড়তে হবে, দুনিয়ার আদালত থেকে বাঁচলেও আল্লাহর আদালত থেকে নিস্তার নেই– এই অনুভূতিই হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া মানুষকে স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে। কোন লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি ও দুর্বলতাই তাকে আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত রাখতে পারে না। অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করার মূল প্রেরণা ও চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মানব জীবনে সফল, বিশেষ করে, সুদ খাওয়ার ন্যায় লোভনীয় কাজ বর্জনে সফল হওয়ার (ফালাহ্ লাভ করার) জন্য আল্লাহ এখানে তাকওয়ার বলে বলীয়ান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. জাহান্নামের ভয় ও বেহেশতের আশা

আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন তথা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা এবং আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে কাফেরদের জন্য; আর জান্নাত তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে। অতঃপর আল্লাহ্ সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থাতেই নিজেদের সম্পদ ব্যয়, ক্রোধ সংবরণ এবং মানুষকে ক্ষমা করা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪. আল্লাহর পথে ব্যয়

বস্তুতঃ সুদ ও আল্লাহর পথে ব্যয় পরস্পর বিপরীতমুখী। সুদ হচ্ছে বিনিময় না দিয়ে জনসাধারণের সম্পদ শোষণ করে কতিপয় পুঁজিপতির সম্পদ ফাঁপিয়ে তোলা;

---

[৩৪] হাসানুজ্জামান, এন, এম: *Conceptual Foundations of Riba in Quran, Hadith and Fiqh,* জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স, জানু-মার্চ, ১৯৯৪, পৃ. ১১-১২।

www.icsbook.info

স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, কৃপণতা ও কাঠিন্য হচ্ছে সুদের উৎস। অপরের অভাব ও প্রয়োজনকে পুঁজি করে নিজ সম্পদ বৃদ্ধির মানবতাবিরোধী ও পৈশাচিক মানসিকতা তথা পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও উদারতা ইত্যাকার মানবিক গুণের প্রচণ্ড অভাবই হচ্ছে সুদের চালিকাশক্তি। সুদ লোভ-লালসা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতাকে লালন ও বিস্তৃত করে; আর মানবিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার জন্ম দেয়।

অপরদিকে, আল্লাহর পথে ব্যয়, তথা যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত হচ্ছে, যাদের আছে তাদের কাছ থেকে যাদের নেই তাদের কাছে সম্পদ পৌছানোর এক মহৎ প্রক্রিয়া। বস্তুতঃ আল্লাহর সংরক্ষিত আমানত আল্লাহকে ফেরত দেওয়ার গভীর অনুভূতি, আর সহ-যাত্রী মানবকুলের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মানবতাবাদী উদার মানসিকতা হচ্ছে আল্লাহর পথে ব্যয়ের চালিকাশক্তি। আল্লাহর পথে ব্যয় মানবতাবোধ, পারস্পরিক দরদ, সহমর্মিতা, মানবীয় অধিকারের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহৃদয়তা, সম্প্রীতি, মানবপ্রেম, উদারতা ইত্যাকার মহৎ গুণকে লালন, সম্প্রসারণ ও বিস্তৃত করে দেয়; সামাজিক বন্ধন হয় সুদৃঢ়, ঐক্য ও সংহতি হয় মজবুত। ক্রোধ, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা হয় বিরল। সমাজের ব্যক্তিরা হয়ে উঠে মুহ্‌সিন। আর এই মুহ্‌সিনদেরই আল্লাহ ভালবাসেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

সূরাতুল বাকারাহ

সূরাতুল আল-বাকারাহর ২৭৫-২৮১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١)

"যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থজ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম। যে ব্যক্তির নিকট তার রবের কাছ থেকে এই নির্দেশ পৌঁছেছে, আর সে তা (সুদ খাওয়া) ছেড়ে দিয়েছে, সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তো খেয়েই ফেলেছে, সে ব্যাপারটি আল্লাহর ওপরই সোপর্দ। কিন্তু যারা (সুদ খাওয়া) পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে। (২৭৫)

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর সাদাকাহকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন; আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে মোটেই পছন্দ করেন না। (২৭৬) যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে তাদের প্রতিফল তাদের রবের নিকট রয়েছে; আর তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। (২৭৭) হে ঈমানদারগণ!

www.icsbook.info

আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সুদ পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা **ঈমানদার হয়ে থাক**। (২৭৮)

অতঃপর তোমরা যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের **ঘোষণা শুনে রাখ**। আর তোমরা যদি তাওবা কর (ফিরে আস), তাহলে তোমাদের **আসল তোমাদের** (আসল ফেরত পাবে)। তোমরা জুলুম করবে না, আর তোমাদের **প্রতিও জুলুম** করা হবে না। (২৭৯)

আর ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাদের সময় দাও। আর যদি সাদাকাহ্ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে পার। (২৮০) আর সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে; অতঃপর সেখানে প্রত্যেককে তার উপার্জনের ফলাফল পুরোমাত্রায় দিয়ে দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।" (২৮১)

পটভূমি

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সুদ সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মধ্যে উল্লেখিত আয়াত কয়টি চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে মক্কা বিজয়ের পর নাযিল করা হয়েছে। ড. উমর চাপরা বলেছেন, "রাসূল (সাঃ)-এর মিশন পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে এই আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে।[৩৫] ইতোপূর্বে তিন পর্যায়ে সুদের আয়াত নাযিল করে এ বিষয়ে শিক্ষাদান, সতর্কীকরণ ও পরিবেশ তৈরীতে ১৬/১৭ বছর চলে গেছে।,ইতোমধ্যে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ মজবুত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ রাষ্ট্রের স্থায়ী বিজয় সাধিত হয়েছে। ইসলাম মদীনা-মক্কার বাইরে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় আইন জারী করে তা বাস্তবায়ন করার পরিবেশ ও ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। মুমিন নারী-পুরুষ ইতোমধ্যে সুদ বর্জন করে চলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আশা করা যাচ্ছিল যে, সুদ নিষিদ্ধ করে আইন জারী করা হলে তাঁরা তার পূর্ণ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সফল হবেন। এমনি সময়ে মহাবিজ্ঞ আল্লাহ্ সুদকে আইনত নিষিদ্ধ করে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

মূল বক্তব্য

সুদকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধানই হচ্ছে আলোচ্য আয়াত কয়টির মূল বিষয়। ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে বিদ্যমান প্রকৃতিগত পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল ও সুদ হারাম বলে জানিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি আল্লাহ এখানে সুদখোরদের তিরস্কার করেছেন। তাদের অযৌক্তিক কথার প্রতিবাদ করেছেন, তাদেরকে বুদ্ধিভ্রষ্ট-পাগল আখ্যায়িত করেছেন। এই আইন নাযিলের

---

[৩৫] চাপরা, ড. এম, উমরঃ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭-৮।

www.icsbook.info

পরেও যারা সুদ লেনদেন অব্যাহত রাখবে তাদেরকে জাহান্নামের চিরন্তন আযাবের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে, উল্লেখিত বিধি-বিধান মেনে চলার জন্য মুমিনদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন; ঈমান আনা, নেক আমল করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদানের প্রতিফল ও পুরস্কার দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং এই শ্রেণীর লোকদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই বলে তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আবারও জানিয়ে দিয়েছেন, সুদের পরিণাম ধ্বংস আর সাদাকাহর সুফল হচ্ছে ক্রমবৃদ্ধি। পরিশেষে, শেষ বিচার দিনে সকল মানুষের আল্লাহর সামনে হাজির হতে বাধ্য হওয়া এবং আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ন্যায়বিচার অনুসারে প্রত্যেকের প্রতিফল প্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১. বিধি-বিধান

এ আয়াতগুলোতেই আল্লাহ সুদ আইনত নিষিদ্ধ বলে জানিয়ে দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কিত মৌলিক আইন-বিধান নাযিল করেছেন। মুফতী শাফী বলেছেন, "এখানে রিবা অর্থাৎ সুদের অবৈধতা এবং তার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।"[৩৬] এখানে বর্ণিত সুদের বিধি-বিধানগুলো হচ্ছে ঃ

১. ক্রয়-বিক্রয় বৈধ; সুদ নিষিদ্ধ;
২. এই আইন জারী হওয়ার সাথে সাথে সুদ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সুদ লেনদেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে;
৩. এই নিষেধাজ্ঞা নাযিলের পূর্বে খাওয়া সুদের ব্যাপারে ফায়সালার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে হবে। দুনিয়ায় এ বিষয়ে অভিযোগ, দাবী-দাওয়া বা মামলা-মোকাদ্দমা করা যাবে না;
৪. সুদের চলমান চুক্তিসমূহ বাতিল এবং এসব চুক্তির বলে পাওনা সুদের সাকুল্য দাবী অবৈধ বিবেচিত হবে;
৫. এই আইন জারী ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) পক্ষের শক্তি সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই এখতিয়ার ও ক্ষমতা বলে সরকার প্রয়োজনে সুদের আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারবে;
৬. ঋণদাতাগণ তাদের প্রদত্ত মূল্যের কাউন্টার ভ্যালু ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে; তবে শর্ত হচ্ছে তাদের সুদ থেকে তাওবা করতে বা ফিরে আসতে হবে;
৭. আসলের প্রতিমূল্যের বেশি নিলে ঋণদাতা জুলুমকারী (সুদ গ্রহণকারী) হিসেবে শাস্তি পাবে;

---

৩৬. শাফী, মুফতী মুহাম্মদঃ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

www.icsbook.info

৮. **ঋণগ্রহীতা যদি আসলের প্রতিমূল্যের** চেয়ে কম দেয় বা আসল মোটেই না দেয়, **তাহলে সেও জুলুম করার অপরাধে (সুদগ্রহীতা)** অপরাধী হিসেবে শাস্তি পাবে;

৯. **ঋণগ্রহীতা যদি অসচ্ছল হয়ে পড়ে এবং যথাসময়ে** গৃহীত ঋণের কাউন্টার ভ্যালু **পরিশোধ করতে অক্ষম হয়**, তাহলে সামর্থ ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে সময় দিতে **হবে; আদালত এ মর্মে ঋণ**দাতাকে নির্দেশ দিতে পারবে।

১০. **আর আদালতের** কাছে যথার্থ বিবেচিত হলে আদালত ঋণদাতাকে তার পাওনা **মাফ** করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

২. সুদখোর বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগল

মহাজ্ঞানী আল্লাহ এখানে সুদখোরদের বুদ্ধিভ্রষ্ট-পাগল আখ্যায়িত করেছেন। কোন কোন স্কলার মনে করেন, "এই আয়াতে সুদখোরদের যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা পরকালীন জীবনে শেষ বিচারের দিন ঘটবে, পার্থিব জীবনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।"[৩৭] কিন্তু দুনিয়াতেও সুদখোরদের মধ্যে এরূপ পাগলামি লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ শয়তান সুদখোরদেরকে সম্পদের মোহে এমন আচ্ছন্ন করে দেয় যে, তারা ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের পার্থক্যটুকুও বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। এটাই হচ্ছে সুদখোরদের ব্যক্তিত্বের ওপর সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ সুদ সুদখোরদের ব্যক্তিত্বকে হ্রাস (diminishes) ও হেয় (demeans) করে দেয়।[৩৮] তারা পাগল হয়ে অর্থ-সম্পদের পেছনে ছুটে বেড়ায় আর ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। তারা ক্রয়-বিক্রয়, মুনাফা ও সুদকে একাকার ও সমান মনে করে; আর বলে 'ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মতই'। এটি তাদের একটি "যুক্তিহীন কথা (Flimsy argument), একটি ফাঁদ (a trap), একটি খাঁটি প্রতারণা (Pure hoodwinking) ও একটি পুরাতন চালবাজি (old trick)।"[৩৯] মক্কার কাফের নেতারা তাদের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই চালবাজির আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের দিনেও সুদখোরদের মধ্যে এমনি পাগলপারা অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তারা চায় লাভ, সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত লাভ। তাদের স্বার্থেই তারা বলে, সুদ হচ্ছে অর্থনীতির চালিকাশক্তি, সুদ ছাড়া অর্থনীতি অচল, সুদই উন্নয়নের চাবিকাঠি ইত্যাদি।

কিন্তু তাদের সুদখোরীর কারণে অর্থনীতির ওপর কিরূপ ধ্বংসকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো, কত লোকের ধ্বংস ও দুরবস্থার বিনিময়ে তাদের সুদী আয় অর্জিত হলো, মানবিক

---

[৩৭] সিদ্দিকী, *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition,* Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, KSA, 2004, পৃ. ৪৪।

[৩৮] সিদ্দিকী, উপরোক্ত, পৃ. ৩৬।

[৩৯] সিদ্দিকী, উপরোক্ত, পৃ. ৪৪ ও ৪৭।

www.icsbook.info

প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির মূলে কি আঘাত পড়লো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়লো ইত্যাদি বিষয় তাদের বুদ্ধিতে ধরে না, এজন্য কোন মাথা ব্যথাও তাদের নেই। এই অবস্থায়ই তারা বাঁচে, এই অবস্থায়ই তারা মরে এবং এই অবস্থাতেই তারা কবর থেকে উত্থিত হবে। সুতরাং "আল্লাহর এ বাণী ইহকাল-পরকাল উভয় জীবনের জন্যই বাস্তব ও সত্য।"[৪০]

৩. ক্রয়-বিক্রয় হালাল, সুদ হারাম

এটি হচ্ছে আল্লাহর একটি প্রাকৃতিক (natural), স্বাভাবিক, শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান। হালাল মানে বৈধ আর হারাম হচ্ছে অবৈধ। মানুষের জন্য দুনিয়া-আখেরাতে যা কিছু কল্যাণকর আল্লাহ্ মানবজাতির জন্য তাই হালাল করেছেন; অপরদিকে মানুষের জন্য অকল্যাণকর সব কিছুকে তিনি হারাম করেছেন।

এখানে আল্লাহ আল-বাই শব্দ ব্যবহার করে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝিয়েছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল কথা হচ্ছে সমান সমান মূল্য ও পারস্পরিক বিনিময়। এই বিনিময় ছাড়া মানব সমাজ চলতে পারে না। মানুষের অভাব অসংখ্য ও অগণিত। পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে সকলের সকল অভাব পূরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুতরাং বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় মানব জাতির জন্য কেবল জরুরী নয়, মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। বস্তুতঃ ক্রয়-বিক্রয় মানুষের জন্য উপকারী, অপরিহার্য, ইনসাফপূর্ণ এবং হালাল।

অতঃপর আল্লাহ আল-রিবা শব্দ ব্যবহার করে সকল প্রকার রিবাকে বুঝিয়েছেন। রিবা অর্থ হচ্ছে 'বৃদ্ধি', বিনিময় ছাড়া বৃদ্ধি, এক পক্ষের দেয় মূল্যের ওপরে বৃদ্ধি অপরপক্ষের দেয় মূল্যের ওপর বৃদ্ধি ছাড়াই। এমতাবস্থায়, এক পক্ষ সেই অতিরিক্ত দেয় যার কোন বিনিময় সে পায় না; আর অপরপক্ষ সেই অতিরিক্ত নেয় যার কাউন্টার ভ্যালু সে দেয় না। এটা হয় বিনিময় না দিয়ে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা ভক্ষণ করা। সুতরাং পরিমাণে কম-বেশি যাই হোক পরের সম্পদ অন্যায় ভক্ষণে মানব সমাজের জন্য কোন উপকার ও কল্যাণ থাকতে পারে না; বরং তা অবশ্যই ক্ষতিকর, অকল্যাণকর এবং ধ্বংসের বাহন। সুতরাং হারাম।

মূলকথা দাঁড়াচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয় চিরদিনই মানুষের জন্য অপরিহার্য ও কল্যাণকর এবং হালাল; অপরদিকে সুদ সর্বদাই মানব জাতির জন্য অকল্যাণকর, ক্ষতিকর ও হারাম।

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম"– এই বাক্য দ্বারা আল্লাহ উক্ত প্রাকৃতিক (Natural), শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যেরই ঘোষণা দিয়েছেন। পরবর্তীতে ক্রয়-বিক্রয়, মুনাফা, ভাড়া ও সুদের বিস্তারিত তুলনা করা হবে।

---

৪০. সিদ্দিকী, উপরোক্ত, পৃ. ৪৪।

www.icsbook.info

৪. সুদ একটি জুলুম

২৭৯ আয়াতে আল্লাহ্ সুদ লেনদেনকে জুলুম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঋণদাতার পাওনা হচ্ছে তার প্রদত্ত আসল মূল্যের কাউন্টার ভ্যালু; এটাই তার অধিকার। অপরদিকে, ঋণগ্রহীতার দেনা হচ্ছে তার গৃহীত আসলের কাউন্টার ভ্যালু। এই কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধ করা তার দায়িত্ব। কিন্তু দাতা যদি তার পাওনা কাউন্টার ভ্যালুর চেয়ে অতিরিক্ত, কম হোক বেশি হোক, নেয় তাহলে সেই বেশিটা হবে বিনিময়হীন রিবা, অনধিকার চর্চা ও জুলুম। আর গ্রহীতা যদি তার দেনার চেয়ে কম মূল্য দেয় অথবা দেনা আদৌ পরিশোধ না করে, তাহলে সেটাও হবে কম মূল্য দিয়ে বেশি মূল্য গ্রহণ করা বা মূল্য না দিয়ে নেওয়া। এতে বাড়তি মূল্য হবে বিনিময়হীন, অতিরিক্ত, অনধিকার চর্চা, রিবা এবং জুলুম। তোমরা জুলুম করবে না; তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না– এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই জুলুম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার কাছে পাওনা সাদাকাহ্ করে দেওয়ার জন্য ঋণদাতাকে উপদেশ দিয়েছেন।

৫. সুদের পরিণাম ধ্বংস

পূর্বে সূরা আর-রূমের অন্তর্ভুক্ত সুদ ও যাকাত সংক্রান্ত আয়াতের আলোচনায় সুদ কিভাবে ধ্বংস ডেকে আনে এবং যাকাত কিভাবে সমৃদ্ধি বয়ে আনে সে বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সমাজ ও অর্থনীতির ওপর সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ধ্বংসকর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

www.icsbook.info

সুদ হারাম করার কারণ

আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে হারাম করেছেন কেন? এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে যে কয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছেঃ ১) সুদ একটি অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম; ২) সুদ শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে; ৩) সুদ সম্পদ বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়; ৪) সুদ স্বার্থপরতা, ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে; ৫) সুদ অর্থনীতি ও সমাজকে ধ্বংস করে এবং ৬) সুদ গযব ও শাস্তির বাহন।

বস্তুতঃ পরের সম্পদ বিনা মূল্যে ভক্ষণ এবং তজ্জনিত জুলুমই হচ্ছে সুদ নিষিদ্ধ করার প্রধান ও মূল কারণ। অন্যান্য কারণগুলো অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম থেকেই উদ্ভূত, জুলুমেরই পরিণতি।

১. সুদ একটি অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম ঃ উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয় পৃথিবীতে মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য এবং সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। আর এজন্য ক্রয়-বিক্রয়কে সকল প্রকার জুলুম, অবিচার ও বেইনসাফী থেকে মুক্ত রাখা জরুরী। আলোচনায় এটাও দেখানো হয়েছে যে, সুদ হচ্ছে একটি অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম। সূরাতুর রূমের সুদ সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সুদ বিনিময় ছাড়াই দাতাদের সম্পদ গ্রহীতাদের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। সূরাতুন্নিসায় বলেছেন, সুদ হচ্ছে অন্যায় ভক্ষণ, পরের সম্পদ গ্রাস করা। সূরা আলে ইমরানে সুদ খেতে মানা করেছেন। আর সব শেষে সূরাতুল বাকারায় স্পষ্ট ভাষায় সুদকে জুলুম আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ ঋণদাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঋণগ্রহীতার ওপর জুলুম না করতে, আর ঋণগ্রহীতাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঋণদাতার ওপর জুলুম না করতে।

বস্তুতঃ সুদ হচ্ছে বিনিময়হীন অন্যায় ভক্ষণ এবং তা আবার সময়ের সাথে গুণে গুণে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সুদ কেবল জুলুম নয়, অতি বড় জুলুম। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ছোট হোক বড় হোক, সুদরূপী অন্যায় ভক্ষণ ও জুলুম থাকা উচিত নয়। এই জুলুমের অবসানকল্পেই আল্লাহ সুদ হারাম করেছেন।

২. সুদ শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে ঃ সূরা রূমের সুদ সংক্রান্ত আয়াতের তাৎপর্য আলোচনায় দেখানো হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদ এর দাতাদের সম্পদ শোষণ করে গ্রহীতাদের কাছে হস্তান্তর করে দেয়, তাদের ধনী থেকে আরও ধনী বানায়। অপরদিকে সুদদাতারা দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। সুদ এভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে প্রকট করে তোলে। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। মানুষ মানুষের শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হোক আল্লাহ তা'য়ালা তা চান না; এজন্যই আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন।

www.icsbook.info

৩. সুদ সম্পদ বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ঃ সূরাতুর রূমে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "সুদ আল্লাহর কাছে বাড়ে না।" আল্লাহর এ বাণীর সুস্পষ্ট তাৎপর্য হচ্ছে, সুদ সম্পদ বৃদ্ধির পথে একটি বড় বাধা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা পূর্বে পেশ করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মাধ্যমে। আর সুদ বিনিয়োগ করা হয় না- বিনিয়োগ করা যায় না।

সুতরাং সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সুদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সুদের সাথে বিনিয়োগের সম্পর্ক বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে সুদের হার বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে দেয় না। এছাড়া পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয় বিনিয়োগ উৎপাদন সেখানেই থেমে যায়। ক্রেতা সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা শোষণ করে নিয়ে পণ্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা হ্রাস করার মাধ্যমে সুদ বিনিয়োগ-উৎপাদনকে কমিয়ে বেকার সমস্যাকে প্রকট করে তোলে এবং এক সময়ে মন্দা ও মহামন্দা সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে স্থবির করে দেয়। আরও নানা পদ্ধতিতে সুদ বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে কমিয়ে দেয়। সুদরূপী এই বাধা অপসারণের লক্ষ্যে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন যাতে মানুষ তাদের বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

৪. সুদ স্বার্থপরতা, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ঃ কুরআন মজীদে সুদ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সাথে সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকাত-সাদাকাহ্, দান-খয়রাত ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সুদের আয়াতগুলোর আগে অথবা পরে একইভাবে দান-খয়রাত ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুদ ও আল্লাহর পথে ব্যয় পরস্পর বিপরীতমুখী। লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা-বিদ্বেষ হচ্ছে সুদভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও উদারতা ইত্যাকার মানবিক গুণাবলী সেখানে হয় বিরল। আল্লাহ সুদকে হারাম করে একদিকে মানব সমাজকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে, যাকাত-সাদাকাহ, দান–খয়রাত ও আল্লাহর পথে নিজ সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে মানবতাবোধ, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও উদারতা ইত্যাদি মহৎ গুণকে লালন ও সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করেছেন যাতে সামাজিক বন্ধন হয় সুদৃঢ় এবং মানবিক ঐক্য হয় মজবুত- মানুষ হয়ে উঠে মুহ্সিন।

৫. সুদ অর্থনীতি ও সমাজকে ধ্বংস করে ঃ সূরাতুল বাকারাহ্র ২৭৬ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন"। আল্লাহর নবী (সাঃ) বলিষ্ঠ কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন, সুদের আসল পরিণতি হচ্ছে অভাব ও সংকোচন।[৪১] সুদের এই পরিণতি এখন আর ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন হয় না; মানুষ নিজের

---

৪১. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৭৫৪।

www.icsbook.info

চোখে সুদের এই ধ্বংসকর ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে এবং করছে। সুদের এই পরিণতি থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্ সুদকে হারাম করেছেন।

৬. সুদ গযব ও আযাবের বাহন ঃ সুদ দুনিয়ায় আল্লাহর গযব নিয়ে আসে। আল্লাহ ইহুদী জাতির উদাহরণ দিয়ে দুনিয়ার মানুষকে এ সত্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর দুনিয়ায় সুদ লেনদেনের কারণে পরকালে কঠিন আযাবে পড়তে হবে এ কথাও আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া সূরাতুর রূমের সুদ সংক্রান্ত আয়াতের একটু পরে আল্লাহ্ মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, "স্থল ও জলভাগে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন, যাতে (আল্লাহ্) তাদেরকে তাদের কর্মফল কিছুটা আস্বাদন করাতে পারেন। আশা করা যায়, এর ফলে হয়তো তারা ফিরে আসবে।" (৩০:৪১) এখানে নিজেদের কৃতকর্ম বলতে সাধারণভাবে আল্লাহর নাফরমানি ও হুকুম অমান্য করাকে বুঝানো হয়েছে। সুদের নিষেধাজ্ঞা লংঘনও এর মধ্যে শামিল।

www.icsbook.info

সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ

ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত হাদীসের শ্রেণী প্রকরণ

সুন্নাহ্ হচ্ছে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদে "ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন।" কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধান ও ব্যাখ্যা আল-কুরআনে নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের বিস্তারিত বিধি-বিধান নির্দেশ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয় থেকে সুদ কিভাবে উদ্ভূত হয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

আল-কুরআনে সূরাতুল বাকারাহ্‌র ২৮২ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার হচ্ছে, 'দাইন'-দেনা বা বাকি ক্রয়-বিক্রয়; দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, 'তিজারাতান হাজিরাতান' বা নগদ-উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়। আর আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) হাদীসে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধানত দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। ধরন দু'টি হচ্ছে ঃ ১. সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং ২. অসম জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একই হাদীসে উভয় ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন হাদীসে কেবল এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান আনা হয়েছে। কিছু হাদীসে নগদ-বাকির উল্লেখ না করেই ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। কতিপয় হাদীসে আবার পৃথক পৃথক ভাবে নগদ ও বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর বেশ কিছু হাদীসে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান লংঘন করলে তাতে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় তা দেখানো হয়েছে। কতিপয় হাদীসে সুদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর কিছু হাদীসে সুদের গুনাহ, ইহ-পরকালীন পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে মানবজাতিকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে নিম্নরূপে বিভক্ত করে পেশ করা যেতে পারে যদিও এই বিভক্তি চূড়ান্ত তা বলা যাবে না।*

---

* এখানে হাদীসগুলোর কেবল বাংলা তরজমা পেশ করা হলোঃ ক্রয়-বিক্রয় ও রিবা সংক্রান্ত হাদীসসমূহে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষার অর্থ নিয়ে অনুবাদকদের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছেঃ 'মিসলান বিমিসলিন'। কখনও এর অর্থ করা হয়েছে পণ্যের জাতগত মিল, কখনও বস্তুর পরিমাণগত সমতা, কখনও আবার বৈশিষ্ট্যে এক রকম। এই আলোচনায় মিসলান বিমিসলিনকে বৈশিষ্ট্য বা মানে সমান সমান অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে, 'সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন'; কোথাও কোথাও এর অর্থ লিখা হয়েছে বৈশিষ্ট্যে সমান সমান করা; তবে অধিকাংশ অনুবাদক এর অর্থ করেছেন, "পরিমাণে সমান সমান"। এখানে এই শেষোক্ত অর্থটি নেওয়া হয়েছে।

www.icsbook.info

১. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীস

ক) এক সাথে সম ও অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত (নগদ বাকি উল্লেখ নেই)

খ) সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

i. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই);

ii. সমজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই);

iii. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়;

গ) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

i. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই);

ii. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়।

২. সুদ সংক্রান্ত হাদীস

ক) এক সাথে সম ও অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

খ) সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত

i. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

ii. সমজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

iii. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ

তৃতীয় পরিভাষাটি হচ্ছে, 'ইয়াদান বিইয়াদিন' ও 'হা'আ ওয়া হা'আ'। প্রায় সকলেই এর অর্থ করেছেন, 'নগদ হস্তান্তর। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন উপস্থিত নির্ধারিত বস্তুর সাথে উপস্থিত নির্ধারিত বস্তুর বিনিময়। কেউ আবার এর অর্থ করেছেন, নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা। এখানে এর অর্থ করা হয়েছে পারস্পরিক হস্তান্তর বা পারস্পরিক বিনিময়।

হাদীসে ব্যবহৃত আর একটি পরিভাষা হচ্ছে, 'নাসীয়াহ'। অনুবাদকগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন ঋণ, বাকি বা সময়। কিন্তু পরিভাষা হিসেবে ইয়াদান বিইয়াদিনের বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্যই নাসীয়াহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ পারস্পরিক বিনিময় হলে নাসীয়াহ অর্থ হয় পারস্পরিক বিনিময় না হওয়া। এখানে শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে, বিনিময়হীন বা বিনিময় না দিয়ে নেওয়া।

হাদীসে ব্যবহৃত আর একটি পরিভাষা হচ্ছে 'দায়নান'। এর সাধারণ অর্থ ধারে, বাকিতে। কুরআন মজীদে 'দাইনিন' শব্দের পরে আছে "ইলা আজালিম মুসাম্মা" (২:২৮২)। অর্থাৎ দাইন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়। মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতীত বাকি বিক্রয় বৈধ নয়। হাদীসে দায়নান এর পরে মেয়াদ সম্পর্কে কিছু নাই। সুতরাং এর দ্বারা সম্ভবত মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়া বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। সেজন্য শব্দটির তরজমায় লিখা হয়েছে (মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়া) বাকিতে বিক্রয় করো না। ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

গ) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত

i. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

ii. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ

৩. সাধারণ নির্দেশনা সংক্রান্ত হাদীস (সকল ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৪. সুদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস

৫. সুদের ফলাফল ও পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস।

১. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীস

ক) এক সাথে সম ও অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত (নগদ বাকি উল্লেখ নেই)

১. উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, মানে এক রকম (মিসলান বিমিসলিন like for like), পরিমাণে সমান সমান (সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন equal for equal), হস্তান্তর পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন from hand to hand)। অতঃপর যদি জাত ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত (দামে) বেচতে পার, তবে হস্তান্তর পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে।" [মুসলিম ১৫৮৭ (৮১); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৪, নং ৩৯১৭।]

২. আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পরিমাণে সমান সমান (সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন) না হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রূপার বিনিময়ে রূপা এবং স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ আমরা যেভাবে চাই সেভাবেই ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।" রাবী বলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে (মূল্য পরিশোধের ধরন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, "তা পারস্পরিক হস্তান্তর (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এরূপই শুনেছি।" [মুসলিম, ১৫৯০ (৮৮); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮, নং ৩৯২৭ ও সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড পৃ: ৩৫০, নং ২০২৫।]

হাদীস দু'টিতে সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে প্রথমে বস্তু দু'টির মূল্য সমান সমান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, উভয় বস্তুর–

১. মান এক রকম হতে হবে (Quality must be similar); একেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে মিসলান বিমিসলিন (like for like বা এটা যেমন সেটা তেমন।) এবং

২. পরিমাণ সমান সমান হতে হবে (Quantity must be equal); সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন (equal for equal)

অতঃপর সেই সমান সমান দু'টি মূল্যের বিনিময় পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,

৩. বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে (Exchange must be reciprocal); ইয়াদান বিইয়াদিন (from hand to hand)

www.icsbook.info

এখানে ক্রয়-বিক্রয় নগদ না বাকি তা বলা হয়নি। অর্থাৎ উপরোক্ত ৩টি বিধান নগদ-বাকি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাস্তবে দেখা যায়, ১০০ টাকার ১টি নোট নগদ ভাঙ্গাতে দিলে গ্রহীতাকে ১০০ টাকাই ফেরত দিতে হয়; আর কেউ ১০০/- টাকা নিয়ে যদি ১ বছর পর ফেরত দেয়, তাহলে ১০০/- টাকাই ফেরত দেওয়া বিধেয়। অনুরূপভাবে ১ কেজি গম বা ১ কেজি লবণ বাকি নগদ উভয় ক্ষেত্রেই মান ও পরিমাণ সমান করেই বিনিময় করতে হয়। যদি বলা হয় বিনিময় কেবল নগদ নগদ করতে হবে; কিংবা কেবল নগদের ক্ষেত্রে বস্তু দু'টির মান ও পরিমাণ সমান সমান করতে হবে, তাহলে বাকির ক্ষেত্রে কি মান ও পরিমাণ সমান সমান না করলে চলবে? অথবা বাকি ক্রয়-বিক্রয় কি নিষিদ্ধ? এসব প্রশ্নের যুক্তিসংগত কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

হাদীসের শেষাংশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বলা হয়েছে, "তোমরা ইচ্ছামত বেচতে পার"। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতিতে ব্যবসা কর" (৪:২২)। আর অন্য এক হাদীসে (হাদীস নং ২৪) বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই ক্রয়-বিক্রয় পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল"; সুতরাং 'তোমরা ইচ্ছামত বেচতে পার', একথার প্রকৃত অর্থ দাঁড়াচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত যে দামে ক্রয়-বিক্রয় করবে সেই দামই বৈধ গণ্য হবে; পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতিতে নির্ধারিত যে কোন দামই বৈধ। সুতরাং এখানে বিধান হচ্ছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তুর ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতিতে দাম নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর বস্তু দু'টির বিনিময় অবশ্যই পারস্পরিক হতে হবে, যা নগদ হতে পারে; আবার আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক (২:২৮) নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বাকিতেও হতে পারে।

ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খ) সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

i. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ওজনে সমান সমান, বৈশিষ্ট্যে এক ও পরিমাণে সমান সমান হওয়া ব্যতীত (ইল্লা ওয়াযনান বিওয়াযনিন, মিসলান বিমিসলিন, সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন) বেচা-কেনা করো না।" [মুসলিম, ১৫৮৪ (৭৭) ও সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০, নং ৩৯১১।]

৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, মানে সমান সমান (like for like) না হলে বিক্রি করো না এবং একদিকে অপরদিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য মানে সমান সমান (like for like) না হলে বিক্রি করো না এবং একদিকে অপরদিক অপেক্ষা বেশি করো না এবং যা নেই তার সাথে যা আছে তা বিক্রি করো না। [মুসলিম, ১৫৮৪ (৭৫); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮, নং ৩৯০৮।][১]

---

১. বুখারী, কিতাবুল বূয়ো, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, উদ্ধৃত, চাপরা, এম, উমর, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, U.K., 1985, পৃ. ২৩৮।

www.icsbook.info

৫. নাফে থেকে বর্ণিত, ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) নিজের দুই আঙ্গুল দিয়ে নিজের দুই চোখ ও দুই কানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমার দুই চক্ষু দেখেছে এবং দুই কান শুনেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) না হলে তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বেচা-কেনা করো না। আর একদিক অপরদিক অপেক্ষা বেশি হলেও বেচা-কেনা করো না। এগুলোর মধ্যে যা নেই তার বিনিময়ে যা আছে তা বিক্রি করো না যদি বিনিময় পারস্পরিক না হয়।" [মুসলিম, ১৫৮৪ (৭৬) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯, নং ৩৯০৯।]

৬. আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার কোন দিকে বেশি করো না এবং দিরহামের বদলে দিরহাম কোন দিকে বেশি করো না।" [মুসলিম, ১৫৮৮ (৮৪); সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬, নং ৩৯২৩।]

৭. উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করো না।" [মুসলিম, ১৫৮৫ (৭৮) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০, নং ৩৯১২।]

৮. "ফাদালা ইবনে উবাইদ আনসারী (রাঃ) বলেন, "খাইবারে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে মুক্তা ও স্বর্ণ খচিত একটি হার আনা হলো। এটা গনীমতের মাল ছিল এবং তা বিক্রির জন্য রাখা হলো।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ দিলেন, "এর মধ্যে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথক করে নিতে হবে।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় তাঁদের বললেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ওজনে (ওয়াযনান বিওয়াযনিন) বিক্রি করতে হবে।" [মুসলিম, ১৫৯১ (৮৯) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, নং ৩৯২৯।]

৯. ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খাইবার বিজয়ের দিন আমি বারো দীনারে একটি হার খরিদ করলাম। এটা সোনার তৈরী ছিল এবং তাতে মুক্তা বসানো ছিল। আমি এর সোনা ও মুক্তা পৃথক করলাম এবং বারো দীনারের অধিক (সোনা) পেলাম। আমি এটা নবীর (সাঃ) কাছে উল্লেখ করলাম।" তিনি বললেন, "পৃথক না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা যাবে না।" [মুসলিম, ১৫৯১ (৯০); সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯, নং ৩৯৩০।]

১০. হানাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা ফাদালাহ ইবনে উবাইদের সঙ্গে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। আমার ও আমাদের সঙ্গীর ভাগে সোনা, রূপা ও মুক্তার সমন্বয়ে তৈরী একটি হার পড়ল। আমি তা বিক্রি করতে মনস্থ করলাম। আমি

www.icsbook.info

ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তা থেকে সোনা পৃথক করে এক পাল্লায় রাখ এবং তোমার সোনা অপর পাল্লায় রাখ। অতঃপর তুমি মানে সমান সমান ব্যতীত (ইল্লা মিসলান বিমিসলিন) গ্রহণ করো না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন (স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য) মানে সমান সমান করা ব্যতীত (ইল্লা মিসলান বিমিসলিন) গ্রহণ না করে।" [মুসলিম, ১৫৯১ (৯২) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০-১, নং ৩৯৩৩।]

১১. ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "খাইবারের দিন আমরা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে ছিলাম। আমরা ইহুদীদের সাথে এক উকিয়া স্বর্ণ (চল্লিশ দিরহামের সমান) তিন দীনারের বিনিময়ে কেনা-বেচা করতাম।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তোমরা সমান সমান ওজন ছাড়া (ইল্লা ওয়াযনান বিওয়াযনিন) স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না।" [মুসলিম, ১৫৯১ (৯১) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০, নং ৩৯৩২।]

১২. আবূ যুবাইর বলেন, "আমি যাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্তূপীকৃত খেজুর, যার পরিমাণ জানা নেই, নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫৩০ (৪২) ও সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫, নং ৩৭০৮।]

উপরোক্ত ৩-১২ নম্বর হাদীসে তথা সোনার বদলে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম ইত্যাদি সমজাতের দু'টি বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুর মান এক রকম, পরিমাণ সমান সমান এবং বিনিময় পারস্পরিক না হলে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। ৫ নং হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, অনুপস্থিত বস্তুর বিনিময়ে উপস্থিত বস্তু বিক্রি করা যাবে না যদি এদের পারস্পরিক বিনিময় করা না হয় অর্থাৎ বিনিময় পারস্পরিক হলে তা বৈধ হবে।

ii) সমজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

১৩. মুহাম্মদ ইসহাক ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কাসিত হতে বর্ণিত। তিনি উবাদা ইবনে সামিত হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিষেধ করেছেন স্বর্ণচূর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যচূর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে। তিনি আমাদের রূপার বিনিময়ে স্বর্ণচূর্ণ এবং সোনার বিনিময়ে রৌপ্যচূর্ণ ক্রয় করতে বলেছেন।"[২] (হাদীস)

---

২. উদ্ধৃত, বাদাবী, যাকি আল-দ্বীন; *Theory of Prohibited Riba,* ইংরেজী অনুবাদঃ ইমরান আহসান খান নিয়াজী, ডিসেম্বর, ২০০০, info@nyazee.com , পৃ. ৯৬।

www.icsbook.info

১৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায় বিভিন্ন প্রকার খেজুর মিশিয়ে আমাদের খেতে দেওয়া হতো। আমরা এক সা' উন্নত মানের খেজুরের বিনিময়ে আমাদের নিম্ন মানের খেজুর দুই সা' বিক্রি করতাম। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ঘোষণা করলেন, এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' খেজুর, এক সা' গমের বিনিময়ে দুই সা' গম এবং দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম আদান-প্রদান করা যাবে না।" [মুসলিম, ১৫৯৫ (৯৮); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪, নং ৩৯৩৯ ও সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১১, নং ১৯৩৫।]

১৫. আমার [বিলাল (রাঃ)] কাছে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জমাকৃত এক মুদ্দ খেজুর ছিল। আমি দেখলাম, উন্নত মানের এক সা' খেজুর নিম্ন মানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা হচ্ছে। আমি তা (উন্নত মানের) ক্রয় করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বিলাল, তুমি এ খেজুর কোথায় পেলে? আমি বললাম, আমি দুই সা'র বিনিময়ে এক সা' ক্রয় করেছি।" তিনি বললেন, "এ খেজুর ফেরত দাও এবং আমাদের খেজুর ফেরত নিয়ে আস।"[৩] (হাদীস)

১৬. আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী আদী আল-আনসারী গোত্রের এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য খাইবার এলাকায় পাঠালেন। সে সেখান থেকে উন্নত মানের খেজুর নিয়ে ফিরে আসল।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ?" সে বললো, "না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিভিন্ন প্রকারের দুই সা' নিম্ন মানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তা করো না, বরং মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) হতে হবে। অথবা তোমার খারাপ খেজুর বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে। এভাবেই পরিমাপ (পূর্ণ হবে)। [মুসলিম, ১৫৯৩ (৯৪) ও সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২, নং ৩৯৩৫।]

১৭. আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে খাইবার এলাকায় (রাজস্ব বিভাগে) কর্মচারী নিযুক্ত করেন। সে ওখান থেকে উত্তম খেজুর নিয়ে ফিরে আসে।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ (উত্তম)?" সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! (খাইবারের সব খেজুরই) এরূপ নয়। বরং আমরা দুই সা' (খারাপ) খেজুরের বিনিময়ে এরকমের এক সা' এবং তিন সা'র বিনিময়ে দুই সা'

---

৩. *সুহাইল*, পৃ. ৫৫, সুনান আল-দারিমি সূত্রে।

www.icsbook.info

নিয়েছি। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এরকম কাজ আর করবে না। বরং খারাপ খেজুর নগদ মূল্যে (দিরহামের বিনিময়ে) বিক্রি করে দাও। অতঃপর প্রাপ্ত দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ কর।" [মুসলিম, ১৫৯৩ (৯৫) ও সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৩, নং ৩৯৩৬।]

১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আমলে একটি উট জবেহ করা হলো এবং এর গোশ্ত দশ ভাগে ভাগ করা হলো।" এক ব্যক্তি বললো, "আমার বকরীর বিনিময়ে একটি অংশ আমাকে দিন।" আবূ বকর বললেন, "এটা সঠিক নয়"।[৪]

১৯. সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পশুর গোশ্তের বিনিময়ে পশু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[৫] (হাদীস)

২০. নাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ (ইবনে ওমর রাঃ) তাঁকে অবহিত করেছেন, "নবী (সাঃ) মুযাবানা পদ্ধতির লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন।" মুযাবানা হচ্ছে এই যে, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর (যা এখনও কাটা হয়নি) বিক্রি করা, শুকনো আঙ্গুর বা কিশমিশের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর (গাছে অবস্থিত) ক্রয়-বিক্রয় করা এবং গমের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল (গম) বিক্রি করা। [মুসলিম, ১৫৪২ (৭৩) ও সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৭২, নং ৩৭৫০।]

২১. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন মুহাকালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও মুআওয়ামা হতে।" [মুসলিম, ১৫৩৬ (৮৫)।]

(মুহাকালা ও মুযাবানা উভয়টি একই শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়। সাধারণ শস্যের ক্ষেত্রে বলা হয় মুহাকালা; খেজুর ও আঙ্গুরের বেলায় একে বলা হয় মুযাবানা। মুখাবারা হচ্ছে জমি বর্গা* দেওয়া আর মুআওয়ামা হচ্ছে নির্দিষ্ট বৃক্ষ বা বাগানের ফল দুই তিন বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা।)

উপরোক্ত ১৩-২১ নং হাদীসে বলা হয়েছে, সমজাতীয় দু'টি বস্তুর মান অবশ্যই সমান সমান হতে হবে (১৬ নং হাদীস) অন্যথায় খারাপটি তৃতীয় কোন বস্তু বা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে (হাদীস নং ১৬-১৭) প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উত্তম বস্তু ক্রয় করতে হবে যাতে বেচা ও কেনা উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন জাতের বস্তুর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় বস্তুর মান ও পরিমাণ সমান সমান করার শর্ত নেই বরং পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোন দামে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। আর এভাবেই সমজাতের খারাপ ও উত্তম মানসম্পন্ন বস্তু দু'টির যথার্থ প্রাপ্য পরিমাণ পাওয়া সম্ভব হবে (১৬ নং হাদীস)। উক্ত হাদীসসমূহে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, একই জাতের

---

৪. ইবনুল কায়্যিম, *ই'লাম আল মুয়াক্কিয়িন*, ভলি-১, পৃ. ৩০৬; উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোল্লেখিত, পৃ. ১৬০।

৫. মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, ভলি-৩, পৃ. ৯২১, উদ্ধৃত, বাদাবী, উপরোক্ত, পৃ. ১৬০।

* উল্লেখ্য যে, বর্গা চাষ সকল ইমামের মতে জায়েয। (মিশকাত)

www.icsbook.info

খারাপ ও ভালো মানের দু'টি বস্তুর মানগত তারতম্যকে বিবেচনায় নিয়ে অনুমানের ভিত্তিতে এদের পরিমাণে কম-বেশি করে সরাসরি বিনিময় করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অবৈধ; এরূপ বাকি নগদ সকল ক্রয়-বিক্রয়ই অবৈধ। সমজাতের উভয় বস্তুর পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করে বিক্রয় করা যে নিষিদ্ধ তা ১৬ ও ১৭ নং হাদীসে অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৩ নম্বর হাদীসে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণচূর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণচূর্ণ বলার দ্বারা উভয় ক্ষেত্রেই মান এক রকম হতে হবে তা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উবাদা ইবনে সামিতের (রাঃ) একটি উক্তি ইমাম সারাখসী উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, "Gold metal and gold dust are the same." এই উক্তির আলোকে সারাখসী লিখেছেন, "ওজনে সমান হলে স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণচূর্ণ উভয়টিই সমান হয়ে যায়।" এ মন্তব্য উল্লেখিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ হাদীসটি উবাদা ইবনে সামিত থেকেই বর্ণিত।

iii) সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়

২২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উট ধার করলেন; অতঃপর একটি অধিক বয়সের উট ধারদাতাকে ফেরত দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তম রূপে তার ঋণ পরিশোধ করে।" [মুসলিম, ১৬০১ (১২১)।]

২৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই বছর বয়সের একটি উট ধার করে সমবয়সের একটি উট ফেরত দিলেন এবং তার অতিরিক্ত আর একটি উট দিয়ে দিলেন।" (তিনি) বললেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে ভালভাবে তার ঋণ পরিশোধ করে।"[৬] (হাদীস)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উট ধার নিয়ে তার চেয়ে অধিক বয়সের উট অথবা কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত আর একটি উট ফেরত দিয়েছেন। এরূপ করার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন।

গ) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত

i) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

২৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই ক্রয়-বিক্রয় পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল।"[৭] (হাদীস)

২৫. আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ, এক বিক্রয়ে দুই শর্ত, ঝুঁকি ছাড়া মুনাফা এবং যা নেই তা বিক্রি করা বৈধ নয়।"[৮] (হাদীস)

---

৬. *সুহাইল*, পৃ. ১০৬, *জামি আল তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ো, ভলি-৬।

৭. *ফাতহুল বারি*, ভলি-৪, পৃ. ২৩০।

৮. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনি*, ভলি-৪, পৃ. ১৭৬; নূর, ই, এম। *Riba versus Profit Sharing: Theoretical Foundations and Policy Implications*: A Dissertation Submitted to International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, Islamabad, Pakistan for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Economics, 1999 AD., পৃ. ২৪৪; আবূ দাউদ ও তিরমিযি।

www.icsbook.info

২৬. আমর ইবনে শোয়াইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক বিক্রয়ে দুই লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন।"[৯] (হাদীস)

২৭. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক লেনদেনে দুই বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[১০] (হাদীস)

২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ক্রয়-বিক্রয়ে (deal) দুই দাম নিষিদ্ধ করেছেন।"[১১] (হাদীস)

২৯. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) "সাফ্‌কাতাইনি ফিস সাফকাতি" (এক ক্রয়-বিক্রয়ে (deal) দুই দাম নিষিদ্ধ করেছেন")।[১২] (হাদীস)

৩০. হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহী কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে, কোন নারীকে তার বোনের (অন্য নারীর) তালাক দাবী করতে, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে, পশুর পালানে দুধ জমা করে রেখে (ক্রেতাকে) পালান ফুলিয়ে দেখাতে এবং কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির দাম-দস্তুর করার ওপর দাম-দস্তুর করতে।" [মুসলিম, ১৫১৫ (১২)।]

৩১. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য শহরের লোকেরা বিক্রয় করে দেয়ার চাপ দিবে না। লোকদেরকে স্বাভাবিক অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ্ এক দলের মাধ্যমে অপর দলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।" (সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৬, নং ৩৬৮৪।)

৩২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজাশ করতে (খরিদ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অযথা দরদাম করে মূল্য বৃদ্ধি) নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫১৬ (১৩)।]

৩৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা পরস্পর 'নাজাশ' করো না।" (জামে আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৭, নং ১২৪২।)

৩৪. সুয়াইদ ইবনে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ও মাখরাফা আল-আবদী (রাঃ) হাজার নামক স্থান থেকে কিছু কাপড় আমদানি করলাম। নবী

---

৯. শাওকানি, *নাইলুল আওতার*, ভলি-৫, পৃ. ১৯০; উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪।

১০. *সান-আনি, সুবুস সালাম*, ভলি-৩, পৃ. ১৬, *নাইলুল আওতার*, ভলি-৫, পৃ. ১৬১, আহমদ; উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃ.২৪৪।

১১. *নাইলুল আওতার*, ভলি-৫, পৃ. ১৬২।

১২. উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃ. ২৪৪।

www.icsbook.info

(সাঃ) আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে একটি পাজামা ক্রয়ের জন্য দরদস্তুর করলেন। আমাদের নিকটেই একজন কয়াল উপস্থিত ছিল। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করে দিত। নবী (সাঃ) (দ্রব্যের মূল্য পরিশোধকালে) কয়ালকে বলেন ঃ ওজন কর এবং (দাম) কিছুটা বেশি দাও।" (জামে আত-তিরমিযী, পৃঃ ৪১৮, নং ১২৪৩।)

৩৫. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (উটের পিঠে বিছানোর) একটি চট (বা মোটা কাপড়) এবং একটি কাঠের পাত্র বিক্রয়ের ইচ্ছা করেন এবং তিনি বলেন ঃ কে এই চট ও পাত্রটি ক্রয় করবে?" "এক ব্যক্তি বলল, "আমি এ দু'টি এক দিরহামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক।" নবী (সাঃ) বলেন ঃ "কে এক দিরহামের বেশি দিবে, কে এক দিরহামের বেশি দিবে?" "এক ব্যক্তি তাকে দুই দিরহাম দিয়ে তাঁর কাছ থেকে জিনিস দু'টি ক্রয় করল।" (জামে আত-তিরমিযী, পৃঃ ৩৬৯, নং ১২৫৬।)

৩৬. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা গ্রহণ করার পূর্বে বিক্রি করা উচিত নয়।" [মুসলিম, ১৫২৬ (৩২); সহীহ্ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫, নং ১৯৮৫, পৃঃ ৩৩৩, নং ১৯৭৫।]

৩৭. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে, তা পুনরায় ওজন না করা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে।" [মুসলিম, ১৫২৮ (৩৯); সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩, নং ৩৭০৫।]

৩৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে দখল নেওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা উচিত নয়।" ইবনে আব্বাস বলেন, "অন্যান্য সকল জিনিসের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।" [মুসলিম, ১৫২৫ (২৯-৩০)।]

৩৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে কেউ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে, সে যেন তা পুরোপুরি অধিকারে আনার আগে পুনরায় বিক্রি না করে।" ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, "আমরা (অগ্রগামী হয়ে) পণ্যবাহী কাফেলার নিকট থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য খরিদ করতাম। তা ক্রয়ের স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫২৬-১৫২৭ (৩৪)।]

৪০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজের অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" (তাউস বলেন), "আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন (পুরো অধিকারে আনার আগে বেচা যাবে না কেন)?" উত্তরে তিনি বলেন,

www.icsbook.info

"তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, পৃঃ ৩৩৫, নং ১৯৮৪।)

৪১. ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফলের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫৩৪ (৪৯)।]

৪২. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পাকার পূর্বে ফল বিক্রি করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫৩৬ (৫৩)।]

৪৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "নবী (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ (দুনিয়াতে) এমন কোন নবীকে পাঠাননি, যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও কি (চরিয়েছেন)? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইজারাহ, পৃঃ ৩৮৫, নং ২১০২।)

৪৪. আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে দান করার আদেশ করলে আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ্দ (প্রায় এক সের) মজুরী লাভ করত (এবং তা থেকে দান করত)। আর (আজ) তাদের কেউ কেউ লাখপতি।" বর্ণনাকারী (শাকীক) বলেন, "আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবূ মাসউদ) নিজের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইজারাহ, পৃঃ ৩৯৩, নং ২১১২।)

৪৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সাঃ) উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খাইবারের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল হারসে ওয়াল মুযারেআহ, পৃঃ ৪২৫, নং ২১৬১।)

৪৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আনসার সাহাবীগণ নবী (সাঃ)-কে বললেন, "আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজির) মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন।" তিনি বললেন, "না"। তখন তাঁরা (মুহাজিরদের) বললেন, "আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনাদের ফলের ভাগ দেব।" তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, "আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল হারসে ওয়াল মুযারেআহ, পৃঃ ৪২৩, নং ২১৫৭।)

৪৭. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় লোকেরা নালার পাশে উৎপন্ন ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি কেরায়া দিত যা জমির

www.icsbook.info

মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। (যেমন ক্ষেতের কোন বিশেষ অংশ সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে পাবে- এ শর্তে জমি দিত)। কিন্তু নবী (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন।" (অধস্তন রাবী বলেন) আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, "দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়াটা কেমন?" রাফে (রাঃ) বলেন, "তাতে কোন দোষ নেই।" রাইস বলেন, "যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করলে তিনিও তা জায়েয মনে করবেন না। কেননা তাতে (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার) আশংকা রয়েছে।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল হারসে ওয়াল মুযারেআহ, পৃঃ ৪৩৩, নং ২১৭৬।)

৪৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সাওয়ারীর পশু বন্ধক রাখলে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখলে তার দুধ পান করা যাবে। যে ব্যক্তি আরোহণ করবে এবং দুধ পান করবে পশুর ব্যয়ভারও তাকে বহন করতে হবে।" (জামে আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯-৩৯০, নং ১১৯১।)

ii) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়

৪৯. আবুল মিনহাল (রাঃ) বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময় আমরা দু'জন ছিলাম বণিক। আমরা সোনা ও রূপার মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "যদি বিনিময় পারস্পরিক হয় তাহলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি বিনিময় পারস্পরিক না হয় তাহলে তা জায়েয নয়।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, পৃঃ ৩০৪, নং ১৯১৭।)

৫০. হাবীব থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল মিনহালকে বলতে শুনেছেন, "আমি বারাআ ইবনে আযিবকে 'সরফ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "তুমি যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস কর। তিনিই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।" অতএব আমি যায়েদকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "তুমি বারাআর কাছে জিজ্ঞেস কর। সে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত।" অবশেষে তারা উভয়েই বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য দায়নান বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" [মুসলিম, ১৫৮৯ (৮৭); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮, নং ৩৯২৬।]

৫১. জাফর ইবনে আবি ওয়াহশিয়াহ ইউসুফ ইবনে মাহিল হতে, তিনি হাকিম ইবনে হিযাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে এসে এক ব্যক্তি আমাকে এমন একটি জিনিস তার

কাছে বিক্রি করতে বলল যা আমার কাছে নেই। আমি উক্ত জিনিস (যা সে কিনতে চেয়েছিল) তার কাছে বিক্রি করলাম। অতঃপর বাজার থেকে তার জন্য জিনিসটি ক্রয় করলাম (তাকে হস্তান্তর করলাম)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না।"[১৩] (হাদীস)

৫২. ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাকি নামক বাজারে উটের ব্যবসা করতাম। আমি কখনও স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রয় করতাম কিন্তু মূল্য গ্রহণকালে রৌপ্যমুদ্রা নিতাম। আবার কখনও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রয় করতাম এবং মূল্য গ্রহণকালে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-র কাছে এসে তাঁকে হাফসার (রাঃ) ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। আমি ব্যাপারটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "এরূপ মূল্য গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই।" (জামে আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩, নং ১১৭৯।)

৫৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় এলেন, তিনি দেখলেন লোকেরা ফল এক বা দুই বছরের জন্য (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, এক বা দুই বছর বলা হয়েছিল না দুই বা তিন বছর বলা হয়েছিল) ফল অগ্রিম কেনা-বেচা করছে।" নবী করীম (সাঃ) বললেন, "কেউ যদি খেজুরের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করে (পরবর্তীতে খেজুরের সরবরাহ নেওয়ার শর্তে), তাহলে খেজুরের নির্দিষ্ট পরিমাণ, এর নির্দিষ্ট ওজন ও নির্ধারিত সময়ের জন্য অর্থ প্রদান করা উচিত।" [মুসলিম, ১৬০৪ (১২৭)।]

৫৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে বললেন, "আপনি কি সুদের কারবার হালাল করে দিয়েছেন?" মারওয়ান বললেন, "আমি তো তা করিনি।" আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, "আপনি তো হুন্ডির ব্যবসা হালাল করে দিয়েছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাদ্যদ্রব্যের ওপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" রাবী বলেন, "মারওয়ান লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিল এবং তাদেরকে এ ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করল।" সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বলেন, "অতঃপর আমি দেখলাম, শাস্ত্রীরা লোকদের হাত থেকে হুন্ডির কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে নিচ্ছে।" [মুসলিম, ১৫২৮ (২)।]

৫৫. আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর লৌহ বর্মটি এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে ধারে খাদ্য-শস্য ক্রয় করেছিলেন।" [মুসলিম, ১৬০৩ (১৬৪)।]

---

১৩. আবূ দাউদ: *সুনানে আবূ দাউদ*, ইংরেজী অনুবাদ, আহমদ হাসান, আশরাফ প্রেস, লাহোর, ১৯৮৪, উদ্ধৃত, কামালি, মুহাম্মদ হাশিম: *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options,* Ilmiah Publishers, Kualampur, 2002, p. 112.

www.icsbook.info

৫৬. আ'মাশ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমরা বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয়ের কথা ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী (সাঃ) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের বাকিতে এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং স্বীয় লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ু, পৃঃ ৩৫৮, নং ২০৪৫।)

৫৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সাঃ) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর লৌহ বর্ম বিশ সা' খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বন্ধক দেয়া ছিল। তা তিনি নিজ পরিবারের জন্য নিয়েছিলেন।" (জামে আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৬, নং ১১৫২।)

৫৮. "কোন এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূল (সাঃ) জাবির (রাঃ)-এর নিকট থেকে বাকিতে কূপ ক্রয় করেন এবং মদীনায় ফেরার পর তার মূল্য পরিশোধ করেন।" (বুখারী, হাদীস নং ২২৫৫।)

৫৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট দেনা ছিলেন। তিনি তাঁর দেনা পরিশোধ করার সময় আমাকে কিছু অতিরিক্ত দিলেন।" (সুনান আবূ দাউদ)

৬০. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গেলাম; সে সময়ে তিনি মসজিদে ছিলেন। (মিসা'র এর ধারণা, জাবির দুপুরের পূর্বে মসজিদে গিয়েছিলেন) নবী (সাঃ) আমাকে দু' রাকআত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। শেষে তিনি তাঁর কাছে আমার যা পাওনা ছিল তা পরিশোধ করলেন এবং আরও অতিরিক্ত পরিমাণ দিলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২, নং ২২১৯।)

৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম।" তিনি (সাঃ) বললেন ঃ "তুমি কি তোমার উটটি আমার নিকট বেচা সমীচীন মনে কর?" আমি বললাম, "হাঁ"। "অতঃপর তাঁর নিকট আমি সেটি বিক্রি করলাম। তিনি মদীনায় পৌঁছলেন, আমি উট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তার দাম দিয়ে দিলেন।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ইসতিকরাদ, পৃঃ ৪৪৯, নং ২২১০।)

৬২. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একটি উটে চড়ে সফর করছিলাম। কিন্তু উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি একে পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলাম। এমন সময় নবী (সাঃ) আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন এবং উটটিকে আঘাত করলেন; ফলে উটটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে অনুরূপ আর কখনো চলেনি।" তিনি (রাসূল সাঃ) বললেন, "এটাকে

www.icsbook.info

এক উকিয়ায় আমার কাছে বিক্রি কর।" আমি বললাম, "না"। তিনি আবার বললেন, "এটাকে এক উকিয়ায় আমার নিকট বিক্রি কর।" "আমি তাঁর নিকট এটা বিক্রি করলাম এবং তাতে সওয়ার হয়ে আমার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার শর্ত রাখলাম। বাড়ি পৌঁছে আমি উটটি নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি আমাকে উটের দাম চুকিয়ে দিলেন। আমি ফিরে যেতে লাগলাম। তিনি একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে পুনরায় ডাকলেন।" (আমি ফিরে এলে) তিনি বললেন, "মনে করেছিলে আমি তোমার উট নিয়ে তোমাকে কম মূল্য নিতে বলব; তোমার উট এবং দিরহাম নিয়ে নাও। এগুলো তোমারই।" (সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩, নং ৩৯৫২।)

৬৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বারীরা এসে বললো, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতিবছর এক উকিয়াহ করে নয় উকিয়া প্রদানের (মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার জন্য) চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। অতএব আমাকে সহযোগিতা করুন।" (বুখারী)

৬৪. "অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বাকিতে বেচা-কেনা বৈধ নয়।"[১৪]

৬৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যদি না দেখে কোন জিনিস ক্রয় করে তাহলে জিনিসটি দেখার পর ক্রয় চুক্তি বাতিল করার অধিকার তার থাকবে।"[১৫] (হাদীস)

৬৬. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে, (তার একটি হচ্ছে) বাকিতে বেচা-কেনা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

২৪-৬৬ পর্যন্ত হাদীসসমূহে ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন্ কোন্ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয় না অথবা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে কি কি করা নিষিদ্ধ তার বিস্তারিত উল্লেখও এখানে করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, নগদ-বাকি, অগ্রিম, নিলাম, শ্রম বিক্রি, মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, কীরাতের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া, বাগানের ফলের অংশের ভিত্তিতে শ্রম নিয়োগ করা, জমি বর্গা দেওয়া ইত্যাদি সকল ক্রয়-বিক্রয়ই বৈধ।

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তুর সকল ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক বিধান হচ্ছে, বস্তু ব্যবহার উপযোগী হতে হবে তথা এদের উপযোগ থাকতে হবে, পারস্পরিক স্বেচ্ছা-সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; নিজ নিজ বস্তুর ওপর ক্রেতা-বিক্রেতার মালিকানা ও দখল/অধিকার থাকতে হবে; ধোকা-প্রতারণা, জালিয়াতি, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতা থাকা চলবে না। এ ছাড়া এক বিক্রয়ে দুই শর্ত, এক বিক্রয়ে দুই লেনদেন, এক লেনদেনে দুই বিক্রয়, এক বিক্রয়ে দুই দাম, ঝুঁকি ছাড়া মুনাফা গ্রহণ, ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয়কে একত্রিত করা, অযথা দরদাম করে মূল্য বৃদ্ধি করা, কারো দামের ওপর দাম করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বাকি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারেও হাদীসে কোন অস্পষ্টতা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ও কূপ ক্রয় করেছেন; এসব ক্ষেত্রে দাম বাকি ছিল, বস্তু নগদ হস্তান্তর করা

---

[১৪] ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা*, বৈরুত, খ-৯, পৃঃ ৬২৭।

[১৫] উদ্ধৃত, কামালি, মোহাম্মদ হাশিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

www.icsbook.info

হয়েছে। এছাড়া ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর দাম ও বস্তু উভয়ই বাকি রাখা হয়েছে তার প্রমাণও হাদীসে রয়েছে। নবী করীম (সাঃ) জাবিরকে (রাঃ) তাঁর উটটি নবীর (সাঃ) কাছে বিক্রয় করার প্রস্তাব করলেন; জাবির (রাঃ) প্রস্তাবে রাজী হয়ে নবীর (সাঃ) নিকট তাঁর উট বিক্রয় করলেন এবং মদীনায় পৌঁছে উট হস্তান্তর করার শর্ত রাখলেন। অতঃপর মদীনায় পৌঁছে পরদিন সকালে জাবির (রাঃ) উট হস্তান্তর করলেন আর নবী (সাঃ) দাম পরিশোধ করলেন। সুতরাং উভয় পক্ষের মূল্য হস্তান্তর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত রাখাও বৈধ। এমনকি, জিনিস পূর্বাহ্নে না দেখে ক্রয় করাও বৈধ। তবে এক্ষেত্রে দেখার পর চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে। বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত আছে বলেও হাদীসে বলা হয়েছে।

২. সুদ সংক্রান্ত হাদীস

ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, সমজাতের পণ্য-সামগ্রী, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হচ্ছে ৩ টি। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) মানগত সমতা বা Qualitative equality (মিসলান বিমিসলিন)

২) পরিমাণগত সমতা বা Quantitative equality (সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন)

৩) পারস্পরিক বিনিময় বা Reciprocal exchange (ইয়াদান বিইয়াদিন)

আর অসম জাতের পণ্য-সামগ্রী, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হচ্ছে দু'টি। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) পারস্পরিক সম্মতিতে মূল্য নির্ধারণ বা Mutual consent (কাইফা শি'তুম)

২) পারস্পরিক বিনিময় বা Reciprocal exchange (ইয়াদান বিইয়াদিন)

কোন ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লেখিত কোন বিধান বা বিধানসমূহ লংঘন করলে সে ক্রয়-বিক্রয়ে অবশ্যই সুদ উদ্ভূত হবে। বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়ে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। নিচে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) এক সাথে সম ও অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

৬৭. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি এবং লবণের বিনিময়ে লবণ মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) এবং লেনদেন পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি প্রদান করল কিংবা গ্রহণ করল সে সুদী কারবারে লিপ্ত হলো। কিন্তু জিনিসের শ্রেণীর মধ্যে (আলওয়ানুহু) পার্থক্য থাকলে স্বতন্ত্র কথা।" [মুসলিম, ১৫৮৮ (৮৩); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬, নং ৩৯২০।]

৬৮. উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "নবী (সাঃ) বলেনঃ সোনার বিনিময়ে সোনা মানে সমান সমান হতে হবে; রূপার বিনিময়ে রূপা মানে সমান সমান হতে হবে; খেজুরের বিনিময়ে খেজুর মানে সমান সমান হতে হবে; গমের

www.icsbook.info

বিনিময়ে গম মানে সমান সমান হতে হবে; লবণের বিনিময়ে লবণ মানে সমান সমান হতে হবে এবং বার্লির (বা যবের) বিনিময়ে বার্লি মানে সমান সমান হতে হবে। এ সবের লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশি দেবে অথবা গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। রূপার বিনিময়ে সোনা তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রয় করতে পার তবে বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে। খেজুরের বিনিময়ে গম তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রয় করতে পার তবে বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে। খেজুরের বিনিময়ে বার্লি তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রয় করতে পার তবে বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে।" **উল্লেখিত হাদীসের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ "গমের বিনিময়ে বার্লি তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রয় করতে পার তবে বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে।" আর এক বর্ণনায় আছে ঃ "বার্লির বিনিময়ে গম তোমাদের ইচ্ছামত পরিমাণ নির্ধারণ করে (পরিমাণে কম-বেশি করে) বিক্রয় করতে পার তবে বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে।"** (জামে আত-তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮০-৩৮১, নং ১১৭৭।)

উক্ত হাদীস দু'টিতে প্রথমে সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তু দু'টির মান সমান সমান এবং বিনিময় পারস্পরিক হতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অতঃপর কোন এক দিকে বস্তুর পরিমাণ বেশি (যিয়াদা) হলে সেই 'যিয়াদা'কে (অতিরিক্ত) রিবা বলা হয়েছে। নগদ বাকি উভয় ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। অতঃপর উভয় হাদীসের শেষাংশে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু দু'টির জাত ভিন্ন ভিন্ন হলে এদের পরিমাণ ইচ্ছে মত নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে বলে বলা হয়েছে।

খ) সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত

i. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

৬৯. আবূ কিলাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,..... "আমি তাকে (আবুল আশআস) বললাম, আমাদের ভাইদের কাছে উবাদা ইবনে সামিতের হাদীসটি বর্ণনা করুন।" .....তিনি (আবুল আশআস) বললেন, "উবাদা ইবনে সামিত উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিষেধ করতে শুনেছি, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বেচা-কেনা করতে। তবে পরিমাণে সমান সমান এবং একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন, আইনান বিআইনিন) হলে কোন দোষ নেই। অতঃপর যে বেশি দিল কিংবা নিল সে সুদে (সুদ খাওয়ার অপরাধে) লিপ্ত হল।" [মুসলিম, ১৫৮৭ (৮০); সহীহ্ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২, নং ৩৯১৫।]

www.icsbook.info

৭০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) এবং আদান-প্রদান পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) হতে হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি বেশি দিল কিংবা বেশি গ্রহণ করল সে সুদী কারবারে লিপ্ত হলো। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই সমান অপরাধী।" [মুসলিম, ১৫৮৪ (৮২); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫, নং ৩৯১৮।]

৭১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সোনার বিনিময়ে সোনা মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন), বিনিময় পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) এবং যা বেশি (ফদল) তা রিবা, রূপার বিনিময়ে রূপা মানে সমান সমান, বিনিময় পারস্পরিক এবং যা বেশি (ফদল) তা রিবা, গমের বিনিময়ে গম মানে সমান সমান, বিনিময় পারস্পরিক এবং যা বেশি তা রিবা, লবণের বিনিময়ে লবণ মানে সমান সমান, বিনিময় পারস্পরিক এবং যা বেশি (ফদল) তা রিবা, যবের বিনিময়ে যব মানে সমান সমান, বিনিময় পারস্পরিক এবং যা বেশি (ফদল) তা রিবা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর মানে সমান সমান, বিনিময় পারস্পরিক এবং যা বেশি (ফদল) তা রিবা।" (হাদীস, উদ্ধৃত করেছেন, ইমাম সারাখ্‌সী, আল-মাবসুত, ইংরেজী অনুবাদ, ইমরান আহসান নিয়াজী, info@nyazee.com, Dec. 9, 2000.)

৭২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ওজনে ও মানে সমান সমান (ওয়াযনান বিওয়াযনিন, মিসলান বিমিসলিন) এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ওজনে ও মানে সমান সমান (ওয়াযনান বিওয়াযনিন, মিসলান বিমিসলিন) হলে বিনিময়ে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি বেশি দিল কিংবা বেশি নিল সেই সুদের কারবার করল।" [মুসলিম, ১৫৮৮ (৮৪); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬, নং ৩৯২২।]

৭৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "খেজুরের পরিবর্তে খেজুর...... যবের পরিবর্তে যব...... ইয়াদান বিইয়াদিন, মিসলান বিমিসলিন, এবং যাতে কোন কম-বেশি থাকবে না। যেই বেশি বা কম করবে নিশ্চয়ই সে সুদ লেনদেনে লিপ্ত হলো। ওজন অথবা পরিমাপযোগ্য বস্তু (এর বেলায় এটা প্রযোজ্য)।"[১৬] (হাদীস)

---

১৬. আল-বায়হাকি: *আল-সুনান আল-কুবরা*, ভলি-৫, পৃঃ ২৮২; *আল-মুস্তাদরাক*, ভলি-৩, পৃঃ ৪২; উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

www.icsbook.info

৭৪. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দুই দীনারের বিনিময়ে এক দীনার, দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম, দুই সা'র বিনিময়ে এক সা' বিক্রি করো না; কারণ এতে তোমরা রিমায় (রিবায়) জড়িত হয়ে পড়বে।" এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি একাধিক ঘোড়ার বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি করে এবং একাধিক উটের বিনিময়ে একটি উত্তমভাবে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উট বিক্রি করে, সে ব্যাপারে আপনার মত কি?" উত্তরে তিনি বললেন, "এতে কোন ক্ষতি নেই, যদি তা পারস্পরিক বিনিময় (ইয়াদান বিইয়াদিন) হয়।"[১৭] (মুসনাদে আহমদ)

সমজাতের দু'টি বস্তু (মুদ্রা বা পণ্য) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুর মূল্য সমান সমান করার শর্ত ভঙ্গ করে পরিমাণে কম-বেশি করা হলে সেই বাড়তিকে (ফদল) বলা হয়েছে রিবা। বলা হয়েছে "ফদল (বাড়তি) হচ্ছে রিবা"। ইমাম সারাখসী বলেছেন, এই "বাড়তি পরিমাণের তুলনা দ্বারা নিরূপিত বাড়তি হতে পারে অথবা মুদ্রার পরিমাণগত তারতম্য এবং মূল্যের আনুপাতিক পার্থক্য দ্বারা নিরূপিত হতে পারে।" (সারাখসী, পূর্বোক্ত)

ii. *সমজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)*

৭৫. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, বিলাল (রাঃ) উন্নত মানের খেজুর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এগুলো কোথা থেকে এনেছো?" বিলাল (রাঃ) বললেন, "আমাদের কাছে কিছু খারাপ খেজুর ছিল। নবীকে (সাঃ) খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে এর এক সা'-এর বিনিময়ে আমাদের দুই সা' (নিম্ন মানের) বিক্রি করেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হায়! এতো একেবারে সুদ। এরূপ করো না; বরং যখন তুমি (উত্তম) খেজুর খরিদ করতে চাও, তখন তোমার (খারাপ) খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও (ফাবে'হু বিবাইয়িন আখারা)। অতঃপর তার মূল্য দিয়ে এগুলো খরিদ কর।" [মুসলিম, ১৫৯৪ (৯৬); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩-৫৪, নং ৩৯৩৭।]

৭৬. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট কিছু খেজুর উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, "এ খেজুর তো আমাদের (মদীনার) খেজুরের মত নয়।" তখন লোকটি বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! এর এক সা' খেজুরের বিনিময়ে আমাদের খেজুরের দুই সা' বিক্রি করেছি।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এটা তো সুদ। কাজেই এটা ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর আমাদের খেজুরগুলো বিক্রি করে (এর মূল্য দিয়ে) এগুলো খরিদ কর।" [মুসলিম, ১৫৯৪ (৯৭); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪, নং ৩৯৩৮।]

---

১৭. উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০।

www.icsbook.info

৭৭. আবূ নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) সরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তা কি পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) বিনিময়? আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "এতে কোন দোষ নেই।" আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে (রাঃ) এ সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং বললাম আমি ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) সোনা-রূপার (সরফ) ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন তা পারস্পরিক বিনিময় (ইয়াদান বিইয়াদিন) কিনা? আমি বললাম, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "তাতে কোন দোষ নেই।" আবূ নাদরাহ বলেন, "আমার কথা (আব্বাস (রাঃ)-এর মত) শুনে আবূ সাঈদ (রাঃ) বললেন", "আচ্ছা, আমরা অচিরেই তাকে লিখব তিনি যেন তোমাদের এই ফতোয়া না দেন।" অতঃপর আবূ সাঈদ বলেন, "আল্লাহর শপথ! একদা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন গোলাম তাঁর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, "মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের এলাকার খেজুর নয়।" গোলামটি বললো, "এ বছর মদীনায় খেজুরের ফলন ভাল হয়নি এবং প্রাকৃতিক দোষ পড়েছে, তাই পুষ্ট হয়নি। আমি এগুলো অন্যের থেকে নিয়েছি এবং যে পরিমাণ গ্রহণ করেছি, বিনিময়ে আমাদের খেজুর থেকে তার চেয়ে কিছু অধিক দিয়েছি।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি অধিক প্রদান করে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়েছ। আর কখনও এরূপ লেনদেনের কাছেও যাবে না। যখন তুমি নিজের খেজুর নিয়ে সন্দেহে পতিত হও (এর মান নির্ণয়ে) তখন তা নগদ মূল্যে বিক্রি করে দাও। অতঃপর এই অর্থ দিয়ে তোমার পছন্দসই খেজুর কিনে নাও।" [মুসলিম, ১৫৯৪ (৯৯); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫-৫৬, নং ৩৯৪০।]

৭৮. আবূ নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উভয়েই এতে কোন দোষ মনে করেন না।" একদা আমি আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) নিকট বসা ছিলাম। "আমি তাঁকে সরফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।" তিনি বললেন, "যা অতিরিক্ত হবে তা সুদ।" আমি তাঁদের দু'জনের অভিমতের প্রেক্ষিতে তাঁর এ কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালাম। জবাবে তিনি বললেন, "আমি কেবল সে কথাই তোমাকে বলব যা আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে শুনেছি।" তা হলো এই: "এক খেজুর বাগানের মালিক উন্নত মানের এক সা' খেজুর নিয়ে তাঁর নিকট আসলো অথচ নবী (সাঃ)-এর খেজুর ছিল ভিন্ন রঙের।" নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এগুলো কোথায় পেয়েছ?" সে বললো, "আমি দু' সা' খেজুর নিয়ে (বাজারে) গিয়েছিলাম এবং তা দিয়ে এই এক সা' খরিদ করেছি। বাজারে এগুলোর প্রচলিত দাম এই এবং ঐগুলোর (উন্নত মানের খেজুর) প্রচলিত দাম এই।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি তো সুদী

কারবার করেছ। তুমি যখন এরকম করতে চাও প্রথমে তোমার খেজুরগুলো নগদ মূল্যে (বিসিলয়াতে) বিক্রি করে দাও। অতঃপর সে মূল্য দিয়ে তোমার পছন্দসই খেজুর খরিদ করে নাও।"

আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, "খেজুরের বিনিময়ে (মানের ভিত্তিতে ওজনের তারতম্যে) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করার মধ্যে সুদের উপাদান থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অথবা সোনার বিনিময়ে সোনা (ওজনের তারতম্যে) লেনদেন করার মধ্যে সুদ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।"

আবূ নাদরা বলেন, "পরে আমি ইবনে উমরের কাছে আসলাম। তিনিও আমাকে ঐ রূপে কেনাবেচা করতে নিষেধ করলেন। তবে আমি ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট যাইনি।" আবূ নাদরাহ বলেন, আবূ সাহবা' আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি এই মাসয়ালা সম্পর্কে মক্কায় ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, তিনিও এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেননি।" [মুসলিম, ১৫৯৪ (১০০); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৫৭, নং ৩৯৪১।]

৭৯. এক ব্যক্তি এক সা' ভাল খেজুর দিয়ে দুই সা' খারাপ খেজুর ক্রয় করলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি সুদ নিয়েছ, কারণ, তুমি দ্বিগুণ করেছ।'[১৮] (হাদীস)

৮০. ইবনে ইয়াসার থেকে তাঁর কতিপয় প্রতিবেশী এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী সূত্রে বর্ণিত, তাদের একজন হলেন সাহল ইবনে আবূ হাসমা (রাঃ), "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা সুদভিত্তিক লেনদেন এবং এটাই হচ্ছে মুযাবানা।" [মুসলিম, ১৫৪০ (৬৭)]

৭৫-৮০ নম্বর হাদীসগুলোতে সমজাত কিন্তু মানে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় তা বলা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, উভয় বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান মানগত তারতম্য বিবেচনায় এনে অনুমানের ভিত্তিতে এদের পরিমাণে কম-বেশি করা হলে সেই বাড়তি অংশকে রিবা বলা হয়েছে। কারণ অনুমান তো অনুমানই, তা কখনও নিশ্চিত নয়। তাছাড়া, এটা হচ্ছে মৌলিক ও স্বাভাবিক/প্রাকৃতিক বিধানের লংঘন, কেননা সমজাতের দু'টি বস্তুর মান ও পরিমাণ সমান করা হলেই কেবল এদের মূল্য সমান হয়। এমনকি, একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের দু'টি বস্তুর পরিমাণ সমান সমান করা হলেও এদের মূল্য সমান হতে পারে না। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানের পার্থক্যসহ দু'টি বস্তুর পরিমাণ সমান সমান করে বিনিময় করার নির্দেশ দেন নাই বরং তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মানে সমান সমান হতে হবে'; অন্যথায় খারাপ পণ্যটিকে তৃতীয় কোন পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা পছন্দমত উন্নত মানের পণ্য ক্রয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে, এভাবেই পরিমাণ (পূর্ণ হবে)।"

---

[১৮] উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

www.icsbook.info

iii. সমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ

৮১. **আবু বুরদা ইবনে** আবি মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি মদীনায় **এলাম এবং আব্দুল্লাহ** ইবনে সালাম এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বললেন, "তুমি এমন এক দেশে বাস কর, যেখানে সুদের লেনদেন ব্যাপক। সুতরাং কেউ যদি তোমার নিকট ঋণী থাকে এবং তোমাকে এক বোঝা খড়, কিছু বার্লি বা এক আঁটি শুষ্ক তৃণ উপহার দেয়, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করবে না, কারণ তা রিবা।" (বুখারী)

৮২. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি কাউকে ঋণ দাও অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি তাকে খাবার সাধে, ঋণদাতার তা গ্রহণ করা উচিত নয়; ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে তার পশু-বাহনে ভ্রমণ করার প্রস্তাব করে তাহলে তাতে উঠা ঋণদাতার উচিত নয় যদি তারা পূর্ব থেকে অনুরূপ আনুকূল্য পরস্পর বিনিময়ে অভ্যস্ত না হয়।" (সুনান আল-বায়হাকি)

৮৩. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি অন্যকে ধার দেয়, তাহলে কোন উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা তার উচিত নয়।" (বায়হাকি সূত্রে মিশকাত; মুনতাকা, ইবনে তাইমিয়া।)

৮৪. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ঋণ কোন সুবিধা বয়ে আনলে তা রিবা।"[১৮] (হাদীস)

৮৫. **ফাদালাহ ইবনে উবায়েদ বলেছেন, "ঋণ থেকে আহৃত** (derived) সুবিধা হচ্ছে **সুদের বিভিন্ন ধরনের একটি**।" (সুনান আল-বায়হাকি)

ঋণের ক্ষেত্রে দাতা যে জাতের পণ্য বা মুদ্রা গ্রহীতাকে প্রদান করে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হলে সেই একই জাতের পণ্য বা মুদ্রা ফেরত নেয়। অর্থাৎ ঋণে লেনদেনের বস্তু দু'টি হয় একই জাতের। সুতরাং এক্ষেত্রে সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে মানের যত পরিমাণ বস্তু দেওয়া হয়েছে সেই একই মানের সমপরিমাণ বস্তু ফেরত নেয়ার পর তার ওপরে ঋণের শর্ত হিসেবে যদি অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিস উপহার উপঢৌকন বা কোন সুবিধা গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটাই হবে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত বা রিবা। হাদীস কয়টিতে এই ব্যাপারেই সতর্ক করা হয়েছে।

গ) অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ সংক্রান্ত

i. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ (নগদ-বাকি উল্লেখ নেই)

৮৬. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন মুসতারসালকে (বাজার সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি) ঠকানো হচ্ছে রিবা।" (সুনান আল-বায়হাকি সূত্রে সুয়ূতি কর্তৃক তাঁর জামি আল সগীর-এ উদ্ধৃত।)

---

[১৮] উদ্ধৃত নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

www.icsbook.info

৮৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নাজিশ (নিলামে ডাক বাড়ানোর জন্য যে দালাল হিসেবে কাজ করে) হচ্ছে অভিশপ্ত সুদখোর।" (হাদীস) (তাবারানির আল-কবীর থেকে ইবনে হাজার আল-আসকালানি তাঁর ফতহুল বারি এবং সুয়ূতি তাঁর জামি আল-সগীরে উদ্ধৃত করেছেন।)

৮৮. "যে ইজাবে লিপ্ত হয় সে সুদ খায়।" (ইজাব হচ্ছে ফল পাকা শুরু হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি করা।) (উদ্ধৃত, বাদাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।)

৮৯. আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যদি তার কোন ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে, অতঃপর তার দেওয়া কোন উপহার/উপঢৌকন গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের বড় বড় দরজাসমূহের মধ্যে কোন একটি দরজা দিয়ে সুদের মধ্যে প্রবেশ করল।" (মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদ।)

অসম জাতের বস্তুর ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বেচ্ছা সম্মতিতে নির্ধারিত যে কোন পরিমাণে/দামে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ধোকাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতির মাধ্যমে দাম বেশি নিলে তা বিনিময়হীন হয়ে যায় বিধায় এ বাড়তি অংশকে রিবা বলা হয়েছে।

ii. অসমজাতের বস্তু, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ

৯০. আবূল মিনহাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার এক অংশীদার হজ্জ মওসুমে অথবা হজ্জের দিনগুলোতে মূল্য পরিশোধের শর্তে কিছু রূপা ধারে বিক্রি করল। অতঃপর সে আমার নিকট আসল এবং আমাকে অবহিত করল।" আমি বললাম, "তোমার এই লেনদেন বাঞ্ছিত নয়।" সে বলল, "আমি তা বাজারে বিক্রি করলাম। কিন্তু কেউ আমার এ কাজে আপত্তি করেনি।" অতঃপর আমি বারাআ ইবনে আযিবের (রাঃ) কাছে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, "নবী (সাঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আসলেন। তখন আমরা এ ধরনের বেচা-কেনা করতাম।" তিনি বলেন, "এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেটা পারস্পরিক বিনিময় হবে (ইয়াদান বিইয়াদিন) তার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে (লেনদেন) বিনিময় ছাড়া হবে (নাসীয়াতান) তা রিবা। "তবে তুমি (ব্যাপারটি) যায়েদ ইবনে আরকামের (রাঃ) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে নাও। কেননা, তিনি আমার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী। অতএব, আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন।" [মুসলিম, ১৫৮৯ (৮৬); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭, নং ৩৯২৫।]

৯১. মালিক ইবনে আওস ইবনে ইবনুল হাদাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি বলতে বলতে আসলাম, কে (আমার স্বর্ণের সাথে) দিরহাম বিনিময় করবে? তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন।" তালহা ইবনে

www.icsbook.info

উবায়েদ বললেন, "তোমার স্বর্ণ আমাদের দেখাও এবং (পরে এক সময়ে) আমাদের কাছে আস। পরে যখন আমাদের খাদেম আসবে তখন তোমাকে তোমার দিরহাম দিয়ে দিব।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, "কক্ষণো না! আল্লাহর শপথ। হয়তো তুমি এখনই তাকে (দিরহাম) রৌপ্য দিয়ে দাও অথবা তার স্বর্ণ তাকে ফেরত দাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য লেনদেন পারস্পরিক (হা'আ ওয়া হা'আ) না হলে সুদে পরিণত হবে। গমের বিনিময়ে গম, (হা'য়া ওয়া হা'য়া) না হলে সুদ হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর (হা'আ ওয়া হা'আ) না হলে তাও সুদে পরিণত হবে।" [মুসলিম, ১৫৮৬ (৭৯)]

৯২. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "(এক সময়ে) তিনি একশ' দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে (তিনি বর্ণনা করেন) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ আমাকে ডাকলেন। আমরা (দীনার বিনিময়ের বিষয়ে) কথাবার্তা শেষ করলাম। এমনকি বিনিময়ের বিষয়টি তিনি স্থির করে আমার হাত থেকে স্বর্ণ দীনারগুলো নিয়ে স্বীয় হাতের ওপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, গাবা (নামক জায়গা) থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উমর (রাঃ) এসব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তার (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্) নিকট থেকে দীনার-এর বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ লেনদেন পারস্পরিক না হলে সুদে পরিণত হবে, গমের বিনিময়ে গম লেনদেন পারস্পরিক না হলে সুদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব লেনদেন পারস্পরিক না হলে সুদে পরিণত হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর লেনদেন পারস্পরিক না হলে তাও সুদে পরিণত হবে।" (সহীহ্ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, পৃঃ ৩৫০, নং ২০২৪।)

৯০ নম্বর হাদীস থেকে বুঝায় যে, ধারে রূপা বিক্রয়ে যদি বিনিময় পারস্পরিক হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু পরবর্তী দু'টো হাদীসে ইয়াদান বিইয়াদিন-এর পরিবর্তে হা'আ ওয়া হা'আ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর বরাত দিয়ে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "এখনই তাকে দিরহাম দিয়ে দাও অথবা তার স্বর্ণ ফেরত দাও"; "যতক্ষণ তার কাছ থেকে দীনারের বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" 'হা'আ ওয়া হা'আ'-এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, "এখানে তুমি ও এখানে তুমি- "here you are and here you are"। (উদ্ধৃত সারাখসী, পূর্বোক্ত) ইমাম সারাখ্‌সী এর অর্থ লিখেছেন, "This for this"- "এটার বদলে এটা"। (সারাখসী, পূর্বোক্ত।) পারস্পরিক বিনিময় বা reciprocal exchange অর্থেই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস দু'টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে দীনারের সাথে দিরহাম বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এতে নির্ধারিত দাম-দস্তুর যেমন উল্লেখ নেই তেমনি পরিশোধের সময়ও সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। হযরত উমর (রাঃ) সম্ভবত এ কারণেই বলেছেন

www.icsbook.info

যে, এখনই দাও, 'বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। লক্ষণীয় যে, উমর (রাঃ) যে হাদীসের বরাত দিয়েছেন তাতে সোনার সাথে রূপা বিনিময়ের কথা বলার পরেই গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব ইত্যাদি সমজাতীয় বস্তু বিনিময়ের কথাও বলেছেন। আর একথা ঠিক যে, গম-যবের বাকি বিনিময় অবৈধ নয়; সুতরাং এর থেকে পৃথক করে কেবল সোনা-রূপা ও মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ একথা কিভাবে বলা যেতে পারে? বিশেষ করে, আল-কুরআন যেখানে দাইন ক্রয়-বিক্রয় থেকে সোনা-রূপা ও মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে পৃথক করার অবকাশ রাখেনি সেখানে তো এরূপ বলার প্রশ্নই আসে না।

৩. সাধারণ নির্দেশনা সংক্রান্ত হাদীস (সকল ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

i. ইয়াদিন বিইয়াদিন

৯৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিনিময় পারস্পরিক হলে তাতে রিবা হয় না।"[২০] [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০৩)]

৯৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "(মুদ্রা ও দ্রব্য-সামগ্রীর) বিনিময় পারস্পরিক (ইয়াদান বিইয়াদিন) হলে তাতে সুদ হবে না।"* [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০৩)]

ii. নাসীয়াহ

৯৫. আবূ সালেহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আবূ সাঈদকে (রাঃ) বলতে শুনেছি। দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, মানে সমান সমান (মিসলান বিমিসলিন) বিক্রি করা যেতে পারে। কিন্তু যে কেউ বেশি নিল বা দিল সে সুদের কারবার করল।" আবূ সালেহ বলেন, "তখন আমি তাকে বললাম, ইবনে আব্বাস তো এর বিপরীত বলেন।" জবাবে আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, "আমি ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, "আপনি যে কথাটি বলছেন তা কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে শুনেছেন, না মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "এর কোনটিই নয়। আমি তা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছেও শুনিনি এবং আল্লাহর কিতাবেও পাইনি। বরং আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "নবী (সাঃ) বলেছেন, কেবলমাত্র বিনিময় না থাকলেই (নাসীয়াতে)* সুদ হয়।" [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০১); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭, নং ৩৯৪২।]

---

২০. মুসলিম, নাসাঈ; উদ্ধৃত, চাপরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭।

* ইয়াদান বিইয়াদিনের বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্য নাসীয়াহ্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ নগদ বিনিময় হলে নাসীয়াহ অর্থ বাকি বিনিময় হতে পারে। কিন্তু ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ যদি পারস্পরিক বিনিময় হয়, তাহলে নাসীয়াহ অর্থ হবে প্যারস্পরিক বিনিময় না করা বা বিনিময় না দিয়ে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই অর্থেই পরিভাষা দু'টি ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। তবে নাসীয়াহর সাধারণ অর্থ ঋণ, বাকি ক্রয়-বিক্রয়; ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থেই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, সুদ কেবল ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ হয় না। পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করেন বলে জাবির (রাঃ) জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুদ ও মুতআ

www.icsbook.info

৯৬. **আতা ইবনে আবূ রাবাহ থেকে বর্ণিত।** তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) **ইবনে আব্বাসের (রাঃ) সাথে সাক্ষাত করেন।** তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, **(মুদ্রা এবং দ্রব্য-সামগ্রীর) লেনদেন সম্পর্কে কি বলছেন?** আপনি কি তা **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছেন, না কি কিছু আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন?" উত্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন,** "এর কোনটি আমি বলি না। আপনারা **তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অধিক** বেশি জানেন। আর আল্লাহর কিতাব তাও আমি **অধিক বেশি** জানি না। আমাকে বরং উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জেনে রাখ! কেবলমাত্র বিনিময়হীনতার (নাসীয়াহ) সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত।" [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০৪); সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯-৬০, নং ৩৯৪৫।]

৯৭. উবায়দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন, "উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, "কেবলমাত্র বিনিময়হীনতার (নাসীয়াহ) সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত।" [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০২)।]

৯৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিনিময়হীন না হলে রিবা হয় না।" (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ।)

৯৯. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই রিবা হচ্ছে বিনিময়হীন।" [মুসলিম, ১৫৯৬ (১০১)।]

iii. এক লেনদেনে (deal) দুই দাম

১০০. ইবনে মাসূদ বলেন, "এক লেনদেনে দুই দাম সুদ জন্ম দেয়।"[২১]

১০১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে এক লেনদেনে দুই বিক্রয় করে তার উচিত কেবল মূলটা (Principal) গ্রহণ করা, অন্যথায় সে সুদ খায়।"[২২]

iv. বিশেষ

১০২. সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন মুসলমানের মান-সম্মান হানিকর অন্যায় কিছু বলা হচ্ছে সুদের সর্বাধিক প্রচলিত ধরনের একটি।" (সুনানে আবূ দাউদ)

বিয়ে সম্পর্কিত তাঁর মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।" অনুরূপভাবে ইমাম হাকেমও বলেছেন যে, "ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরবর্তীকালে সেই ফতোয়া থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করেন এবং রিবা আল-ফদলকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে থাকেন। (সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮, টীকা)। অবশ্য এ সম্পর্কে ভিন্নতর বর্ণনাও আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁর অনুসারী সবাই তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন। ইয়াদান বিইয়াদিন বিষয়ে আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২১. উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

২২. শাওকানি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২, উদ্ধৃত, ঐ।

www.icsbook.info

৪. সুদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস

১০৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ নবীর (সাঃ) বিদায় হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের সম্বোধন করে বললেন, "জাহিলিয়্যাত যুগের সকল সুদ বাতিল করা হয়েছে। সর্ব প্রথম আমি আমাদের রিবা বাতিল করছি, তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের (নবী করীমের সাঃ চাচা) পাওনা সুদ। তা সম্পূর্ণ বাতিল করা হলো।"[২৩]

৫. সুদের ফলাফল ও পরিণতি সংক্রান্ত হাদীস

১০৪. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মানুষের জন্য অবশ্যই এমন একটি সময় আসবে যখন প্রত্যেকেই সুদ গ্রহণ করবে। আর কেউ যদি সুদ গ্রহণ না করে তাহলে সুদের ধুলা হলেও তার কাছে পৌছবে।" (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

১০৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুদ গ্রহণকারী ও সুদ প্রদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।" আলকামা বলেন, "আমি বললাম এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়?" আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, "আমরা শুধু এতটুকু বলব যা শুনেছি।" [মুসলিম, ১৫৯৭ (১০৫)]

১০৬. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাব (বা চুক্তিপত্র) লিখক এবং এর সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। এরা সবাই সমান অপরাধী।" [মুসলিম, ১৫৯৮ (১০৬)]

১০৭. ইবনে মাসূদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সুদের পরিমাণ যদি খুব বেশিও হয়, তাহলেও শেষ পর্যন্ত তা অতি নগণ্য ও তুচ্ছ হতে বাধ্য।" (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ।)

১০৮. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ (ভিত্তিক অর্থনীতি) সমৃদ্ধি আনে, কিন্তু সুদের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে অভাব এবং সংকোচন।" (মুসনাদে আহমদ)

১০৯. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যিনা ও সুদ জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।" (মুসনাদে আহমদ)

১১০. আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, জেনে-শুনে সুদের একটি দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করার চেয়েও জঘন্য।"[২৪] বায়হাকি নিচে উল্লেখিত অংশসহ হাদীসটি শু'য়াব আল-ঈমানে

---

২৩. *মুসলিমঃ* কিতাবুল হজ্জ, *মুসনাদে আহমদ*, উদ্ধৃত, চাপরা, এম, উমর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৪. *মিশকাত আল-মাসাবিহ*, কিতাব আল-বুয়ূ, বাবুর-রিবা, *মুসনাদে আহমদ ও দারা কুতনি* সূত্রে; উদ্ধৃত, চাপরা, এম উমর, উপরোক্ত, পৃ. ২৩৭।

www.icsbook.info

উদ্ধৃত করেছেন, "অন্যায় ভক্ষণের দ্বারা যার শরীরে গোশ্‌ত তৈরী হয়েছে তার জন্য দোযখই উপযুক্ত স্থান।"

১১১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মিরাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকের দেখা পেলাম যাদের পেট ঘরের মত এবং পেটগুলো সাপে ভর্তি যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?" উত্তরে তিনি বললেন, "এরা হচ্ছে সেই সব লোক যারা সুদ গ্রহণ করত।" (ইবনে মাজাহ)

১১২. সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "নবী (সাঃ) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত-নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সাঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।" (সহীহ আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল বুয়ূ, পৃঃ ৩১৩-১৪, নং ১৯৪০)

১১৩. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "চার শ্রেণীর লোককে আল্লাহ যুক্তি সঙ্গত কারণেই বেহেশতে প্রবেশ করতে দিবেন না। এমনকি বেহেশতের সুগন্ধও তারা পাবে না। যারা অভ্যাসবশত মদ পান করে, যারা সুদ খায়, যারা ইয়াতীমের সম্পদ অধিকার ছাড়া অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং যারা পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য অবহেলা করে।" (মুসতাদরাক, আল-হাকিম)

১১৪. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রিবার সত্তরটি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে কম মন্দটি হচ্ছে, নিজ মায়ের সাথে যিনা করার সমান।" (ইবনে মাজাহ)

১১৫. ইবনে মাসূদ সূত্রে হাকিম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সুদের তিয়াত্তরটি ধরন রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কম মন্দটি হচ্ছে, নিজ মায়ের সাথে যিনা করার সমান; মুসলিমদের মধ্যে যে সুদী কারবার করে সে পাগল।" (হাদীস)

www.icsbook.info

১১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আল-কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে, রিবা সংক্রান্ত আয়াত।"[২৫]

১১৭. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "সুদ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সর্বশেষে; আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়ে আমাদের কাছে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁকে নিয়ে গেছেন। সুতরাং তোমরা সুদ পরিত্যাগ কর আর যা সন্দেহজনক তাও পরিহার কর।" (ইবনে মাজাহ)

১১৮. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যদি তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করতেন, তাহলে তা আমার কাছে পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় হতো। বিষয় তিনটি হচ্ছে, কালালা, রিবা ও খিলাফা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

---

২৫. *বুখারী*, ভলি-৬, কিতাব-৬০, নং ৬৭।

www.icsbook.info

তৃতীয় অধ্যায়

অপরাপর ধর্ম ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ

অপরাপর ধর্মের দৃষ্টিতে সুদ

আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কেবল ইসলামেই সুদ নিষিদ্ধ। কিন্তু এ কথা আদৌ সঠিক নয়; বরং প্রাচীন কাল থেকে দুনিয়ায় আসমানী ধর্ম হিসেবে প্রচারিত সকল ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ্ আপীলেট বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিচারপতি ওয়াজিউদ্দীন আহমদ বেঞ্চ কর্তৃক সুদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ে সংযোজিত তাঁর মন্তব্যে বলেছেন, "the notion is practically as old as civilization itself, "Quranic prohibition against riba, in the background of pre-existing restrictions applicable to Ahle-Kitab (people of the scripture i.e. Jews and Christians), for "*there is no change in religion*" (Al-Quran), which, evolutionary processes and man-made deviations apart, has remained the same since Adam, was gradual, first as pointers and then as the strictest of the commandments."[১] "মানব সভ্যতা যতটা পুরাতন সুদের ধারণাটিও ততটাই প্রাচীন। সুদের ওপর আল-কুরআনের নিষেধাজ্ঞা কার্যতঃ আহলি কিতাবদের (ইহুদী ও খৃস্টান) ওপর এই বিষয়ে পূর্ব থেকে আরোপিত ও প্রযোজ্য বিধি- নিষেধের ধারাবাহিকতা মাত্র। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে বিবর্তন প্রক্রিয়া ও মানুষের সৃষ্ট বিচ্যুতি ছাড়া ধর্মে কোনও পরিবর্তন হয় না। হযরত আদম (আঃ) থেকে ধর্ম একই রয়েছে এবং সুদ সংক্রান্ত এর বিধি-বিধানসমূহ প্রথমত ছিল দিক-নির্দেশনামূলক, পরে ধারা পরিক্রমায় তা কঠোর অনুশাসনে পরিণত হয়।"

বস্তুতঃ আদম (আঃ) ছিলেন পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রথম মানুষ; আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নবীও। অতঃপর যুগে যুগে দেশে দেশে আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই সেই একই আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং আদি থেকে শুরু করে সকল যুগে সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত দ্বীনে সুদ নিষিদ্ধ ছিল এটাই স্বাভাবিক।

---

[১] *SLR*, Feb. 2000, Lahore, Vol. 1, No. 2, p. 7-8.

www.icsbook.info

কিন্তু সকল নবী-রাসূলের কাছে নাযিলকৃত আল্লাহর গ্রন্থ সংরক্ষিত নেই। আজকের দিনে যে কয়টি গ্রন্থকে আসমানী গ্রন্থ বলে মনে করা হয় তার মধ্যে একমাত্র আল-কুরআনই অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ আছে। এছাড়া অন্যান্য সব কয়টি গ্রন্থেই আল্লাহর বাণীর সাথে মানুষের কথার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। তার পরেও এসব গ্রন্থ থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ, খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সুদ নিষিদ্ধ ছিল বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। বিচারপতি ওয়াজিউদ্দীন আহমদ বলেছেন, "While evidence of such transactions is found reflected, and perhaps not approved except with reservations, in the Code of Hammurabi (1712-1750 BC) of the Babylonian era, the practice was either controlled or consistently disapproved in the religious precepts and teachings of Hinduism (Code of Manu), Judaism and Christianity."[২] "বেবিলনীয় যুগে (খৃস্টপূর্ব ১৭৫০-১৭১২) হাম্মুরাবি সংহিতায় সুদ লেনদেন সংক্রান্ত দৃষ্টান্তের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়, সম্ভবতঃ এর অনুকূলে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ধর্মীয় অনুমোদন ছিল না। তবে হিন্দু ধর্ম (মনুসংহিতা) এবং ইহুদী ও খৃস্ট ধর্মে সুদকে হয় নিয়ন্ত্রণ করা হতো, না হয় রীতি মাফিক তা নিষিদ্ধ ছিল।" নিচে এ সংক্রান্ত তথ্য পেশ করা হলো ঃ

ইহুদী ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ

বনি ইসরাঈলদের মধ্যে আল্লাহ বহু সংখ্যক নবী প্রেরণ করেছিলেন। এই নবীদের (আঃ) কাছে আল্লাহ বেশ কয়টি গ্রন্থও নাযিল করেছেন। মূসা (আঃ)-এর ওপর নাযিল করেছিলেন তাওরাত এবং দাউদ (আঃ)-এর ওপর নাযিল করেছিলেন যাবূর। তাঁদের কাছে নাযিলকৃত গ্রন্থে সুদ নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়া, ইহুদীদের মৌলিক আইন গ্রন্থ 'তালমূদ' এবং 'মিশনাহ'-তে ইহুদীদের সুদী লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে; এমনকি, ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর সুদ লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করা, গ্যারান্টি প্রদান করা অথবা সাক্ষী হতেও নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

মূসার (আঃ) কাছে নাযিলকৃত তাওরাতের ৫টি পুস্তকের মধ্যে ৩ টিতেই সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আয়াত পাওয়া যায়; সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. লেভিটিকাস (Leviticus) ঃ ২৫ ঃ ৩৫-৩৭ (তাওরাত)

"If your brother meets with difficult times, you shall give him shelter and lodging, though he be a stranger or a sojourner, that he may live

---

২. উপরোক্ত।

৩. Hassan, Mahbob ul: *An Explanation of Rationale behind the Prohibition of Riba in the Dotrines of three major Religions with special reference to Islam,* mhassanjp@yahoo.com.jp, o. 75.

www.icsbook.info

with you. Do not exact from him any interest (riba) over and above that which you have spent on him. You have the anger of God to fear. See to it that your brother has freedom to live with you. It is not permissible for you to receive interest (riba) on what you spend, or what you write off."[৪]

"তোমার ভাই যদি দুঃসময়ে নিপতিত হয়, তাহলে তুমি তাকে বাসস্থান ও আশ্রয় দেবে, সে যদি বিজাতীয় হয় অথবা অতিথি হয় তবুও। তাকে তোমার সাথে বাস করতে দাও। আর তার জন্য যা কিছু ব্যয় করবে তার ওপর সুদ গ্রহণ করবে না। প্রভুকে ভয় কর। তোমার ভাই-এর অধিকার আছে তোমার সাথে বাস করার। তুমি যা খরচ কর বা মাফ করে দাও, তার ওপরে সুদ গ্রহণ করা বৈধ নয়।" (লেভিটিকাস-এ ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে টারবিট অথবা মারবিট: এর অর্থ হচ্ছে ঋণদাতা কর্তৃক ঋণের ওপর আদায়কৃত সুদ।)

২. Exodus-২২ ঃ ২৪ (তাওরাত)

"তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ধার দাও যারা গরীব, তবে তোমরা তার উত্তমর্ণ মহাজন হবে না এবং তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।"[৫]

৩. Deuteronomy ঃ ২৩ ঃ ১৯-২০ (তাওরাত)

"তোমরা তোমাদের স্বজাতীয় ভাইকে সুদে ধার দিবে না - অর্থের ওপর সুদ, খাদ্য-সামগ্রীর ওপর সুদ এবং যে কোন জিনিস যা ধার দেওয়া হয়, তার ওপরে সুদ।"[৬]

ইহুদীদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) কে দেওয়া হয়েছিল যাবুর কিতাব। ইহুদীরা এই গ্রন্থকে বলে *'সামস'*। এই গ্রন্থেও সুদ নিষিদ্ধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. Psalms : 15: 1, 2,5

"প্রভু! আপনার তাঁবুতে স্থান পাবে কে? আপনার পবিত্র পর্বত গিরিতে কে বাস করবে? যে ন্যায় পথে চলে, পুণ্যের কাজ করে এবং সর্বান্তকরণে সত্য কথা বলে; যে তার অর্থ সুদে খাটায় না অথবা নিরীহ লোকদের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে না।"[৭]

৫. Proverbs : 28 : 8

"যে সুদ এবং অন্যায় উপার্জনের দ্বারা তার সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, সে তা নিজের জন্য পুঞ্জীভূত করে যা দরিদ্রদের দুর্দশা বাড়ায়।"[৮]

---

৪. উদ্ধৃত, ইমরান, এন, হোসেইন, *The Prohibition of Riba in the Quran and Sunnah*, p. 64।

৫. উদ্ধৃত, মুঃ শরীফ হুসাইন ও এস, এম, হাবিবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন*, বাংলা অনূদিত, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পৃ: ৮৬।

৬. উপরোক্ত, পৃ: ৮৬।

৭. উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত পৃ. ২৩।

www.icsbook.info

৬. *Nehemiah: 5 : 7*

"অতঃপর আমি বিবেকের সাথে বুঝাপড়া করেছি এবং সম্ভ্রান্তদের ভর্ৎসনা করেছি এবং তাদের নীতি-ব্যবস্থাকেও; তাদের বলেছি, তোমরা জবরদস্তি সুদ আদায় কর, তার সব ভাই থেকে এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে এক মহা-সম্মেলনের ব্যবস্থা রেখেছি।"[৯]

বনি ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর আর এক নবী ছিলেন যুলকিফল, যাকে এযিকেল বলা হয়। তার কাছে আল্লাহ্ যে বিধান নাযিল করেন তাতেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যুলকিফল একজন আর এযিকেল আর একজন নবী ছিলেন।

৭. a) *Ezekiel : 18 : 8*

"যে সুদে ধার দেয় না এবং সুদ গ্রহণও করে না, যে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, যে বিবদমান পক্ষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দেয়, যে আমার নির্দেশিত পথে চলে এবং আমার বিধি-নিষেধ পরিপালনে যত্নবান হয়, সেই হচ্ছে পুণ্যবান, নিশ্চয়ই সে পরিত্রাণ লাভ করবে, বললেন সদা প্রভু।"[১০]

b) *Ezekiel : 22 : 12*

"এখানে তারা রক্তপাত করার জন্য উপঢৌকন গ্রহণ করেছে, তারা সুদ খেয়েছে এবং বৃদ্ধি আদায় করেছে, তারা লোভাতুর ও স্বার্থপর হয়ে জোরপূর্বক প্রতিবেশীদের সম্পদ কেড়ে নিয়েছে এবং তারা আমাকে ভুলে গেছে, বললেন সদা প্রভু।"[১১]

খৃস্টান ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ

ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী। খৃস্টানগণ তাকে যীশুখৃস্ট বলে থাকে। তাঁর কাছে নাযিলকৃত গ্রন্থ The Gospel of Jesus-তে সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

a) *Gospel of St. Luke : 6 : 35*

"না, তোমাদের শত্রুদের অবশ্যই ভালবাসবে এবং তাদের সাহায্য করবে; এবং তাদের ধার দিবে তবে কোন বিনিময় নেবে না; আর তোমরা 'অতি বড়' পুরস্কার লাভ করবে। আর তোমাদের অবস্থান হবে 'অতি উচ্চে'। কেননা তিনি বড়ই দয়াশীল, এমনকি, অকৃতজ্ঞ ও পাপীদের প্রতিও।"[১২]

আবার বলা হয়েছে, "ধার দাও, তার বিনিময়ে কিছু আশা না করে" (Lend, hopping for nothing again)।[১৩]

---

৮. উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ২৩।
৯. উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ২৪।
১০. উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ২৪।
১১. উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ২৪।
১২. উদ্ধৃত, ইমরান, এন, হোসেইন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯।
১৩. উদ্ধৃত, আফজালুর রহমান, *ইকোনমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১।

www.icsbook.info

b) Gospel of St. Mathew : 21 : 12-13

"যীশু আল্লাহ্‌র ঘরে (মাসজিদুল আকসা) প্রবেশ করলেন এবং সেখানে যা কিছু বেচাকেনা হচ্ছিল তা সব বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং অর্থ বিনিময়কারীদের টেবিলগুলো উল্টিয়ে ফেললেন (যারা মানুষের সম্পদ শোষণ (ripping off) করে নিচ্ছিল) এবং বললেন, "এটা লিখিত আছে যে, আমার ঘরে ইবাদত করা হবে, কিন্তু তোমরা একে চোরদের আড্ডাখানা বানিয়ে নিয়েছ।"

"উল্লেখ্য যে, তৎকালে দুই রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক ধরনের মুদ্রা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ রোমান মুদ্রা; এর ওপর রোমান সম্রাটের মূর্তি খোদাই করা ছিল; এজন্য মসজিদের ভেতরে বসে এ মুদ্রা লেনদেন করা বৈধ ছিল না। আর দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রা ছিল যার ওপর কোন ছবি ছিল না। অর্থ বিনিময়কারীরা এই উভয় মুদ্রা পরস্পর বিনিময় করত এবং মানুষকে প্রতারণা করে (রেশিও কম-বেশি করে) লাভবান হতো। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল সুদ। এজন্য যীশু এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।"[১৪]

হিন্দু ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ

a) হিন্দুধর্মে 'মনু'-এর (২য় শতাব্দী, AD) বিধিমালায় সুদ লেনদেন অবৈধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।[১৫]

b) বেদ ঃ (2000-1400 BC) বেদে কুষীন্দিনব (সুদখোর) শব্দটি বেশ কয়েকবার উল্লেখ আছে। এর দ্বারা ঋণদাতা কর্তৃক সুদ গ্রহণকে বুঝানো হয়েছে।

c) সূত্র ঃ (900-100 BC) এতে বারবার এবং বিস্তৃতভাবে সুদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

d) **ভাসিশখা ঃ** তদানীন্তন কালের একজন প্রখ্যাত হিন্দু আইন প্রণেতা একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন; এতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়দের জন্য সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে একটি প্রবাদ চালু ছিল যে, "নগচ্ছেৎ শুন্ডিকায়লং"; অর্থাৎ সুদখোরের বাড়ীতে যেয়ো না।

বৌদ্ধ ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ

'জাতাকাস'-এ (600-400 BC) (বুদ্ধধর্মে) সুদকে ঘৃণা করা হয়েছে এবং সুদখোরদের 'ভণ্ড তপস্বী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "hypocritical ascetics are accused of practicing it."

হাম্মুরাবি মতবাদে সুদ নিষিদ্ধ

প্রাচীন বেবিলনে হাম্মুরাবি মতবাদেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

---

১৪. ইমরান, এন, হোসাইন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০-৭১।

১৫. বিচারপতি ওয়াজিউদ্দীন, SLR, February, 2000, Lahore, Vol. 01, No. 02, পৃঃ ৮।

www.icsbook.info

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কেবল ইসলামই সুদ নিষিদ্ধ করেনি, বরং পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ধর্মই সুদ নিষিদ্ধ করেছে।

দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সুদ

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো-এ্যারিস্টোটল থেকে শুরু করে আধুনিক দার্শনিকদের অনেকেই সুদকে ক্ষতিকর মনে করেছেন, একে ঘৃণা করেছেন এবং এর নিন্দা করেছেন। নিচে কতিপয় দার্শনিকের মত পেশ করা হলো ঃ

প্ল্যাটো ঃ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো তাঁর 'লজ' নামক পুস্তকে সুদের নিন্দা করেছেন। তিনি সুদকে মানবতাবিরোধী, অন্যায় ও জুলুম এবং কৃত্রিম ব্যবসা বলে তীব্রভাবে সুদের বিরোধিতা করেছেন।[১৬]

এরিস্টোটল ঃ প্ল্যাটোর ন্যায় এরিস্টোটলও কঠোর ভাষায় সুদের নিন্দা ও বিরোধিতা করেছেন। তিনি অর্থকে বন্ধ্যা মুরগীর সাথে তুলনা করেছেন যা ডিম দিতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, "A piece of money cannot beget another piece"। তার মতে, অর্থের একমাত্র স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষের পারস্পরিক অভাব পূরণে সাহায্য করা। তাঁর বিবেচনায় অর্থ ধার দিয়ে তার ওপর সুদ আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য অর্থের ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি সুদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন, "অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা একটি কৃত্রিম ও জালিয়াতি ব্যবসা।" তিনি তাঁর পলিটিক্স শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "The most hated sort (of wealth), and with the greatest reason, is usury, which makes gain out of money itself, and from the natural objects of it. For money was intendeded to be used in exchange, and not increase at interest of all modes of getting wealth, this is the most unnatural."[১৭] "সঙ্গত কারণেই সবচেয়ে ঘৃণিত হচ্ছে সুদ যার দ্বারা অর্থ নিজ থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং অর্থের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য থেকেও। কারণ অর্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, সুদের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়া নয়; সম্পদ অর্জনের পন্থা-পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে অস্বাভাবিক।"

থমাস একুইনাস ঃ সুদের বিরুদ্ধে থমাস একুইনাসের যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহার পৃথক করা যায় না। তাই অর্থ ব্যবহার করা মানে অর্থকে নিঃশেষ বা খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের দাম নেওয়ার পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া হলে, একই পণ্যকে দু'বার বিক্রয় করার অপরাধ হবে, অথবা দ্বিতীয়বার এমন জিনিসের দাম নেওয়া হবে, যা প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার দখলে নেই। তাঁর মতে, নিঃসন্দেহে এটি একটি অতি বড় অবিচার ও জুলুম।

---

১৬. প্ল্যাটো: '*লজ*', বুক-৫।
১৭. Aristotle: *Politics,* 1258.

www.icsbook.info

সুদকে যারা সময়ের মূল্য বলে দাবী করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেছেন, "সময় হচ্ছে একটি সাধারণ (common) সম্পদ; সময়ের ওপর ঋণদাতার যেমন অধিকার আছে, ঋণগ্রহীতারও ঠিক তেমনি অধিকার রয়েছে; অন্যান্য সকল মানুষেরই সময়ের ওপর একই সমান অধিকার আছে। এমতাবস্থায় ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট সময়ের মূল্য দাবী করা একটা ভণ্ডামি ও অসাধু ব্যবসা।"[১৮]

মিসাব্যু ঃ ইটালীয় লেখক মিসাব্যু সুদকে অযৌক্তিক বলেছেন; তিনি বলেছেন, "একদিকে অর্থ হচ্ছে একটি প্রতীক মাত্র - এর নিজস্ব কোন ব্যবহার নেই; অপরদিকে বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্রের ন্যায় অর্থের কোন ক্ষয়-ক্ষতিও নেই।" সুতরাং তাঁর মতে অর্থের ওপর সুদ ধার্য করার কোন যুক্তি নেই।[১৯]

অন্যান্য দার্শনিক ঃ ক্যাটোস, কাইসীরো, সেনেকা এবং পোটাস প্রমুখ দার্শনিকগণও অর্থকে বন্ধ্যা আখ্যায়িত করেছেন এবং অর্থের ওপর সুদ ধার্য করাকে অযৌক্তিক বলে অভিমত দিয়েছেন।

এছাড়া রোমের আইন প্রণেতাগণ, হিন্দু দার্শনিকবৃন্দ, ইহুদী ও খৃস্টান যাজকগণও সুদকে ঘৃণা করতেন। খৃস্টান ধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুদয় এবং রোমে পোপ নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল।

---

১৮. বোম বাওয়ার্ক: *দি পজিটিভ থিওরী অব ইন্টারেস্ট*, পৃঃ ৩৪।

১৯. Ibid, p. 34.

www.icsbook.info

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-বাকারাহর ২৭৫ আয়াতে বলেছেন, "আল্লাহ বাইকে হালাল করেছেন, আর রিবাকে করেছেন হারাম।" পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ এক শাশ্বত ও চিরন্তন প্রাকৃতিক সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন। বাই হচ্ছে মানব জাতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর; তাই হালাল। আর রিবা হচ্ছে মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর এজন্যই রিবা হারাম। বাই ও রিবার পার্থক্য আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে বাই আর পরে রিবার কথা বলেছেন। একই ধারাবাহিকতায় আলোচনা করলে বিষয় দু'টি বুঝা সহজ হবে।

বাই বা ক্রয়-বিক্রয়

বাই অর্থ ঃ উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ আরবী বাই (بَيْع) শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বাই'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। মিলটন কাওয়ান বাই অর্থ লিখেছেন, "to sell, to buy and sale, to make a contract of purchase and sale; to offer for sale; to agree on the terms of sale; conclude a bargain."[১] "বিক্রয় করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করা, বিক্রয়ের জন্য পেশ করা, বিক্রয়ের শর্তে সম্মত হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা।"

"It is the word with two opposite meanings, i.e, purchase and sale; sale and purchase, respectively."[২] "বাই এমন একটি শব্দ যার দু'টি বিপরীতমুখী অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ যথাক্রমে ক্রয় এবং বিক্রয়, বিক্রয় এবং ক্রয়।"

'Bai : To purchase; To sell (of goods)."[৩] "বাই (পণ্যদ্রব্য) ক্রয় করা; বিক্রয় করা।"

সুতরাং 'বাই' অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই করা হয় ব্যবসা, আর ব্যবসা থেকে আসে লাভ বা মুনাফা। এজন্য কোন কোন অনুবাদক বাই-এর অর্থ করেছেন ব্যবসা; কেউ কেউ আবার এর তরজমা করেছেন মুনাফা। প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয় যত ব্যাপক ব্যবসা ও মুনাফা তত ব্যাপক নয়। সুতরাং বাইকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম।

---

১. Cowan, John Milton (ed): *A Dictionary of Modern Written Arabic,* Third Printing, Macdonald & Evans Ltd., London, 1994, p. 86.

২. *Al Munjed on Words and Information,* Catholic Church Group, Dar El-Mashreque Publishers, Beirut, Lebanon, 1986, p., 57.

৩. *Arbi Bangla Ovidhan,* Bangla Academy, 1984, Second Edition, Vol. 1, p. 745.

www.icsbook.info

বাই-এর সংজ্ঞা ঃ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।"[৪] এখানে আল্লাহ শিরা (ক্রয়) শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বেহেশত দিবেন, আর জান-মাল নিয়েছেন। এ কথা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে কিছু দিয়ে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া। ফকীহ্গণ বিভিন্ন ভাষায় ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

a) "Bai is conveying the title through offer and acceptance when both of them are in the past form."[৫] অর্থাৎ "বাই হচ্ছে প্রস্তাব (ঈজাব) ও সম্মতি (কবুল) এর মাধ্যমে মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর/বিনিময় করা; ঈজাব ও কবুল উভয়টি অতীত কালের শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হয়।"

b) Bai is "to aquire the very ownership by payment of recompense/indemnity of the same" অর্থাৎ বাই হচ্ছে, "কোন কিছুর সমতুল্য বিনিময়/ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক এর মালিকানা গ্রহণ করা।"

c) "The terminology baai expresses the concept of exchange of goods against the other in the process of mutual consent or transfer of ownership against equivalent (value)."[৬] অর্থাৎ "বাই শব্দটি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এক পণ্যের সাথে অপর পণ্যের বিনিময়কে বুঝায় অথবা বাই হচ্ছে সমমূল্যের বিনিময়ে কোন পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা।"

d) Bai is the reciprocal exchange of counter values. "ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে সমান সমান মূল্যের পারস্পরিক বিনিময়।"

বাইয়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় ঃ উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

ক) **মালিকানা** ঃ ক্রেতা-বিক্রেতার নিজ নিজ পণ্য, অর্থ বা সেবার ওপর তাদের মালিকানা থাকা ক্রয়-বিক্রয়ের অপরিহার্য শর্ত। মালিকানা নেই এমন কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে চুক্তির শর্তানুসারে ভবিষ্যতে মাল উৎপাদন, তৈরী বা ক্রয় করে মালিকানা অর্জন করার পর অপর পক্ষকে সরবরাহ করাও বৈধ; এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিতে মালের স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করে নিতে হবে।

---

৪. আল-কুরআন ঃ ৯:১১১।

৫. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Abd al-Rahman al-Jaziri, Beirut, Lebanon, Vol-2, p. 147.

৬. Shaokani, Muhammad, *Nailul Awtar*, Idaratul Quran al Ummul Islamiat, Karachi, Pakistan, vol. 5, p. 150.

www.icsbook.info

খ) **মূল্য নির্ধারণ ঃ** আসলে ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় একটি অপরটির প্রতিমূল্য (counter-value)। চুক্তি করার পূর্বেই উভয় মূল্য নির্ধারণ করা বিধেয়। মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয় না।

গ) **উভয় মূল্য সমান সমান হওয়া (equality of value) ঃ** ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে মূল্যের সাথে প্রতিমূল্যের বিনিময়, exchange of counter-values. কাউন্টার ভ্যালু বলতে সমান সমান মূল্য বুঝায়। অর্থাৎ উভয় পক্ষের মূল্য সমান না হলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয় না।

ঘ) **ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে পারস্পরিক ক্ষতিপূরণপূর্বক বিনিময় করা ঃ** ক্রয়-বিক্রয়ে পরস্পরের ক্ষতিপূরণ করে পণ্য-সামগ্রী, সেবা বা অর্থ বিনিময় করা হয়। ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে কোন জিনিস নিলে বিক্রেতার যে ক্ষতি হয়, ক্রেতা সমমূল্যের কোন জিনিস বা অর্থ দ্বারা বিক্রেতার উক্ত ক্ষতি পূরণ করে দেয়। অনুরূপভাবে বিক্রেতাকে মূল্য প্রদান করায় ক্রেতার যে ক্ষতি হয় বিক্রেতা সমমূল্যের জিনিস দিয়ে ক্রেতার সে ক্ষতি পূরণ করে দেয়। ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বে উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পর্যায়ে ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও ঠিক সেই একই অবস্থানে থাকে; ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের ফলে কারও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

ঙ) **পারস্পরিক সম্মতি ঃ** পারস্পরিক সম্মতি ক্রয়-বিক্রয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ হচ্ছে, "তোমরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা কর।" (৪:২৯) আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই ক্রয়-বিক্রয় পারস্পরিক সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল।"[৭]

চ) **ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ইন্‌সাফপূর্ণ ঃ** ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার কেউ ঠকে না, আর কেউ জিতেও না। এতে পূর্ণ ইনসাফ ও সুবিচার বহাল থাকে, কারও প্রতি কোন প্রকার জুলুম বা বে-ইনসাফী হয় না। ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ কেউ কারও ক্ষতি না করেই পরস্পর উপকৃত হয়ে থাকে।

ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক শর্ত

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক শর্ত হচ্ছে ২টি ঃ ক) মূল্যের সমতা (equality of value), এবং খ) পারস্পরিক বিনিময় (reciprocity of exchange)। ক্রয়-বিক্রয়ে যাতে পূর্ণ ইনসাফ বহাল থাকে এবং কোন পক্ষের প্রতি কিছু মাত্র বেইনসাফী বা জুলুম না হয় সেজন্য এ দুটি মৌলিক শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না।

---

[৭] *ফাতহুল বারি*, ভলি-৪, পৃঃ ২৩০।

www.icsbook.info

ক) মূল্যের সমতা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে দু'টি পক্ষ– বিক্রেতা ও ক্রেতা। বিক্রেতার কাছে কোন পণ্য, সেবা (service) অথবা মুদ্রা থাকতে পারে। অনুরূপভাবে ক্রেতার নিকটও থাকতে পারে কোন পণ্য, সেবা বা মুদ্রা। উভয় পক্ষের পণ্য, সেবা বা মুদ্রা একই জাতের হতে পারে অথবা সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতেরও হতে পারে। পণ্য, সেবা বা মুদ্রা যাই থাকুক এবং এগুলো সমজাতের হোক বা অসমজাতের হোক, পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করতে হলে প্রথমেই উভয় পক্ষের পণ্য, সেবা বা মুদ্রার মূল্য সমান সমান করে নিতে হবে। একটি হতে হবে অপরটির কাউন্টার ভ্যালু। ইনসাফ বা সুবিচারের এটাই দাবী। কাউন্টার ভ্যালু বলতে মূল্যের সমতাকেই বুঝায়।

ড. উমর চাপরা বলেন, "Justice can be rendered only if the two scales of the balance carry the same value of goods."[৮] "সুবিচার কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন দাঁড়ির উভয় পাল্লায় একই সমান (মূল্যের) মাল-সম্পদ তোলা হয়।" তিনি বলেছেন, "The price and counter value should be just in all transactions..."[৯] "সকল লেনদেনে দাম এবং এর প্রতিমূল্য ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।"

খ) পারস্পরিক বিনিময় (reciprocal exchange) ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে দেওয়া ও নেওয়া উভয়টাই হয় পারস্পরিক (reciprocal)। বিক্রেতা জিনিস দেয়, অর্থ নেয়; আর ক্রেতা অর্থ দেয়, জিনিস নেয়। আধুনিক পরিভাষায় একেই বলা হয় reciprocal exchange; কেউ কেউ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে 'commutative contract'[১০]; অথবা 'synallagmatic contract'।

ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী equivalence ও reciprocity কে ক্রয়-বিক্রয়ে সুবিচারের যমজ মানদণ্ড (Twin norms of justice) আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "it (justice) relies on the notions of equality and reciprocity."[১১] "(মূল্যের) সমতা এবং পারস্পরিক বিনিময়ের ওপরই সুবিচার (justice) নির্ভর করে।"

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ; আর ক্রয়-বিক্রয়ে ইনসাফের মৌলিক শর্ত হচ্ছে উভয় মূল্যের সমতা ও পারস্পরিক বিনিময়। নগদ-বাকি সকল ক্রয়-বিক্রয়ে এ দুটি মৌলিক শর্ত অবশ্যই প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি মূল্য সমান সমান বা কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণ এবং তা পরস্পর বিনিময় করার বিধান নির্দেশ করেছেন।

---

৮. চাপরা, ড.এম., উমরঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।
৯. উপরোক্ত।
১০. Nyazee, Imran Ihsan Khan, *The Rules and Definition of Riba*, Info@nyajee.com, Dec. 2000, p. 5.
১১. সিদ্দিকী, এম, এনঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।

www.icsbook.info

ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

ক্রয়-বিক্রয়ে প্রথমে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণ করতে হয়; অতঃপর কাউন্টার ভ্যালু দু'টি লেনদেন বা বিনিময় করতে হয়।

ইতোপূর্বে সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুদ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমজাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে ২টি এবং অসমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে ১টি বিধান নির্দেশ করেছেন; আর বিনিময়ের জন্য উভয় প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে একই বিধান দিয়েছেন।

সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের বিধান ২টি হচ্ছে ঃ

১. মিসলান বিমিসলিন (like for like) **বা উভয় বস্তুর মানগত সমতা** (qualitative equality) বিধান **করা;**
২. সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন (equal for equal) বা উভয় বস্তুর পরিমাণ সমান (quantitative equality) **করা এবং বিনিময়ের বিধানটি হচ্ছে ঃ**
৩. **ইয়াদান বিইয়াদিন** (from hand to hand) বা পারস্পরিক বিনিময় (reciprocal exchange) করা।

আর ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের বিধানটি হচ্ছে ঃ

১. পারস্পরিক সম্মতি বা "ফাবিয়ূ কাইফা শি'তুম"– যে কোন দাম বা পারস্পরিক সম্মতিতে (mutual consent) নির্ধারিত যে কোন দামে বিক্রি করা বৈধ এবং এক্ষেত্রে বিনিময়ের বিধানটি হচ্ছে ঃ
২. ইয়াদান বিইয়াদিন (from hand to hand) বা পারস্পরিক বিনিময় করা।
   নিচে ব্যাখ্যা পেশ করা হলো ঃ

সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়

কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের বিধান

১. মিসলান বিমিসলিন (like for like **মানগত সমতা বা** qualitative equality) ঃ ফক্বীহগণ সাধারণভাবে মিস্‌লান বিমিস্‌লিন বা মানগত সমতাকে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক বিধান হিসেবে গণ্য করেননি। কখনও তাঁরা মিসল (মান) ও জিনিস (জাত)-কে এক মনে করেছেন; আবার কখনও মিসল ও মুসাওয়াতকে (পরিমাণগত সমতা) একই অর্থে গ্রহণ করেছেন।

কতিপয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানগত তারতম্যের কারণে সমজাতের দু'টি বস্তু পরিমাণে কম-বেশি করে বিনিময় করা হলে একদিকের বাড়তি পরিমাণকে রিবা বলেছেন। তিনি এভাবে বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন এবং নিম্ন মানের বস্তুটি অর্থ বা ভিন্নতর কোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা একই জাতের উন্নত মানের

www.icsbook.info

বস্তু ক্রয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সুন্নাহর দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ শিরোনামে হাদীস নং ১৩-১৭ এবং ৭৫-৭৮ ।)

এসব হাদীস থেকে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সমজাতের দুটি বস্তুর মধ্যে গুণ ও মানগত পার্থক্য থাকলে তা বিবেচনায় এনে এদের পরিমাণে কম-বেশি করা যাবে না; বরং সর্বাবস্থাতেই পরিমাপ (volume), ওজন (weight) বা গণনার ভিত্তিতে উভয় বস্তুর পরিমাণ সমান সমান করে বিনিময় করতে হবে। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফক্বীহ্ ইমাম সারাখ্সী লিখেছেন, "মিস্লান বিমিস্লিন অর্থ হচ্ছে পরিমাণগত সমতা বিধান করা, গুণগত নয়, যদিও সমতা শব্দ দ্বারা উভয় প্রকার সমতাকেই বুঝায় ।"[১২] "gold dust and gold metal are the same"– উবাদা ইবনে সামিতের এই উক্তি তুলে ধরে তিনি বলেছেন, "এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, সমতা অর্থ হচ্ছে পরিমাণের সমতা, মানের সমতা নয়। কারণ স্বর্ণচূর্ণের মান আর স্বর্ণপিণ্ডের মান সমান নয়। অথচ ওজনে (পরিমাণে) সমান হলেই উভয়টি সমান (equal) হয়ে যায় ।"[১৩]

আল-মিসরি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, "দুটি খেজুর যদি মানের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয় তবু উপযুক্ত মানদণ্ডের (standard) ভিত্তিতে এদের পরিমাণ সমান সমান হতে হবে। এভাবে উন্নত মানের (superior) পণ্যের অধিকারী নিম্নমানের (inferior) পণ্যের মালিকের প্রতি উদার (মুহসিন, generous) হবে। অন্যথায় তারা তৃতীয় কোন পণ্যের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিনিময় করবে ।"[১৪]

ইমাম শাফিঈ, আল্লামা মওদূদী ও বিচারপতি তকি উসমানিসহ অনেকেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি, পাকিস্তানের ইসলামিক ইডিওলোজি কাউন্সিলের রিপোর্ট এবং ১৯৮৭ সালে Indexation-এর ওপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকেও এই একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতার সাথে এ ব্যাখ্যার সঙ্গতি নেই। বাস্তবে দেখা যায়, একই জাতের পণ্য হওয়া সত্ত্বেও গুণগত তারতম্যের দরুন দুটি বস্তুর উপযোগে ব্যাপক পার্থক্য সূচিত হয় এবং এদের দামে সৃষ্টি হয় বিরাট ব্যবধান। অথচ কেবল একই জাতি বা প্রজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে এদের পরিমাণ সমান সমান করে বিনিময় করতে হবে, সাধারণ বুদ্ধিও এতে সায় দেয় না। তাই আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন।

এস. এ. তাহের এ প্রসঙ্গে বলেছেন, উক্ত হাদীসে সোনার পরিবর্তে সোনা বলার পর 'মিস্লান বিমিস্লিন' বলা হয়েছে। সোনার বদলে সোনা কথার দ্বারা পণ্যের জাতিগত মিলের কথাই তো বলা হয়েছে। সুতরাং মিস্লান বিমিস্লিন-এর অনুবাদ জাতিগত

---

১২. সারাখসীঃ *Al-Mabsut*: ইংরেজী অনুবাদ, ইমরান, আহসান খান নিয়াজী, info@nyazee, 2000, p. 15.

১৩. উপরোক্ত, পৃঃ ৫ ।

১৪. রফিক ইউনিস আল-মিসরি, *রিবা আল কুরুদ ওয়া আদিল্লাতু তাহরিমিহি*, ১৯৮৭, পৃঃ ৮, উদ্ধৃত, নুর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১ ।

www.icsbook.info

সমতা হতে পারে না।[১৫] এলমি মাহমুদ নূরও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "জাতিগত মিল অপেক্ষা অধিক ও ভিন্নতর অর্থ বুঝানোর জন্যই মিস্লান বিমিস্লিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।"[১৬] অপরদিকে মিস্লান বিমিস্লিনকে পরিমাণগত সমতার সাথে একই অর্থে গ্রহণ করাও সঙ্গত নয়। কারণ ভাষাগত দিক থেকে আল-মিসল জিনিসের গুণ-মানকে বুঝায়; কিন্তু তাসাভী (সাওয়ায়ান থেকে উদ্ভূত) কেবল পরিমাণগত সমতা বুঝায়। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মান ও পরিমাণ এক ও অভিন্ন বিষয় নয়। অর্থাৎ দুটি জিনিস সদৃশ, একথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, জিনিস দু'টি পরিমাণে সমান সমান।

এলমি নূর এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আল-মুহিদুল মুহিদ ও An Advanced Learners Arabic Dictionary-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, সেখানে 'মিসল' অর্থ লিখা হয়েছে সাদৃশ্য, সদৃশ, অনুরূপ, ঐক্য (correspondence) ও সমতা (equivalence)। মিসল থেকে উদ্ভূত আল-মুমাসাল (similarity) ও সাওয়ায়ান থেকে উদ্ভূত আল-মুসাওয়াত (equivalence) শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থের তুলনা করে তিনি বলেছেন যে, মিসল শব্দ পণ্যের গুণগত দিক প্রদর্শন করে; কিন্তু তাসাভী শব্দ জিনিসের পরিমাণগত দিক নির্দেশ করে। আল-মুজমা-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, দুটি পণ্যের অভিন্নতা বুঝানো ব্যতীত অন্য কোন অর্থে আল-মুমাসালা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু আল-মুসাওয়াত অভিন্ন জিনিস এবং জাত বা সৃষ্টিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস এ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়; কারণ 'তাসাভী' কেবল পরিমাণগত সমতা বুঝায়, যার অর্থ পরিমাণে বেশিও নয়, কমও নয়। তিনি বলেন, ইবনে মনসুরও লিসান আল আরব-এ লিখেছেন যে, আল-মুমাসাল ও আল-মুসাওয়াত এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আল-মুসাওয়াত সদৃশ ও বিসদৃশ উভয় পণ্যের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, কারণ 'আল-তাসাভী' হচ্ছে কেবল গণনা বা পরিসংখ্যানগত সমতা যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ দুটো জিনিস পরিমাণে সমান, কোনটি বেশি নয়, আবার কোনটি কমও নয়। কিন্তু মুমাসালা শব্দটি কেবল সদৃশ অথবা সমতুল্য জিনিসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এর দ্বারা রং, স্বাদ, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য বুঝায়। ইবনে বারিও একই অভিমত দিয়েছেন যে, মিসল শব্দটি গুণকে বুঝায়, যেমন, উপযুক্ততা (fitness), যথার্থতা (suitability) ও অবস্থান (status) অথবা অবস্থা।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত মিসল শব্দের অর্থ তুলে ধরে জনাব নূর লিখেছেন, আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন, "তাঁর মত (কামিসলিহি) কিছুই নাই" (৪২:১১)। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন; "তোমরা যেমন ঈমান এনেছ তারাও যদি ঠিক সেইরূপ (বিমিসলি) ঈমান আনে, তবে তারা সঠিক পথ পেল।" (২:১৩৭) এসব আয়াতে মিসল শব্দ দ্বারা গুণগত সমতাকেই বুঝানো হয়েছে।

---

১৫. সায়্যিদ তাহের, *রিবা আল ফদল ঃ হিকমাতে কুরআন*, পৃঃ ৮, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬।

১৬. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।

www.icsbook.info

জনাব নূর লিখেছেন, রিবা ফদলের ক্ষেত্রে সমজাতের বস্তুর গুণগত সমতা বিধান করার বিষয়কে বিবেচনার বাইরে রাখলেও সম্মানিত ফক্বীহগণ সাধারণভাবে মিসল সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, দু'টি জিনিস সদৃশ (মিসলিয়্যাত) হতে হলে দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবেঃ প্রথমত, জিনস বা (genus) বা জাতিগতভাবে এদেরকে সমশ্রেণী বা দলভুক্ত হতে হবে; দ্বিতীয়ত, এদের মূল্য তথা বাজার দাম হতে হবে সর্বতোভাবে (absolutely) সমান।

জনাব নূর বলেছেন, প্রথম শর্তটি হাদীস থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। হাদীসে সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার পরিবর্তে রূপা ইত্যাদি বলে জেনাস বা জাতগত মিলের কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে জনাব নূর বলেছেন যে, মিসল এমন জিনিসকে বুঝায় যার অংশসমূহের দাম পরস্পর সমান। জনাব নূর বলেছেন, ইমাম তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম, ইমাম গাজালী ও আবূ ইউসুফ প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে, "দামের পার্থক্য পণ্যের সাদৃশ্য দূরীভূত করে দেয়।" ইবনে তাইমিয়া অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, দু'টি পণ্য কেবল তখনি সদৃশ হবে যখন তাদের দাম সমান হয়; কিন্তু এদের বিনিময় মূল্যে পার্থক্য থাকলে এরা সমতুল্য (মিসল) হয় না।" আলী আল খফিফ এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "দু'টি বস্তু পূর্ণ সদৃশ (absolutely alike) হতে হলে এদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ (যা শ্রেণী বা জাত নিরূপণ করে) সর্বতোভাবে এক রূপ হতে হবে এবং এদের বাজার মূল্য হতে হবে সমান সমান।" সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সমজাতের দু'টি পণ্যের দাম সমান সমান করার লক্ষ্যেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মিস্‌লান বিমিস্‌লিন-এর বিধান নির্দেশ করেছেন।

জনাব নূর লিখেছেন যে, ফক্বীহগণ সমজাতের দুটি বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণ ও মানগত পার্থক্য বিবেচনায় আনতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে এসে তাঁরা 'মিসলিয়্যাত' তথা পণ্যের গুণ ও মানগত সমতাকে ঋণের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সদৃশ পণ্য ব্যতীত ঋণ প্রদান করা বৈধ নয় বলে রায় দিয়েছেন।[১৭] কারণ ঋণ হচ্ছে, কোন ফাঞ্জিবল পণ্য সমজাতের পণ্যের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা।

তাহলে আসল কথা এই দাঁড়ালো যে, এক জাতের পণ্য বাকিতে বিনিময় করা হলে পণ্যের মান সমান সমান হতে হবে; কিন্তু এই বিনিময়ই যদি উপস্থিত নগদ নগদ করা হয়,তাহলে উভয় পণ্যের মানগত পার্থক্য আমলে নেয়া যাবে না। এরূপ অভিমত পরস্পরবিরোধী, অযৌক্তিক ও বাস্তবতা পরিপন্থী। সুতরাং ঋণের ক্ষেত্রে যেমন নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি মিসলিয়্যাতকে একটি স্বতন্ত্র ও অপরিহার্য শর্ত গণ্য করা জরুরী।

---

১৭. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭-১১৮।

www.icsbook.info

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জাতগত মিল তথা সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার বদলে রূপা বলার পর 'মিস্‌লান বিমিস্‌লিন' শর্তের উল্লেখ করে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, বিনিময়ের পণ্য, অর্থ বা সেবা একজাতের হলে এদের গুণ ও মানগত সমতাও থাকতে হবে যাতে এদের দাম বা বিনিময় মূল্য সমান সমান করা যায়। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আইনান বিআইনিন' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, "এটা যেমন, সেটা তেমন"। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'মিস্‌লান বিমিস্‌লিন' দ্বারা মানগত সমতার কথাই বলা হয়েছে।

এতদ্‌সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো একটু গভীরভাবে দেখলেই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোথাও এ কথা বলেননি যে, "এক জাতের পণ্যের গুণ-মানগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করতে হবে।"[১৮] বরং রাসূলের (সা) বাণীর আসল বার্তা (message) হচ্ছে, একজাতের দুটি পণ্যের গুণগত তারতম্যকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং মানগত তারতম্যের কারণে উভয় পণ্যের দামে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় তার সমন্বয় অবশ্যই করতে হবে।"[১৯] তবে তা সরাসরি বিনিময়ের দ্বারা সম্ভব নয় বিধায় তিনি এ ধরনের বস্তুর সরাসরি বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন এবং ভিন্নতর পন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণীতে এ কথা স্পষ্ট যে, একজাতের পণ্য, অর্থ বা সেবার পরস্পর বিনিময় রেশিও হচ্ছে ১:১। অর্থাৎ উভয়ের পরিমাণ সমান সমান করা- এক্ষেত্রে এটাই বিধান। কিন্তু গুণ-মানগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় পণ্যের পরিমাণ সমান সমান করলে এদের পারস্পরিক মূল্য সমান হয় না। এ জন্যই তিনি এদের পরিমাণ সমান সমান করে সরাসরি বিনিময় করার নির্দেশ দেন নাই।

অপরদিকে মানের পার্থক্যের দরুন ভাল'র কত পরিমাণের বিনিময়ে মন্দের কত পরিমাণ দিলে বা কোন রেশিওতে বিনিময় করলে এদের প্রকৃত দাম পরস্পর সমান সমান হবে, সরাসরি বিনিময়ে তা নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। ভালর বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী আছে; অনুরূপভাবে মন্দেরও বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী আছে। সুতরাং কোন স্তরের ভালর সাথে কোন স্তরের মন্দের পরিমাণ কত হলে তাদের পারস্পরিক মূল্য সমান হবে তা নিরূপণ করার কোন মানদণ্ড এক্ষেত্রে নেই। ফলে উভয় পণ্যের বিনিময়ের হার নির্ধারণ করতে হবে অনুমানের ভিত্তিতে এবং এতে রিবা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। উপরে উল্লিখিত আবূ নাদরা বর্ণিত হাদীসের (ক্রমিক-৭৮) শেষে সহীহ্ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) নিজে এই কথাটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ জাহেলী যুগে আরব দেশে স্বর্ণ মুদ্রা হিসেবে দীনার এবং রৌপ্য মুদ্রা হিসেবে দিরহাম প্রচলিত ছিল। ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন, "(আরবরা) দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রয় করত। দিরহামের গুণগত পার্থক্য, এদের মুদ্রাংকন বৈশিষ্ট্য অথবা

---

১৮. নূর, ই, এমঃ উপরোক্ত, পৃঃ ১০৩।
১৯. উপরোক্ত।

www.icsbook.info

ওজনের তারতম্য ইত্যাদি কারণেই তারা এরূপ কম-বেশি করে বিনিময় করত। আর এটিই হচ্ছে প্রকৃত রিবা।"[২০] ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেছেন, "তৎকালে (আরব এলাকায়) প্রচলিত স্বর্ণ ও রূপার তৈরী মুদ্রার প্রামাণিক কোন আকার আয়তন ছিল না। নানা ভেজাল মেশানোর দরুন একই জাতের মুদ্রার মধ্যে গুণগত মানে ছিল বেশ পার্থক্য; এছাড়া একই নামে প্রচলিত মুদ্রার ওজনেও ছিল কম-বেশি। ফলে যে কোন লোক অতি সহজেই অন্যকে প্রতারিত করে গুণগত মানের তারতম্যের অজুহাতে সোনার সাথে সোনা (পিণ্ড বা মুদ্রা) এবং রূপার সাথে রূপা (পিণ্ড বা মুদ্রা) কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ বিনিময় করে নিতে পারত।"[২১] এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ মওদূদী লিখেছেন, "সে যুগে দিরহামের সাথে দিরহাম এবং দীনারের সাথে দীনারের বিনিময় করার প্রয়োজন কোন কোন সময় দেখা দিত। এ জাতীয় প্রয়োজনের সময় ইয়াহুদী মহাজন ও অন্যান্য অবৈধ মুনাফা অর্জনকারীরা দু'হাতে অবৈধভাবে মুনাফা লুটতো, অনেকটা আজকের যুগে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সময় বাট্টা গ্রহণ অথবা নিজ দেশে টাকার রোজগারী চাওয়া বা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট ভাঙ্গানোর সময় কিছু পয়সা উসূল করার মতো।"[২২]

এ প্রসঙ্গে ড. চাপরা বলেছেন, "একজাতের নিম্ন ও উন্নত মানের পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় চালু থাকলে সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বল্প বুদ্ধির লোকেরা চালাক লোকদের প্রতারণা ও ঠকবাজির শিকার হতে পারে। এরূপ বিনিময়ে নিঃসন্দেহে মানুষকে ধোকা দেওয়া ও এভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা রয়েছে।"[২৩] এলমি মাহমুদ নূরও এই একই কথা বলেছেন নিম্ন ভাষায় ঃ

"It is hardly to find some one accepting inequality in quantity if the two items are the same in quality, but there is every possibility that an undue quantitative discrepancy may be acquired by either party through quality difference knowingly or unknowingly and with the satisfaction of the both parties."[২৪] "সমজাতের দু'টি পণ্যের মান এক রকম হওয়া সত্ত্বেও এদের পরিমাণ অসমান করে গ্রহণ করতে রাজি হবে এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন; কিন্তু পণ্য দু'টির মানে তারতম্য থাকলে ক্রেতা-বিক্রেতার যে কোন এক পক্ষ এর সুযোগ গ্রহণ করবে এবং জেনে-বুঝে বা অজ্ঞাতসারে এমনকি, উভয় পক্ষের সম্মতিতেই পণ্য দু'টির পরিমাণ কম-বেশি করার মাধ্যমে অপরপক্ষকে ঠকিয়ে বেশি পরিমাণ নিয়ে যাবে এরূপ আশংকা খুবই প্রবল।" ই, এম, নূর আবার লিখেছেন,

---

২০. উপরোক্ত, পৃঃ ১০৯।
২১. সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯।
২২. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২।
২৩. চাপরা, এম, উমর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।
২৪. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪।

www.icsbook.info

"In other words, the price of an article in respect of itself is equivalent to itself only nothing else. In case the counterparts have different characteristics, presumably due to the existence of visible quality disparity, neither consideration will directly indicate the exact price of the other... hence the notion of price whether absolute or relative terms, is irrelevant to these counterparts in exchange of reciprocal identity."[২৫] "অন্যকথায়, সমজাতের জিনিসের অংকে কোন জিনিসের দাম কেবল সেই জিনিসের সমান হয়, এছাড়া অন্য কোন পরিমাণ দ্বারাই হয় না। আর দৃশ্যমান মানগত অসমতার দরুন অপরপক্ষের জিনিসটি যদি ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তাহলে এর কোন পরিমাণই সরাসরিভাবে অপর জিনিসটির প্রকৃত দাম নির্দেশ করবে না।... সুতরাং সমজাতের ভিন্ন ভিন্ন মানের দু'টি বস্তু সরাসরি ক্রয়-বিক্রয়ে দামের ধারণা, নিরংকুশ (absolute) অর্থে হোক আর আপেক্ষিক অর্থে (relative), সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"

মূল্য তত্ত্বের মৌলিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করে তিনি আবার লিখেছেন- "Objects express their exchange values reciprocally against each other. However, in the case of a particular object against itself, the situation is totally different,.... the objects are silent to express their own exchange values. For the price of an article in respect to itself would be equivalent to itself only, no more no less. For instance in case the counterparts are of the same kind with different characteristics no either consideration will directly indicate the exact price of the other. Therefore, the theory of value necessitates that another item be introduced in assessing the exchange price of the object and accurately measuring the economic relations of the considerations."[২৫ক] 'দুটি বস্তু পরস্পর একটি অপরটির অংকে তাদের বিনিময় মূল্য ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু বিনিময়ের বস্তু দুটি যদি একই জাতের হয় তাহলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর রূপ নেয়,.... বস্তু দুটি নিজ নিজ মূল্য প্রকাশে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। কারণ একই জাতের বস্তুর বিনিময়ে কোন বস্তুর বিনিময় মূল্য কেবল সেই বস্তুটির সমান হয়, তার চেয়ে বেশিও হয়না কমও হয় না। আর অপর বস্তুটি যদি একই জাতের কিন্তু ভিন্নতর মানের হয় তাহলে এর কোন পরিমাণই সরাসরিভাবে বস্তুটির সঠিক বিনিময় মূল্য নির্দেশ করবে না। সুতরাং মূল্য তত্ত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, বস্তুটির বিনিময় মূল্য নিরূপণ এবং উভয় মূল্যের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের যথাযথ পরিমাণ করতে হলে তৃতীয় আর একটি বস্তু দ্বারা করতে হবে।"

---

২৫. নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃ. ১৬৭।
[২৫.ক] নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃ. ২০৮।

www.icsbook.info

এসব কারণে নবী করীম (সাঃ) নিম্ন মানের কোন পণ্যের বেশি পরিমাণের সাথে একই জাতের উন্নত মানের পণ্যের কম পরিমাণের বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন। একই সাথে এরূপ বিনিময়ে কিভাবে উভয় পণ্যের মূল্য সমান সমান করতে হবে তার পন্থাও তিনি নির্দেশ করেছেন। অর্থ বা ভিন্ন কোন পণ্যের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা ভিন্নতর পণ্যের দ্বারা পছন্দমত খেজুর কিনে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এভাবেই পরিমাপ (মীযান) পূর্ণ হবে।"[২৫খ] এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যথার্থ পরিমাণ খেজুর লেনদেন হওয়ার কথাই বুঝিয়েছেন।

বস্তুতঃ এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তৃতীয় কোন পণ্য বা অর্থকে বিনিময়ের পণ্য, অর্থ বা সেবার মান ও দাম পরিমাপ করার মানদণ্ড বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এভাবে এক্ষেত্রে যাবতীয় অন্যায্য (unfair) বিনিময়ের আশংকা দূর করে দিয়েছেন।

এলমি নূর এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "If the two goods are homogeneous, they have observable quality difference, the only way to assess this difference is through their market prices. The prevailing price in the market in its normal condition can be the measuring rod of the qualitative discrepancy between any two commodities of similar kind"[২৬]. "সমজাতের দু'টি পণ্যের মধ্যে মানগত তারতম্য নিরূপণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এদের বাজার দাম; স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারে বর্তমান দামই সমজাতীয় দু'টি পণ্যের মানগত পার্থক্য পরিমাপ করার মানদণ্ড হতে পারে।"

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তৃতীয় কোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় এবং বাঞ্ছিত পণ্য ক্রয় করার জন্য বাজারে যাওয়া-আসা ইত্যাদি বাড়তি ঝামেলা এবং অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে নূর লিখেছেন যে, এ ধরনের বাড়তি কাজ ও শ্রমের কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য মানুষের ওপর থেকে বোঝা লাঘব করা, বোঝা বৃদ্ধি করা নয়। ইসলাম মানুষের জন্য কাজকে সহজ করেছে, কঠিন করেনি। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে বাজারে যাওয়া-আসার ব্যয় বহন করারও কোন দরকার হবে না যদি পণ্যের বাজার দর জানা থাকে। তাঁর মতে বাজারে প্রচলিত দর জানা থাকলে তার ভিত্তিতে পণ্যের বিনিময় হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।[২৭]

কিন্তু ওপরে উল্লেখিত আবূ নাদরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে (ক্রমিক নং ৭৮) খেজুরের মান অনুসারে বাজার দামের উল্লেখ করে এই বাজার দরের ভিত্তিতেই মন্দ ও ভাল খেজুরের বিনিময় রেশিও নির্ধারণ করা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি তো সুদী কারবার করেছ।" সুতরাং বাজার দর জানা

২৫.খ. পূর্বোল্লেখিত হাদীস নং ১৫।

২৬. নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃঃ ২০৩।

২৭. উপরোক্ত, পৃঃ ১১৪।

www.icsbook.info

থাকলে সে অনুসারে খারাপ-ভালোর বিনিময় হার নির্ধারণ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মিস্‌লান বিমিস্‌লিন/আইনান বিআইনিন-এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে গুণ ও মানগত সমতা বিধান করা এবং সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২. সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন (পরিমাণগত সমতা) ঃ সমজাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন; এর অর্থ হচ্ছে পরিমাণগত সমতা। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের পণ্যের জাত ও মান এক রকম (identical or homogeneous) হওয়ার পর এদের পারস্পরিক মূল্য সমান হওয়া সম্ভব কেবল এদের পরিমাণের সমতা দ্বারা। এজন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) উভয় পণ্যের মান এক রকম করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এদের পরিমাণ সমান সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরিমাণে কম-বেশি করলে রিবা হবে বলে সতর্ক করেছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে যে, সমজাত ও সমমানের পণ্য, অর্থ বা সেবার উপযোগ সমান; এর চাহিদা ও যোগানও সমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১০০ টাকার উপযোগ ১০০ টাকার সমান; ১০০ টাকা থেকে ১০০ টাকার বেশি উপযোগ পাওয়া যায় না, তেমনি ১০০ টাকার উপযোগ ৯৯ টাকার সমানও হয় না। সুতরাং টাকায় ১০০ টাকার মূল্য ১০০ টাকাই, কমও নয়, বেশিও নয়। এই দাম সময়ের গতির সাথে হ্রাস-বৃদ্ধিও হয় না। অর্থাৎ টাকায় ১০০ টাকার দাম আজ ১০০ টাকা; আগামী কালও এর দাম ১০০ টাকা, এমনকি ১ বছর বা ৫ বছর পরও টাকায় ১০০ টাকার দাম ১০০ টাকাই। অনুরূপভাবে লেংড়া জাতের ১ কেজি আমের উপযোগ ১ কেজি সমমানের আমের সমান। সুতরাং আমে ১ কেজি লেংড়া আমের দাম একই মানের ১ কেজি আম। এই দাম আজকে যেমন ১ কেজি, কালও ১ কেজি এবং ভবিষ্যতের যে কোন সময়ে এর দাম ১ কেজি আম। এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ লিখেছেন, "As for (fungible) goods measured by volume or weight, they are relatively homogeneous, and thus have similar benefits (utilities). Justice in this case is achieved by equating volume or weight since the benefits (utilities) are very similar."[২৮] "আর পরিমাণ (volume) ও ওজন দ্বারা পরিমাপযোগ্য ফান্‌জিবল পণ্যের বেলায় বলা যায় যে, তুলনামূলকভাবে এসব পণ্য-সামগ্রী প্রায় সদৃশ হয় এবং এগুলোর উপকারিতাও (উপযোগ) হয় সমান সমান। ...এসব ক্ষেত্রে সুবিচার অর্জিত হয় এদের পরিমাণ ও ওজন সমান সমান করার মাধ্যমে, কারণ এদের উপকারিতা (উপযোগ) সমান সমান।"

---

[২৮] ইবনে রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্‌তাসিদ*, বৈরুত, দার আল-মারিফাত, ভলি-৩, পৃঃ ১৮৩-১৮৪।

www.icsbook.info

মোট কথা, সমজাতের পণ্য, অর্থ বা সেবার দাম এদের মান ও পরিমাণগত সমতার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এটাই বিধান। এই বিধান প্রাকৃতিক (natural), চিরন্তন ও শাশ্বত। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্মতির মাধ্যমে পণ্য, অর্থ বা সেবার পরিমাণে কম-বেশি করলে তাদের পারস্পরিক মূল্য আর কোনভাবেই সমান হওয়া সম্ভব নয়। তাই দাম নির্ধারণে পারস্পরিক সম্মতি তথা দর কষাকষি করে দাম নির্ধারণের বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এখানে ক্রেতা বা বিক্রেতা কারোই সে অধিকার নেই। ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী এই কথাই বলেছেন, "it (perception) cannot be acceptable between the same things, i.e., in exchange of money for money. It has to be measurable equality as there is no room for perception."[২৯] "সমজাতীয় বস্তু বিনিময়ের বেলায় এটা (প্রত্যক্ষণ) গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন কোন মুদ্রার বিনিময়ে একই জাতের মুদ্রা। এক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য সমতা থাকতে হবে, কারণ প্রত্যক্ষণের সুযোগ এক্ষেত্রে নেই।" তিনি তাই বলেছেন, "সমজাতের পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইসলাম পণ্যের পরিমাণ সমান সমান করার শর্ত আরোপ করেছে।"[৩০]

জনাব নূর একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছেন। তার ব্যাখ্যাটি সংক্ষেপে পেশ করা হলো[৩১] ঃ

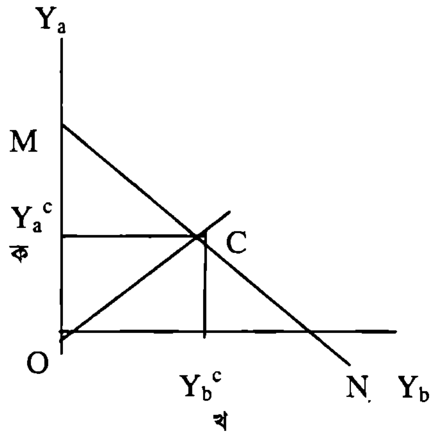

চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ক ও খ দুই ব্যক্তির কাছে একই জাত ও মানের একটি মাত্র পণ্য আছে যার নাম হচ্ছে Y। OM রেখাতে Y এর পরিমাণ দেখানো হয়েছে। ON

২৯. সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪।
৩০ উপরোক্ত, পৃঃ ৩৩।
৩১. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬-১৭০।

www.icsbook.info

রেখাতেও Y এর পরিমাণ দেখানো হয়েছে। আর MN রেখায় একই পণ্য Y-এর সাথে Y বিনিময়ের বিভিন্ন অনুপাত দেখানো হয়েছে। ক যদি OM পরিমাণ Y নেয় তাহলে খ এর জন্য আর Y থাকে না, সে কিছুই পায় না। অপরদিকে খ যদি ON পর্যন্ত Y নেয় তাহলে ক কিছুই পায় না। ৪৫° OC রেখা MN রেখাকে C বিন্দুতে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। C বিন্দুতে ক পায় OY_a^c পর্যন্ত Y এবং খ পায় OY_b^c পর্যন্ত Y; এখানে উভয়ে Y এর সমান সমান অংশ পায়। বিনিময়ের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১ঃ১। অতঃপর ক-এর অংশ বৃদ্ধি করলে খ-এর অংশ অবশ্যই কমে যাবে; আর খ- এর অংশ বৃদ্ধি করলে ক কম পাবে। অর্থাৎ C বিন্দু থেকে বিনিময়ের হার পরিবর্তন করা হলে উভয় পক্ষের মূল্য আর কোন ভাবেই সমান হবে না; বরং সেক্ষেত্রে এক জনের ক্ষতির বিনিময়ে অপরজন লাভবান হবে। ফলে কোন না কোন পক্ষ অবশ্যই অবিচার ও জুলুমের শিকার হবে। তাই এক্ষেত্রে সুবিচারের প্রাকৃতিক (natural) বিধান হচ্ছে, পরিমাণ সমান সমান হওয়া। দুনিয়ার সর্বত্রই এ বিধান প্রচলিত ছিল, আছে এবং থাকবে। ইসলাম এই বিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ড. উমর চাপরা নবী করীম (সাঃ) এর সেই বিখ্যাত হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাঃ) ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের নাম উল্লেখ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, "পাল্লার একদিকে যদি এর একটি পণ্য থাকে, পাল্লার অপরদিকেও একই জাতের সমপরিমাণ পণ্য থাকতে হবে। (like for like and equal for equal মানে এক রকম এবং পরিমাণে সমান সমান)।"[৩২]

বিচারপতি তকি উসমানী তাঁর ঐতিহাসিক রায়ে বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "অর্থের (মুদ্রার) সাথে একই জাতের অর্থের (মুদ্রার) বিনিময় করতে হলে উভয়ের মূল্য সমান হতে হবে। পাকিস্তানী ১০০০/- রূপীজ এর একটি নোটের সাথে একই দেশের অন্য নোটের বিনিময় করতে হলে অন্য নোটগুলোর মূল্য অবশ্যই ১০০০/- রূপীজের সমান হতে হবে। এখানে রূপীজের অংকে প্রথম ১০০০/- রূপীজের নোটটির দাম যেমন বৃদ্ধি করা যাবে না, তেমনি এর দাম হ্রাস করাও যাবে না।

...একই জাতের মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মূল্য সমান হওয়ার এই বিধি নগদ তাৎক্ষণিক বিনিময় ক্ষেত্রে (spot exchange) যেমন প্রযোজ্য, তেমনি বাকি বিনিময় বা ঋণের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।[৩৩]

প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়, নগদ হোক বা বাকি, উভয় বস্তুর মান এক রকম করার পর এদের পরিমাণ অবশ্যই সমান সমান করতে হবে।

---

৩২. চাপরা, এম, উমর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।

৩৩. উসমানী, মুহাম্মদ তকি, বিচারপতি মাওলানাঃ *The Historic Judgement on Interest,* Idaratul Maarif, করাচী, পাকিস্তান, ২০০০, পৃঃ ১৪০।

www.icsbook.info

বিনিময়ের বিধান

১. ইয়াদান বিইয়াদিন (হাত থেকে হাতে/ Reciprocal Exchange)ঃ উবাদা ইবনে **সামিত বর্ণিত উক্ত হাদীসে** সমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের তৃতীয় বিধান হচ্ছে ইয়াদান বিইয়াদিন (হাতের বিনিময়ে হাত)। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়েও দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে এই একই বিধান– ইয়াদান বিইয়াদিনের কথা বলা হয়েছে। ইয়াদান বিইয়াদিনের তাৎপর্য বুঝানোর লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অন্যান্য হাদীসে আরও কতিপয় পরিভাষা ব্যবহার করেছেন বলে বলা হয়। যেমন, "উপস্থিত পণ্যের সাথে উপস্থিত পণ্য", "এখানে তুমি, এখানে তুমি", "যা উপস্থিত আছে তাকে যা উপস্থিত নেই তার সাথে বিনিময় করো না," "যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করো না," "যা হাতে হাতে (ইয়াদান বিইয়াদিন) তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যা নাসীয়াহ্ তা রিবা," "তোমরা সোনা-রূপা দাইনান বিক্রি করো না," "রিবা হয় কেবল নাসীয়াতে" "নাসীয়াহ্ ব্যতীত রিবা হয় না" ইত্যাদি।

হাদীসের এসব বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে অধিকাংশ ফিক্বাহবিদ ও গবেষক ইয়াদান বিইয়াদিনের অর্থ করেছেন তাৎক্ষণিক নগদ পারস্পরিক বিনিময়, উপস্থিত পারস্পরিক হস্তান্তর ও দখল।

লক্ষণীয় যে, ইয়াদান বিইয়াদিনের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ ফক্বীহ পারস্পরিক হস্তান্তরের সাথে নগদের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। ফলে ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রটি বিতর্কিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে রিবা আল-নাসা, রিবা আল-ইয়াদ বা প্রচ্ছন্ন রিবা নামে অভিনব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ইয়াদান বিইয়াদিনের উক্তরূপ অর্থের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফেক্বাবিদ বলেছেন, সমজাতের হোক বা অসম জাতের হোক, দুটি পণ্য বা অর্থ বাকি ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এই বিধান লংঘন করে বাকিতে বিক্রি করা হলে বাকির মেয়াদ/সময় হবে রিবা নাসা যা হারাম। কোন কোন ফেক্বাহয় বলা হয়েছে, কোন পক্ষ তার ক্রীত মালের দখল নিতে বিলম্ব করলে বিলম্বিত সময়/মেয়াদ হবে রিবা আল-ইয়াদ। তবে সকল ফক্বীহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণ ও দেনার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। ঋণ হচ্ছে সাদাকাহ, তাই ঋণ বৈধ। আর তাঁদের মতে, বাই-মোয়াজ্জল (বাকি ক্রয়-বিক্রয়), বাই-সালাম (অগ্রিম বিক্রয়), বাই-ইসতিসনা (আদেশ ক্রয়) ও ইজারাহকে বিশেষ বিবেচনায় অনুমোদন করা হয়েছে। ফক্বীহদের মতে মেয়াদ/সময় হচ্ছে ঋণ ও দেনার অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং এই মেয়াদ রিবা নয়; বরং এই মেয়াদ বৈধ। কোন কোন গবেষক আবার সকল ঋণকে বৈধ বলতে রাজী নন। তাঁদের মতে, সাধারণ ঋণ/কর্দ নিষিদ্ধ এবং কেবল কর্দে হাসানাহ বৈধ। সাধারণ ঋণের ক্ষেত্রে আসলের ওপর ধার্যকৃত বৃদ্ধিকে তাঁরা রিবা ফদল আখ্যায়িত করেছেন আর ঋণ পরিশোধের মেয়াদকে বলেছেন রিবা নাসা বা রিবা

www.icsbook.info

নাসীয়াহ্। এতে একটি অপরটির counter value[৩৪]; রিবা ফদল হচ্ছে নাসার potential benefit-এর মূল্য।[৩৫] কোন কোন মাযহাবে সকল পণ্য ও মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ না বলে শুধু হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি পণ্যসহ ওজন, পরিমাপ ও গণনার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এমন পণ্য ও অর্থকে রিবা বহনকারী পণ্য (Ribawi Materials) আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং কেবল এই সব পণ্য ও অর্থের বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ বলে রায় দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ফক্বীহ আবার ছয়টি পণ্যের মধ্য থেকে সোনাকে বাদ দিয়েছেন এবং সোনা দ্বারা ঋণ লেনদেন করা বৈধ বলে মত দিয়েছেন। বিশিষ্ট কয়েকজন ফক্বীহ আবার মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ বলেছেন। রিবা নাসা হারাম হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রিবা নাসা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন (concealed, hidden) রিবা; আর ঋণ বা দেনার ওপর বর্ধিত অংশ হচ্ছে প্রকাশ্য (overt, menifest) রিবা। প্রকৃত নিষিদ্ধ রিবা হচ্ছে প্রকাশ্য রিবা; আর প্রকাশ্য রিবার দ্বার রুদ্ধ করার জন্যই প্রচ্ছন্ন রিবাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইয়াদান বিইয়াদিন-এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম সারাখ্‌সী অবশ্য ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ইয়াদান বিইয়াদিন-এর অর্থ হচ্ছে "এখন নির্ধারিত পণ্যের সাথে এখন নির্ধারিত পণ্য (present determined commodity (ayn) with present determined commodity (ayn). তিনি বলেছেন, এর অর্থ যদি দখল বা হস্তান্তর হতো তাহলে বলতে হতো, 'মিন ইয়াদিন ইলা ইয়াদিন' (এক হাত থেকে অন্য হাতে)। সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ হচ্ছে, "তাঈন এর বিনিময়ে তাঈন" (ascertained commodity for ascertained commodity.)[৩৬]

সম্প্রতি এলমি মাহমুদ নূর বলেছেন, "ইয়াদান বিইয়াদিনের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে নির্ধারণ করা (ascertainment), বিনিময়ের পণ্য দু'টি চিহ্নিত করা (identification) এবং এদের গুণ-মান নিশ্চিত করা। ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের মাল উপস্থিত থাকলে ক্রেতা-বিক্রেতা যার যার বাঞ্ছিত মাল দেখে, পরখ করে, এদের গুণ-মান নিশ্চিত করে, দাম-দস্তুর ঠিক এবং ওজন, পরিমাপ বা গণনা করে পরস্পর হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের মাল যদি চুক্তিকালে অনুপস্থিত থাকে তাহলে মালের নমুনা (sample) বা বিবরণের (specification) মাধ্যমে উক্ত কাজ সমাধা করতে হয়। সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিনের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে নির্ধারণ করা যা পরিদর্শন (inspection) বা বর্ণনার (specification) মাধ্যমে করা হয়। অতঃপর পারস্পরিক হস্তান্তর তাৎক্ষণিক হতে পারে বা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়েও হতে

---

৩৪. নিয়াজী, ইমরান আহসান খান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২ ও ৪৬।

৩৫. উপরোক্ত, পৃঃ ১০ ও ১২।

৩৬. সারাখ্‌সী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫-৬।

www.icsbook.info

পারে। জনাব নূরের মতে, ইয়াদান বিইয়াদিন শর্ত লংঘন করলে রিবা নয় বরং গারারের (অস্পষ্টতা) সৃষ্টি হয়।[৩৭]

ফিক্বাহবিদ ও গবেষকদের মধ্যে উক্তরূপ মতপার্থক্য স্বত:ই বলে দিচ্ছে, ক্রয়-বিক্রয় ও রিবা সম্পর্কিত উক্ত বক্তব্য বাস্তবতা পরিপন্থী, পরস্পরবিরোধী ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে অসংগতিপূর্ণ।

প্রথমত, ঋণ হচ্ছে সমজাতের ফাঞ্জিবল পণ্য বা মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং ঋণ বৈধ, আর সমজাতের পণ্য বাকি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, এরূপ মন্তব্য পরস্পর বিরোধী ও বিভ্রান্তিকর। এতে একই ক্রয়-বিক্রয়কে একবার ঋণ আখ্যায়িত করে তাকে বৈধ বলা হয়েছে; আবার সমজাতের পণ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয় বলে একেই হারাম বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অসমজাতের পণ্য ও অর্থের বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্টি হয় দেনা। সুতরাং দেনা বৈধ আর অসম জাতের বস্তু বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ; এ বক্তব্য স্ববিরোধী। তাছাড়া, বাই-মোয়াজ্জল, বাই-সালাম, বাই-ইসতিসনা ও ইজারাহকে অনুমোদন করার পর আর কোন্ ধরনের বাকি ক্রয়-বিক্রয় আছে যাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে!

দ্বিতীয়ত, সাধারণ কর্দ থেকে কর্দে হাসানাহকে পৃথক করার চেষ্টা করা হয়েছে কেবল এই যুক্তিতে যে, সাধারণ কর্দে মেয়াদ নির্ধারিত থাকে কিন্তু কর্দে হাসানাহয় মেয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। কিন্তু বিশিষ্ট ফিক্বাহবিদগণ বলেছেন, কর্দ হচ্ছে এক প্রকার দাইন বা দেনা। আর আল-কুরআন সকল প্রকার দাইনের মেয়াদ নির্ধারণকে শর্ত করে দিয়েছে (২:২৮২)। তাছাড়া কর্দে হাসানাহ হচ্ছে এক ধরনের বাকি ক্রয়-বিক্রয়। আর সকল প্রকার বাকি ক্রয়-বিক্রয়েই বাকি পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণ করা অপরিহার্য। সুতরাং কর্দ অবৈধ, আর কর্দে হাসানাহ বৈধ এরূপ বলার কোন যুক্তি নেই।

তৃতীয়ত, রিবা ফদলকে ঋণের মেয়াদের potential benefit-এর মূল্য তথা রিবা ফদল ও রিবা নাসাকে পরস্পরের কাউন্টার ভ্যালু বলা হলে অর্থের সময়ের মূল্য (time value of money) প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে আর কোন যুক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া, কাউন্টার ভ্যালু না থাকাই হচ্ছে সুদ হারাম হওয়ার মূল ও একমাত্র কারণ। সময়ের/মেয়াদের potential benefit আছে এবং তা রিবার কাউন্টার ভ্যালু- এরূপ কথা রিবা হারাম হওয়ার মূল কারণকেই তিরোহিত করে দেয়।

চতুর্থত, হাদীসে ছয়টি পণ্যের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে দেখা যায়, সকল পণ্য, মুদ্রা ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেই সুদ হয় যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে রিবা চুক্তি করা হয়। সুতরাং রিবাবী (ribawi materials) পণ্য বলে নির্দিষ্ট কোন পণ্য নেই।

---

৩৭. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৩-১৩৪।

www.icsbook.info

পঞ্চমত, রিবা, নাসা/রিবা আল-ইয়াদ হচ্ছে প্রচ্ছন্ন রিবা এবং তা হারাম, এটি একটি অভিনব ধারণা; আল-কুরআনে এমন কোন কথা নেই। কেউ কেউ বলেছেন, এটা সুন্নাহর দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, 'যা নাসীয়াহ্ তা রিবা', 'রিবা হয় কেবল নাসীয়াতে' ইত্যাদি। হাদীসের এসব বর্ণনায় একথা বুঝায় না যে, সময় বা মেয়াদই রিবা। বস্তুতঃ সারা দুনিয়ায় কোথাও কখনও সময় বা মেয়াদকে রিবা মনে করা হয় না। সুতরাং মেয়াদ নিষিদ্ধ নয়। তবে অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বাকি বিক্রি নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিস্‌লান বিমিস্‌লিন বলে সমজাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়কালে উভয় মালের গুণগত মান সমান সমান করার বিধান দিয়েছেন। আর সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন বলে উভয় মালের পরিমাণ সমান সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর অসম জাতের পণ্য, মুদ্রা বা সেবার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে দাম নির্ধারণ করতে বলেছেন। এতেই মান, পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ হয়ে যায়; এরপর ইয়াদান বিইয়াদিন দ্বারা আবার তিনি নির্ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এটা স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইয়াদান বিইয়াদিন হলে তাতে কোন দোষ নেই; কিন্তু যা নাসীয়াহ্ তা রিবা। সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিন সুদ নয় গারারের সাথে সম্পৃক্ত, এ কথা সঠিক নয়।

সর্বোপরি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলাম কখনও ঋণ লেনদেন ও বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করেনি। বরং আল-কুরআনে কর্দে হাসানাহ প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়েছে; বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে লিখে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্দকে সাদাকাহ আখ্যায়িত করেছেন; কর্দ প্রদানকে অতি বড় সওয়াবের কাজ ঘোষণা করেছেন। বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত রয়েছে বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিজে ঋণ লেনদেন করেছেন; আর নিজের বর্ম বন্ধক রেখে এক ইহুদীর কাছ থেকে বাকিতে খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন যা দেনা হয়ে মৃত্যুকালেও তাঁর ওপর চেপে ছিল। সাহাবায়ে কেরামও ঋণ লেনদেন এবং বাকি ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। বস্তুতঃ সারা দুনিয়ায় সর্বকালে ঋণ ও বাকি লেনদেন চালু ছিল, আছে এবং আশা করা যায় থাকবে। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) সুপ্রতিষ্ঠিত।[৩৮] কর্দ ও বাকি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হতে পারে না।

ফিক্বাহশাস্ত্রে সুদ তথা ইয়াদান বিইয়াদিন প্রসঙ্গে এসে বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ বলা হলেও অন্যত্র প্রায় সকল মাযহাবেই বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে অনুমোদন করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও মালিকী ফক্বীহদের একটা অংশ স্পেসিফিকেশন ছাড়া হলেও বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেছেন। মালিকী মাযহাবের অধিকাংশ ফক্বীহ অবশ্য মালের

---

৩৮. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

স্পেসিফিকেশন করা হলে বাকি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম ইবনে হাযম এর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।[৩৯]

আল-কাসানি বলেছেন, নিষিদ্ধ জিনিস হচ্ছে মূল্যের ওপর বাড়তি যা আল-ফদল হিসেবে পরিচিত। ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণ প্রদানকালেই চুক্তির মাধ্যমে আসলের ওপর অতিরিক্ত (ফদল) ধার্য করার অধিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়ে কোন পক্ষের বস্তু হস্তান্তর স্থগিত (deferred) করা হলে এতে অতিরিক্ত (ফদল) থাকে না; সুতরাং সুনির্দিষ্ট (specification/standard) মান ও পরিমাণের কোন পণ্য বাকিতে বিক্রয় করলে এতে কোন রিবা হয় না।[৪০] এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ফক্বীহগণ একমত যে, সমস্যা ক্রয়-বিক্রয়ে নয়; বরং সমস্যার প্রকৃত কারণ হচ্ছে আসল পরিমাণের ওপর অতিরিক্তের (ফদল) উপস্থিতি। এ কারণে উমর বিন আব্দুল আযীয মুত্রিক বলেছেন, সুনির্দিষ্ট মানের (standardized) কোন পণ্য একই জাতের পণ্যের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করা হলে এতে সুদ হয় না। আল-কুরআন সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে অনুমোদন করেছে। আল-কুরআনের এই সাধারণ বিধান থেকেই উক্ত বিধান বের করা হয়েছে।[৪১] ইবনুল কায়্যিম এ পর্যন্ত বলেছেন যে, "আইনের ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, বরং নীতিগত বিধান হিসেবেই বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে অনুমোদন করা হয়েছে।"[৪২] সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিন দ্বারা অবশ্যই এ কথা বুঝায় না যে, ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি বস্তু তাৎক্ষণিক নগদ বিনিময় করতে হবে, অন্যথায় তা রিবায় পর্যবসিত হবে।[৪৩]

প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ নির্ধারণ করা নয়; এর অর্থ নগদ বিনিময়ও হতে পারে না। তাহলে ইয়াদান বিইয়াদিনের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

ফিক্বাহবিদদের আলোচনাতেই এর উত্তর নিহিত রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ ফক্বীহ ইয়াদান বিইয়াদিনের অর্থ করেছেন পারস্পরিক হস্তান্তর বা বিনিময়; তবে এর সাথে তাঁরা তাৎক্ষণিক নগদের শর্ত আরোপ করেছেন। আলোচনায় দেখানো হয়েছে, সকল সমস্যা, জটিলতা ও মতপার্থক্যের কারণ হচ্ছে নগদের এই শর্ত। এই শর্ত তুলে দিয়ে ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ যদি কেবল পারস্পরিক বিনিময় বা পারস্পরিক হস্তান্তর করা হয় তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। সুতরাং ইয়াদান বিইয়াদিন; হা'য়া ওয়া হা'য়া এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে পারস্পরিক বিনিময় বা reciprocal exchange যা বাকি নগদ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইয়াদান বিইয়াদিন-এর বিপরীত

---

৩৯. উপরোক্ত, পৃঃ ১৩৫।

৪০. আল-কাসানিঃ *বাদাই লি সানাই ফী আল-তরতীব আল শরঈ*, ভলি- ৭, পৃঃ ৩৯, উদ্ধৃত নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৪১. ওমর বিন আব্দুল আযীয মুত্রিকঃ *Al-Riba wal Mu'amalat Al-Masrafiyya*, 1st ed., H. 1414, p. 34, উদ্ধৃত, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৪২. Ibn Qayyim: I'lam, 1, 359, উদ্ধৃতঃ কামালি, মোহাম্মদ হাশিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৮।

৪৩. ই, এম, নূরঃ উপরোক্ত, পৃঃ ১৩৪।

www.icsbook.info

অর্থ বুঝানোর জন্য হাদীসে নাসীয়াহ্ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার।

২. *নাসীয়াহ্‌র তাৎপর্য ঃ* রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রিবা হয় কেবল নাসীয়াতে", "নাসীয়াহ্ ব্যতীত রিবা হয় না", "যা নাসীয়াতান তা রিবা", "যা ইয়াদান বিইয়াদিন তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যা নাসীয়াতান তা রিবা।"

নাসীয়াহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ঋণ (credit), বিলম্বে মূল্য প্রদান (delay of payment); আর নাসীয়াতান অর্থ হচ্ছে ধারে (on credit)।[৪৪] এই অর্থের আলোকে হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, নাসীয়াই রিবা, অথবা রিবা কেবল ঋণ ও ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু হাদীসে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে একদিকের অতিরিক্ত অংশকেও রিবা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একদিকে বলা হয়েছে রিবা হয় কেবল বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে; অপরদিকে বলা হয়েছে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়েও রিবা হয়। এরূপ পরস্পর বিপরীতমুখী কথার সমন্বয় করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীস কয়টিতে নাসীয়াহ্ বা নাসীয়াতান শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বুঝিয়েছেন যে, নাসীয়াহ্ হচ্ছে রিবার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, "হজ্জ হচ্ছে আরাফাত"। নাসীয়াহ্ সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসগুলোকে ঠিক এই অর্থেই বুঝতে হবে।[৪৫] আরবরা সাধারণত বলে যে, "যায়েদ ছাড়া শহরে আর কোন স্কলার নেই– এর দ্বারা যায়েদের প্রতিভার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। তেমনি নাসীয়াহ্ ছাড়া অন্য কিছুতে রিবা নেই কথার দ্বারা রিবা নাসীয়াহ্ যে গুরুতর অপরাধ এবং এর সাজা যে ভয়ংকর কঠোর হবে তাই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, রিবা নাসীয়াহ্ হচ্ছে স্বাভাবিক রিবা, এটাই হচ্ছে পারফেক্ট (perfect) রিবা। উক্ত কথার দ্বারা রিবার পূর্ণাঙ্গ রূপ বুঝানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের (রাঃ) যুগে প্রখ্যাত ফকীহ-সাহাবী ইবনে আব্বাসসহ কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) কেবল ঋণ ও দেনার ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্তকেই রিবা বলতেন; সমজাতের পণ্য ও অর্থ নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে পরিমাণে কম-বেশি করলে সেই বৃদ্ধিকে তাঁরা রিবা মনে করতেন না এবং এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে তাঁরা বৈধ বলতেন। অন্যান্য সকল সাহাবী (রাঃ) অবশ্য তাঁদের এ মতকে অপছন্দ করতেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে সরাসরি ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্নও করেছেন। (হাদীসে তার উল্লেখ আছে) তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবীদের (রাঃ) সকলেই তাঁদের উক্ত মত প্রত্যাহার করেছিলেন; কেবল ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। ভিন্নমত

---

৪৪. Cowan, J. M. পূর্বোল্লেখিত।

৪৫. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

www.icsbook.info

পোষণকারী সকলেই তাঁদের মত প্রত্যাহার করায়, এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের ভিন্নতর মত সঠিক ছিল না।

তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইয়াদান বিইয়াদিন ও নাসীয়াহ্ এ দু'টি পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। আবুল মিনহাল থেকে বর্ণিত ৯০ ক্রমিকে উল্লেখিত হাদীসে দেখা যায়, হজ্জের মওসুমে দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে রূপা বিক্রয় সম্পর্কে বারাআ ইবনে আযিবের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরে বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য পেশ করেছেন যাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেটা ইয়াদান বিইয়াদিন তার মধ্যে কোন দোষ নেই; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় নাসীয়াহ্ হলে তা রিবা।" এখানে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বলে যদি রূপার বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে ইয়াদান বিইয়াদিনকে আবার নগদের অর্থে ব্যবহার করা স্বাভাবিক নয়; তেমনি বাকিতে বিক্রয় বুঝানোর জন্য নাসীয়াহ্ পরিভাষা ব্যবহার করাও অস্বাভাবিক।

হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইয়াদান বিইয়াদিনের বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্যই নাসীয়াহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেদিক থেকে ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ নগদ বিনিময় করা হলে নাসীয়াহ অর্থ অবশ্যই বাকিতে বিনিময় করা হতে হবে। কিন্তু ইয়াদান বিইয়াদিন অর্থ যদি পারস্পরিক বিনিময় (যা নগদ বাকি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) করা হয়, তাহলে এর বিপরীতে নাসীয়াহ অর্থ দাঁড়ায় বিনিময়হীন (যা নগদ বাকি উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে)। অর্থাৎ ইয়াদান বিইয়াদিন হচ্ছে বিনিময় দিয়ে নেওয়া; আর নাসীয়াহ হচ্ছে বিনিময় না দিয়ে নেওয়া। রিবার ব্যাখ্যা থেকেও এটা স্পষ্ট হয়েছে, বিনিময় বা counter value না থাকাই হচ্ছে সুদ হওয়ার মূল ও একমাত্র কারণ।

ক্রয়-বিক্রয়ে কোন পণ্য, অর্থ বা সেবার সেই অংশই রিবা যার বিনিময় দেওয়া হয় না। ঋণ ও দেনার ওপরে বর্ধিত অংশ সুদ, কারণ অপরপক্ষ সেই অংশের বিনিময় দেয় না; তেমনি নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষের বর্ধিত অংশ সুদ, কারণ তা বিনিময়হীন। অপরদিকে, বাকি মূল্যের ওপর বাড়তি অংশ বা নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষের নেয়া অতিরিক্ত অংশের দাম দেওয়া হলে সেই বাড়তি/অতিরিক্ত অংশ আর রিবা থাকে না।

নাসীয়াহ শব্দটি 'নাসা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অভিধানে 'নাসা'-এর অর্থ লিখা হয়েছে, to put off, postpone, delay, defer, procrastinate[৪৬]. দেখা যাচ্ছে, নাসাআ-এর প্রথম অর্থ হচ্ছে to put off. আর Put off মানে হচ্ছে, বাতিল করা (to cancel); বিরত রাখা (put somebody off something); বাতি নিভিয়ে দেওয়া (to switch something off); বিলম্বিত করা (to delay); স্থগিত করা (postpone)। সুতরাং

[৪৬] Cowan, J. M. পূর্বোক্ত।

www.icsbook.info

'নাসাআ' এর অর্থ বাতিলও হতে পারে, স্থগিত করাও হতে পারে, বিলম্বিত করাও হতে পারে। তবে কোন কাজ স্থগিত বা বিলম্বিত করতে হলে বিলম্বের মেয়াদ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে; অন্যথায় তা বাতিল বুঝাবে। সেই জন্যই কুরআন মজীদে ঋণ/বাকি লেনদেনের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য (ইলা আজালিম্মুছাম্মাহ) বলা হয়েছে। হাদীসে অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বাকি ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাকি ক্রয়-বিক্রয় বা ঋণ সর্বদাই নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হতে হবে। অনির্ধারিত সময়ের জন্য বাকি দেওয়া আর মূল্য না নিয়ে দেওয়ার মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নাসীয়াহ্ শব্দ দ্বারা বিনিময় না নিয়ে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন– এটাই এর যথার্থ তাৎপর্য। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, যা বিনিময় দিয়ে নেওয়া হয় তাতে কোন দোষ নেই; কিন্তু যা বিনিময়হীন তা রিবা; বিনিময়হীনতাই রিবা, বিনিময়হীন না হলে রিবা হয় না ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক জাতের পণ্য, অর্থ বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিধান দিয়েছেন। তা হচ্ছে, মিস্‌লান বিমিস্‌লিন, সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন ও ইয়াদান বিইয়াদিন। আলোচনায় এটাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মিস্‌লান বিমিস্‌লিন দ্বারা উভয় পক্ষের পণ্য, অর্থ বা সেবার গুণ ও মানগত সমতা বিধান করতে বলা হয়েছে; সাওয়ান বিসাওয়ায়িন দ্বারা এদের পরিমাণ সমান সমান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এই শর্ত দু'টি পালন করলে সমজাতের পণ্যের মূল্য সমান হয়। অতঃপর ইয়াদান বিইয়াদিন দ্বারা উভয় পণ্য, অর্থ বা সেবা পারস্পরিক ও বাস্তব হস্তান্তরের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি বিধান নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের বেলাতেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

অসমজাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়

কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণের বিধান

ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের (different kinds/heterogeneous) হয় যেমন, সোনার বদলে রূপা, খেজুরের পরিবর্তে লবণ, টাকার বিনিময়ে গম, মার্কিন ডলারের বিনিময়ে সৌদী রিয়েল, কাজের বিনিময়ে টাকা ইত্যাদি, সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা ইচ্ছা মতো (দামে) বিক্রয় করতে পার, তবে হাত হাতে হাতে (ইয়াদান বিইয়াদিন)।" সম্মানিত ফক্বীহগণ এখানে একটি মাত্র শর্ত আছে বলে বলেছেন, আর সেটি হচ্ছে হাত হাতে হাতে (ইয়াদিন বিইয়াদিন) যার অর্থ তাঁরা করেছেন, তাৎক্ষণিক নগদ বিনিময়। কিন্তু এখানে শর্ত একটি নয়, দু'টি ঃ একটি হচ্ছে যে কোন দাম অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মতিতে দাম নির্ধারণ করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইয়াদান বিইয়াদিন বা পারস্পরিক বিনিময়।

www.icsbook.info

১. পারস্পরিক সম্মতি (Mutual Consent) ঃ "তোমরা যে কোন (দামে) বিক্রি করতে পার"- সম্মানিত ফক্বীহগণ হাদীসের এই অংশকে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত হিসেবে গণ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতা যে কোন দামে তার পণ্য বিক্রি করতে পারে না, সে যে কোন দাম হাঁকতে পারে মাত্র, এই অধিকার তার আছে। অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই যে দামে সম্মত হয় সেই দামে বেচাকেনা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ রাসূল (সাঃ) এখানে এই নীতিই তুলে ধরেছেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক সম্মতিতে যে দাম নির্ধারণ করবে সেটাই বৈধ দাম, সেই দামেই বেচাকেনা করা বৈধ। 'ফাবিয়ূ কাইফা শি'তুম'- তোমরা যেভাবে খুশী বিক্রি করতে পার – হাদীসের এই বাক্যাংশ আল-কুরআনে বর্ণিত বিধানের ব্যাখ্যা। আল-কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; বরং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা কর।" (৪ঃ২৯) এই আয়াতে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ এক, পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত কারও সম্পদ নেওয়া হচ্ছে বাতিল পন্থায় পরের সম্পদ ভক্ষণ করা; এটা অবৈধ বা নিষিদ্ধ; দুই, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পদ লেনদেন করা বৈধ- এটা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে পারস্পরিক সম্মতিকে ক্রয়-বিক্রয়ের অপরিহার্য শর্ত করা হয়েছে যা পূরণ করা না হলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয় না। হাদীসে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে, "অবশ্যই ক্রয়-বিক্রয় পারস্পরিক সম্মতির ওপর ভিত্তিশীল।"[৪৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "Someone's property will not be lawfully acquired by another unless it was given to him willingly."[৪৮] অর্থাৎ "কারও সম্পদ নেওয়া আইনত বৈধ হবে না যতক্ষণ না তা স্বেচ্ছা সম্মতিতে প্রদান করা হয়।" অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও পারস্পরিক সম্মতিকে ক্রয়-বিক্রয়ের একটি অপরিহার্য বিষয় বলে মনে করা হয়।

অর্থনীতিতে বলা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতের (dissimilar, different or heterogeneous) বস্তু ক্রয়-বিক্রয় কালে ক্রেতা এই চিন্তা করে যে, সে যে পণ্য, অর্থ বা সেবা কিনতে যাচ্ছে তা থেকে সে যে পরিমাণ উপযোগ, বেনিফিট বা তৃপ্তি পাবে তার মূল্য, আর এজন্য বিক্রেতা যে দাম (অর্থ, পণ্য বা সেবা) দাবী করছে তার মূল্য সমান কিনা। এটা হচ্ছে ক্রেতার মানসিক অবস্থা, মানসিক চিন্তা। এভাবে ক্রেতার যদি ধারণা হয় যে, বিক্রেতা যে দাম প্রস্তাব করেছে তার মূল্য এবং পণ্য, অর্থ বা সেবার মূল্য সমান হচ্ছে না, তাহলে সে বিক্রেতার প্রস্তাবিত দামে বস্তুটি ক্রয় করতে অসম্মতি জানায় এবং দাম কমানোর জন্য বিকল্প প্রস্তাব করে। অনুরূপভাবে বিক্রেতাও চিন্তা করে, সে যে পণ্য, অর্থ বা সেবাটি বিক্রি করছে তার মূল্য আর ক্রেতা যে দাম প্রস্তাব করেছে তার মূল্য সমান কিনা। যদি তার মনে হয় যে, তার পণ্য, অর্থ বা সেবার মূল্য এবং ক্রেতা কর্তৃক

---

৪৭. *ফাতহুল বারি*, ভলি-৮, পৃঃ ২৩০, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০০।
৪৮. ইবিদ।

প্রস্তাবিত মূল্য সমান নয়, তাহলে সে পণ্য, অর্থ বা সেবাটি প্রস্তাবিত দামে বিক্রি করতে অসম্মতি জানায় এবং দাম আরও বাড়ানোর জন্য বিকল্প প্রস্তাব দেয়। আধুনিক ভাষায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এরূপ প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবকে বলা হয় দরকষাকষি (bargaining)। শরয়ী ভাষায় একে বলা হয়েছে, ঈজাব ও কবুল। বস্তুতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু দু'টির চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই ক্রেতা-বিক্রেতা দরকষাকষি করে। ইবনে আল আরাবী এ সম্পর্কে বলেছেন, "If the need of the seller for the price or money is relatively stronger he would add more of his commodity or services for a given price. If on the other hand the relative need of the buyer for the commodity is stronger, he would add more of his price for a given commodity or service."[৪৯] "বিক্রেতা যদি তার পণ্য বা সেবার তুলনায় এর দাম তথা অর্থের প্রয়োজন অধিক বলে মনে করে তাহলে নির্দিষ্ট দামে সে বেশি পণ্য বা সেবা প্রদানে প্রস্তুত হয়ে যায়; অপরদিকে ক্রেতা যদি তার অর্থের তুলনায় বাঞ্ছিত পণ্যটির প্রয়োজনীয়তা বেশি বলে অনুভব করে, তাহলে সেই পণ্য বা সেবাটি পাওয়ার জন্য সে বেশি দাম দিতে রাজী হয়ে যায়।"

এইভাবে দরকষাকষির মাধ্যমে এক পর্যায়ে ক্রেতা যখন মনে করে যে, পণ্য, অর্থ বা সেবাটি এই দামে কিনলে তার প্রদত্ত দামের ক্ষতিপূরণ হবে, তখন সে সেই দামে কিনতে রাজী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বিক্রেতাও যখন মনে করে যে, প্রস্তাবিত দাম দ্বারা তার পণ্য বা সেবা হারানোর ক্ষতি পূরণ হচ্ছে, তখন সে সেই দামে তার পণ্য, অর্থ বা সেবা বিক্রি করতে রাজী হয়ে যায়। বিক্রেতা বলে দিলাম, আর ক্রেতা বলে নিলাম; অতীতকালের শব্দ দ্বারা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। অর্থনীতিতে এই অবস্থাকে বলা হয়েছে ভারসাম্য অবস্থা equilibrium point। আর এই দামকে বলা হয়েছে equilibrium price বা ভারসাম্য দাম।

"The great philosophers, i.e. Hegel, Simmel etc. also recognized that the commodity exchange is such that the exchangeability of goods ultimately rests on the complementary acts of will by which the commodity owners choose to trade what each other owns. Of course to be exchangeable the goods must have conventional qualities of being objects existing to satisfy specific market needs."[৫০] "What then gives the traded commodities both the common quality of exchangeability and specific exchange values are (is) nothing but the

---

৪৯. Ismail, Abdul Halim: *Deferred Transaction in the Quran, in Introduction to Islamic Finance,* Sh. Ghazali Sh. Ahud et (eds), 1992, উদ্ধৃত, নুর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫।

৫০. Richard D. Windfield, *'The Just Economy'*, Routledge, New York, 1988, p. 109: Quoted by Nur, E. M. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭.

www.icsbook.info

mutual acts by which the owners render them equivalently exchangeable."[৫১] "হেগেল, সিমেল প্রমুখ বড় বড় দার্শনিকও স্বীকার করেছেন যে, পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন একটি কাজ যেখানে পণ্য-সামগ্রীর বিনিময়যোগ্যতা পরস্পর সম্পূরক ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এই ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েই পণ্য-সামগ্রীর মালিকগণ তাদের নিজ নিজ পণ্য পরস্পর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এক্ষেত্রে বিনিময়ের পণ্যটির মধ্যে অবশ্যই বাজারের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণ করার মত গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।" "সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সামগ্রীর মধ্যে সাধারণ দু'টি বৈশিষ্ট্য, বিনিময়যোগ্যতা ও সুনির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য আর কিছু নয়, বরং স্বেচ্ছা সম্মতির দ্বারাই সৃষ্টি হয়। এই স্বেচ্ছা সম্মতির মাধ্যমে পণ্য-মালিকগণ তাদের নিজ নিজ পণ্য-সামগ্রীকে বিনিমেয় বানিয়ে দেয়।"

সুতরাং আল-কুরআন, সুন্নাহ, অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকদের মতে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য, অর্থ বা সেবা ক্রয়-বিক্রয়ে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণ করার বিধান হচ্ছে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করা। ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী এই কথাই বলেছেন নিম্ন ভাষায় ঃ "Perception in equality is acceptable in place of objective equality in exchange of dissimilar things, as money and commodity."[৫২] "সমজাতের দু'টি বস্তু বিনিময়ের ক্ষেত্রে এদের বস্তুগত সমতা বিধান করা জরুরী। কিন্তু অসম জাতের পণ্য-সামগ্রীর ক্ষেত্রে, যেমন অর্থের বিনিময়ে পণ্য, বস্তুগত সমতার স্থলে প্রত্যক্ষণগত সমতা গ্রহণযোগ্য।"

২. *পারস্পারিক সম্মতি বৈধ হওয়ার শর্ত ঃ* ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে দাম নির্ধারণ করার জন্য শরীয়তে আরও কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়েছে যা পরিপালন না করলে পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত দাম বৈধ হয় না। শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

১) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমান হতে হবে (Age of puberty, sound mind and intelligence) যাতে তারা চুক্তির ফলাফল ও পরিণতি উপলব্ধি করতে পারে;

২) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে যাতে তারা স্বেচ্ছায় প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে; অর্থাৎ এমন কোন চাপ, বাধ্যবাধকতা, জবরদস্তি থাকবে না যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ বা উভয়েই প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়;

৩) কোন প্রকার মিথ্যা, ধোকা-প্রতারণা, জালিয়াতি বা চালাকি না থাকা এবং

৪) কোন প্রকার গারার বা অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থবোধকতা ও অজ্ঞতা না থাকা।

---

[৫১] নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭-১৪৮।

[৫২] সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোক্ত, p. 74.

www.icsbook.info

এছাড়া বাজারে চাহিদা ও যোগান যাতে স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল থাকে, সকল প্রকার বিকৃতি ও কলুষতামুক্ত হয় এবং মানুষ কেবল স্বাভাবিক চাহিদা-যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে সেজন্য ইসলাম আরও কতিপয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেগুলো হচ্ছেঃ ১. সুদ নিষিদ্ধ করা; ২. জুয়া নিষিদ্ধ করা; ৩. সকল প্রকার অন্যায় ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা; ৪. মজুদদারী, চোরাকারবারী নিষিদ্ধ করা এবং ৫. বাই-আল মুততার বা জরুরী প্রয়োজনের সুযোগে চড়া দাম হাঁকা ইত্যাদি।[৫৩]

বিনিময়ের বিধান

ইয়াদান বিইয়াদিন (হাত থেকে হাতে/Reciprocal exchange) ঃ ইয়াদান বিইয়াদিন শর্তের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞদের আলোচনার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে, ইয়াদান বিইয়াদিন দ্বারা কেবল তাৎক্ষণিক নগদ হস্তান্তর বুঝায় না; বরং এর দ্বারা উভয় পণ্যের পারস্পরিক হস্তান্তর নিশ্চিত করা এবং বাস্তব হস্তান্তর করা বুঝায়। বড় কথা হচ্ছে, বাস্তব হস্তান্তর ছাড়া অন্য সবগুলো কাজ করতে হয় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে। আর পণ্য পারস্পরিক হস্তান্তর করতে হয় 'নিলাম-দিলাম' বলা অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর যা সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকও করা যেতে পারে অথবা শর্ত অনুসারে পরবর্তী কোন সময়েও করা যেতে পারে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনকালে যদি কোন একটি বা উভয় পণ্য অনুপস্থিত থাকে, তাহলে নমুনা বা স্পেসিফিকেশনের মাধ্যমে পণ্যের নাম, পরিচিতি, গুণ-মান, পরিমাণ, দাম হস্তান্তরের নিশ্চয়তা, (security, guarantee ইত্যাদি), হস্তান্তরের স্থান, সময় ইত্যাদি নিশ্চিত করে নিতে হবে। অতঃপর যথাসময়ে পণ্যের বাস্তব হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে।

বাই-এর আওতা ও পরিধি

হানাফী স্কুলের প্রখ্যাত ফক্বীহ্ ইমাম আল-সারাখ্সী বাইকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি লিখেছেন, "Permitted sale (bay halal) is the exchange of wealth having a value with wealth also having a value"[৫৪] "অনুমোদিত বা হালাল ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, মূল্য আছে এমন সম্পদের সাথে মূল্য আছে এমন সম্পদ বিনিময় করা।" এই অর্থে ফিক্বাহবিদগণ ইজারাহ্কেও বাই বলেছেন। কারণ ইজারাহ্য় বেনিফিট বিক্রয় করা হয়। এমনকি, তাঁরা সকল প্রকার ঋণ ও দেনার লেনদেনকেও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল বলে গণ্য করেছেন।

৫৩. সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩২।
৫৪. সারাখ্সী, পূর্বোল্লেখিত।

www.icsbook.info

সম্প্রতি ইমরান আহসান খান লিখেছেন, "Any transaction between two people that is an exchange of two counter-values is bay." "This meaning is not restricted to customary sale, but includes all that is included in this definition, and among these is debt whatever is its source, sale or loan."[৫৫] "দুই ব্যক্তির মধ্যে যে কোন বিনিময় তথা দু'টি প্রতিমূল্যের পারস্পরিক বিনিময়ই হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়।" "ক্রয়-বিক্রয়ের এই অর্থ কেবল প্রথাগত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং উক্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন সকল লেনদেনই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল; এমনকি, দায়ও, দায়ের উৎস যাই হোক, তা ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্টি হোক অথবা ঋণ থেকে উদ্ভূত হোক।"

"আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর রিবাকে করেছেন হারাম"- এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে হাশিম কামালি লিখেছেন যে, আয়াতে ব্যবহৃত 'বাই' শব্দটি হচ্ছে এক বচনে বিশেষ্য পদ, আর এর পূর্বে যুক্ত করা হয়েছে আল (আলিফ লাম); ফলে এখানে বাই-এর অর্থ হয়েছে সাধারণ বা আম। এর দ্বারা সকল প্রকার বাইকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সকল বাই-ই বৈধ। ইউসুফ আল-কারদাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, আল-কুরআনের সাধারণ বিধানের মধ্যে সকল প্রকার বাই যেমন, এক পণ্যের বিনিময়ে আর এক পণ্য বিক্রয় (বার্টার), এক মুদ্রার বদলে অন্য মুদ্রা বিক্রয় (আল-সরফ), অর্থের বিনিময়ে পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় (নগদ বিক্রয়), অগ্রিম বিক্রয় (সালাম), খরচ দামে বিক্রয় (আল-তাওলিয়া), লাভে বিক্রয় (মুরাবাহা), লোকসানে বিক্রয় (আল-ওয়াদিয়াহ্), মোক্তাদামে বিক্রয় (মুসাওয়ামাহ) এবং নিলামে বিক্রয় (আল-মুযাইয়াদাহ্) সবই শামিল রয়েছে। এসবই বৈধ, এমনকি ফিউচারস ও অপশন্স ক্রয়-বিক্রয় যদি সুদ ও গারারমুক্ত হয়, তাহলে তাও বৈধ। তাছাড়া, সুন্নাহ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই এমন সকল বাই-ই বৈধ।[৫৬]

মুনাফা বা লাভ

উপরের আলোচনা থেকে একথা জানা গেল যে, বাই বা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার ক্ষতিপূরণ করা যাতে কারও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে মুনাফা বা লাভ কি এবং তা কিভাবে হয়?

মুনাফা অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ আল-কুরআনে লাভকে বলা হয়েছে 'রিবহুন'(২:১৬) কোন কোন স্থানে আবার লাভকে বলা হয়েছে 'নাফা'। (৮৭:৯) শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি, উদ্বৃত্ত, অবশিষ্টাংশ, বাড়তি অংশ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে লাভ হচ্ছে পুঁজির বর্ধিতাংশ; আর এর বিপরীতে লোকসান হচ্ছে পুঁজির ক্ষয়- প্রাপ্ত অংশ। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ

---

৫৫. নিয়াজী, ইমরান আহসান খান, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ৫।
৫৬. কামালি, মোহাম্মদ হাশিম, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ১৪৩।

www.icsbook.info

রিকার্ডোর মতে লাভ হচ্ছে, "the return to capital and its organization in production."[৫৭] "মুনাফা হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত পুঁজি ও সংগঠনের আয় (return)।" Exploitation তত্ত্ব অনুসারে লাভ হচ্ছে, "residue after deducting the rental interest.[৫৮] "মোট আয় থেকে চুক্তিবদ্ধ দায় মিটানোর পর যা থাকে সেই অবশিষ্টাংশ হচ্ছে লাভ।" Sraffa-এর মতে লাভ হচ্ছে, "Surplus value".[৫৯] "মুনাফা হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য।" ফিক্বাহবিদদের মতে লাভ হচ্ছে পুঁজির প্রবৃদ্ধি বা বৃদ্ধি যা ব্যবসার মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইবনে আরাবী বলেছেন, "লাভ হচ্ছে কোন সেবা বা পণ্যের বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের ব্যবধান।"[৬০] সুতরাং লাভ হচ্ছে, "increase of value of assets actually realized in exchange. It is an incremental value accrued to the original capital or additional value of the initial capital."[৬১] "ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাস্তবে প্রাপ্ত সম্পদের বর্ধিত মূল্য। এটা হচ্ছে মূল পুঁজি থেকে উদ্ভূত বর্ধিত মূল্য অথবা প্রারম্ভিক পুঁজির অতিরিক্ত মূল্য।"

মুনাফার উৎস উৎপাদন ঃ অর্থনীতিতে মুনাফার অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, মুনাফা হচ্ছে উদ্যোগ ও ঝুঁকি গ্রহণের পারিতোষিক। কেউ বলেছেন লাভ হচ্ছে বিনিয়োগ ও পরিশ্রম করার পুরস্কার। আসলে মুনাফা আসে উৎপাদন থেকে। মানুষ উৎপাদন করে, উৎপাদিত সম্পদ বিক্রি করে লাভ পায়। উৎপাদন হচ্ছে সম্পদ বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের একমাত্র পথ।

উৎপাদন কাকে বলে ঃ উৎপাদন করা মানে হচ্ছে সৃষ্টি করা। But man cannot create anything and man cannot destroy anything. What man can create? Man can create utility only. "কিন্তু মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কিছু ধ্বংস করার ক্ষমতাও মানুষের নেই। মানুষ যা পারে তা হচ্ছে, মানুষ কেবল উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে।" সুতরাং "Producing means putting utility into" (fraser) and thereby adding value. "উৎপাদন মানে উপযোগ সৃষ্টি-সংযোজন করা" (ফ্রেশার) এবং এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করা। আর এই সৃষ্ট উপযোগ থেকে প্রাপ্ত মূল্যই হচ্ছে মুনাফা। উপযোগ বিভিন্ন পন্থায় সৃষ্টি করা যায়।

উপযোগ সৃষ্টি বা উৎপাদনের পন্থা ঃ উপযোগ সৃষ্টি বা উৎপাদন তিনভাবে করা যায় ঃ

---

৫৭. David Ricardo: *Works and Correspondence*, Vol. 4, p. 4.

৫৮. Marks, K. : *Theories of Surplus Value*, Vol. 1, p. 48-49.

৫৯. P. Sraffa: *Production of Commodities by Means of Commodities*, Cambridge University Press, 1960, p. 3-5.

৬০. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১।

৬১. ইবিদ, পৃঃ ৭১।

www.icsbook.info

১. ***আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন করে ঃ*** বস্তুর আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোগ সৃষ্টি বা সংযোজন করা যায়। মানুষ গাছ সৃষ্টি করতে পারে না; কিন্তু বিনিয়োগ করে গাছ কিনে কাঠ বানিয়ে টেবিল তৈরী করতে পারে। মনে করা যাক, গাছ খরিদ বাবদ ২,০০০/- এবং অন্যান্য খরচ বাবদ ১,০০০/- মোট ৩,০০০/- টাকা খরচ হলো। এটাই হলো মোট বিনিয়োগ। যদি উক্ত টেবিল ৫,০০০/- টাকায় বিক্রি হয়, তাহলে অতিরিক্ত ২,০০০/- টাকা পাওয়া গেল গাছের উপযোগের চেয়ে টেবিলের উপযোগ বেশি হওয়ার কারণে। এটাই হচ্ছে মুনাফা যা উপাদান বা সংযোজিত/বর্ধিত উপযোগের দাম।

২. ***সময় বা কাল পরিবর্তন করে ঃ*** সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধি করা যায়। যেমন, মওসুমের সময় প্রতি কেজি গোল আলুর দাম হয় ৫.০০ টাকা। এ সময়ে বিনিয়োগকারী যদি অর্থ বিনিয়োগ করে আলু ক্রয় ও কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে এবং অমওসুমে এই আলু বাজারজাত করে, তাহলে দেখা যায় গ্রাহকরা প্রতি কেজি ৪০.০০ টাকা দরে আলু ক্রয় করছে। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে গোল আলুর উপযোগ বেড়ে গেছে। এটাই হচ্ছে উৎপাদন। ধরা যাক, আলু ক্রয়, সংরক্ষণ ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় বাবদ বিনিয়োগকারীর কেজি প্রতি ৩৫.০০ টাকা খরচ হয়েছে। ফলে সে প্রতি কেজিতে ৫.০০ টাকা বেশি পাচ্ছে সংযোজিত উপযোগের দাম হিসেবে। এটাই তার লাভ— সৃষ্ট উপযোগ তথা উৎপাদনের মূল্য।

৩. ***স্থান পরিবর্তন করে ঃ স্থান*** পরিবর্তনের মাধ্যমেও উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন, মালয়েশিয়াতে খুব উন্নত মানের সিমেন্ট পাওয়া যায়। কোন ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করে উক্ত সিমেন্ট আমদানি করলে এদেশের সিমেন্ট ব্যবহারকারীদের কাছে এর উপযোগ সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, তারা প্রতি বস্তা সিমেন্ট ৫৫০/- টাকায় বিক্রি করলো; অপরদিকে বিনিয়োগকারীর প্রতি বস্তায় খরচ হয়েছে ৫০০/-। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বস্তায় ৫০/- টাকা বেশি। এটাই বিনিয়োগকারীর মুনাফা; বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট/বর্ধিত উপযোগের দাম। দেখা যাচ্ছে পদ্ধতি যেটাই হোক উৎপাদন করতে হলে দরকার বিনিয়োগ।

বিনিয়োগ কাকে বলে

বিনিয়োগ হচ্ছে, উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে কোন পণ্য-সামগ্রী, অর্থ বা সেবা ক্রয় করা; অতঃপর উৎপাদিত সম্পদ বিক্রি করে লাভ করা।। অন্য কথায়, বিনিয়োগ মানে হচ্ছে অর্থ বা পুঁজিকে ভিন্নতর অর্থ, পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করা। অর্থ বা পুঁজি যতক্ষণ তার নিজস্ব রূপে থাকে ততক্ষণ এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না— তা সম্ভব নয়। কিন্তু এর দ্বারা ভিন্নতর কিছু ক্রয় করলে ক্রীত পণ্য, অর্থ বা সেবার উপযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। আর উপযোগ বৃদ্ধি বা উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে কিছু ক্রয় করাই হচ্ছে বিনিয়োগ। কৃষক,

www.icsbook.info

শ্রমিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ বিনিয়োগ ও বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। কৃষক তার অর্থ (পুঁজি) ব্যয় করে বীজ, সার, লাঙ্গল, শ্রম ক্রয় করে, জমি কর্ষণ করে এবং বীজ বপন করে। এতে তার অর্থ এসব পণ্য ও সেবায় রূপান্তরিত হয়ে যায়; অতঃপর তা আবার রূপান্তরিত হয়ে হয় ফসল। মনে করা যাক, কৃষক বিনিয়োগ বাবদ মোট ৫,০০০/- টাকা ব্যয় করেছে; আর এ থেকে ধান পেয়েছে মোট ১৫ মন। অর্থাৎ ৫,০০০/- টাকা ১৫ মন ধানে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও উৎপাদিত ধানের জাত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে এর কোনটি বেশি, কোনটি কম তথা এতে লাভ হয়েছে না লোকসান, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য উৎপাদিত ধান বিক্রি করে মূল পুঁজি অর্থাৎ টাকায় ফিরিয়ে আনা হলে উভয় টাকার মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হবে; এভাবে সর্ব শেষে প্রাপ্ত টাকা আর পূর্বে ব্যয়িত টাকার পরিমাণের পার্থক্য দ্বারাই জানা যাবে লাভ হয়েছে না লোকসান, নাকি আসল আসল আছে।

এমনিভাবে, শিল্পপতি প্রথমে তার টাকাকে ভূমি, মেশিন, কাঁচামাল, শ্রম ইত্যাদিতে এবং পরে উৎপাদিত পণ্যে রূপান্তরিত করে এবং সব শেষে একে পুনরায় মূল পুঁজি টাকায় ফিরিয়ে আনে; সে জানতে পারে তার প্রকৃত লাভ-ক্ষতির অবস্থা।

একইভাবে সকল পণ্য ব্যবসায়ী, সেবা কারবারী, মুদ্রা ব্যবসায়ী তথা সকল বিনিয়োগকারীকেই তাদের পুঁজিকে ভিন্নতর অর্থ, পণ্য বা সেবায় রূপান্তর করতে এবং সবশেষ পর্যায়ে আবার একে প্রথম বিনিয়োজিত পুঁজির আকারে ফিরিয়ে আনতে হয়। এভাবেই লাভ-ক্ষতি বের হয়। এই গোটা প্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

'Investment means transformation of money/capital into another kind of money or goods and again transformation of that money/goods into original money. The difference between the quantity/amount of the last money received and the 1st money spent is the profit/loss.' "বিনিয়োগ মানে হচ্ছে কোন মুদ্রা/পুঁজিকে ভিন্নতর কোন মুদ্রা/পণ্যে রূপান্তর করা এবং পরবর্তীতে সেই মুদ্রা বা পণ্যকে মূল মুদ্রা/পুঁজিতে ফিরিয়ে আনা। এভাবে সর্বশেষে প্রাপ্ত মুদ্রা/পুঁজি এবং সর্বপ্রথম বিনিয়োজিত মুদ্রা/পুঁজির পরিমাণের পার্থক্যই হচ্ছে মুনাফা/লোকসান।" সুতরাং "The aspect that matters is the conversion of, for example $1000.00, into an asset, in which that $1000.00 asset may be worth more or less in the future, a condition that will lead to a profit or loss."[৬২] "আসল বিষয় হচ্ছে, রূপান্তর, এটি এমন একটি শর্ত যা লাভ অথবা লোকসান বয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ, ১০০০/- মার্কিন ডলারকে ভিন্ন কোন সম্পদে রূপান্তর করা হলে ভবিষ্যতে এই সম্পদের মূল্য মার্কিন ডলারের অংকে বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে।" "Islamic injunctions have clearly shown

---

৬২. আহমদ, আবু উমর ও হাসান, এম, কবীরঃ *The Time Value of Money Concept in Islamic Finance*, in the American Journal of Islamic Social Science, 23:1, p. 85.

www.icsbook.info

that the transformation process of objects and trading of goods one for another is itself the objective matter and it is considered as a necessary condition for seeking profit."[৬৩] "ইসলামী বিধানে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে, বস্তুসমূহের রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং এক পণ্য বা সেবাকে ভিন্নজাতের কোন পণ্য বা সেবার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা নিজেই একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং মুনাফা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে বিবেচিত।"

উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীগণ তাদের বিনিয়োগ ব্যয়ের সাথে উক্ত সংযোজিত মূল্য যোগ করে দাম ধার্য করে পণ্যটি বাজারজাত করে এই মূল্যটা পেতে চায়। ড. সিদ্দিকীর ভাষায়, "Trade facilitates exchanges, exchange creates value. Traders try to capture part of value so created."[৬৪] "ব্যবসা বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়, আর বিনিময় মূল্য সৃষ্টি/সংযোজন করে। ব্যবসায়ী এভাবে সৃষ্ট/সংযোজিত মূল্যের অংশ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে।"

সুতরাং উৎপাদন বা উপযোগ সৃষ্টি করা কেবল বিনিয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। আর বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট/সংযোজিত উপযোগই হচ্ছে মুনাফার উৎস। বস্তুতঃ বর্ধিত উপযোগের মূল্য বা counter value হচ্ছে মুনাফা। সুতরাং মুনাফার কাউন্টার ভ্যালু হচ্ছে বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট/সংযোজিত/বর্ধিত উপযোগ। মুনাফা দামের অংশ এবং দামের ভেতরেই থাকে।

বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য ঃ উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, রূপান্তর এবং পুনঃরূপান্তর হচ্ছে বিনিয়োগের অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এতে পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে ফিরে আসতে পারে আবার তা হ্রাস পাওয়াও অসম্ভব নয়; এমনকি, সম্পূর্ণ পুঁজি খোয়া যাবার আশংকাও রয়েছে। সুতরাং লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতীত বিনিয়োগ সম্ভব নয়। এক কথায় লাভ-লোকসান উভয়টাই বিনিয়োগের স্বাভাবিক পরিণতি।" এজন্যেই হাদীসে বলা হয়েছে, "আল-খারাজু বিয্যামান"–মুনাফা ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং বিনিয়োগ কখনও ঝুঁকিমুক্ত হয় না এবং বিনিয়োগ ফেরতের কোন গ্যারান্টি নেই। কেউ যদি ফেরতের গ্যারান্টি দেয়, তাহলে তা বিনিয়োগ নয়, ঋণে পরিণত হবে। আর তার ওপর মুনাফা সুদ হবে।

লোকসান হয় কেন ঃ মুনাফা হচ্ছে বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট বা সংযোজিত উপযোগের দাম। এ অবস্থায় মুনাফা তো নিশ্চিত হওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কখনও কখনও বিনিয়োগকারী তার সৃষ্ট বা সংযোজিত উপযোগের মূল্য পায় না; বরং লোকসানের মাধ্যমে তার মূল পুঁজিও খোয়া যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, মূল্য সংযোজন করা সত্ত্বেও লোকসান হয় কেন? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে, দুনিয়ায় কোন পণ্যেরই দাম নির্ধারণ করা নেই; বস্তুতঃ কোন পণ্যের দাম মানে সেই পণ্যের উপযোগের দাম। আর

---

[৬৩] নূর, ই, এমঃ পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৫৯।
[৬৪] সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

www.icsbook.info

স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই পণ্যের উপযোগ ভিন্ন ভিন্ন হয়। Utility differs from person to person, time to time and place to place. বিনিয়োগকারী পণ্য উৎপাদন করে তার খরচ মূল্যের সাথে সংযোজিত উপযোগের মূল্য যোগ করে বাজারজাত করে। এতে স্থান, কাল ও পাত্র সবই ভিন্নতর হয়; এতে উপযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ক্রেতাদের কাছে উপযোগ বেড়ে গেলে আশাতীত লাভ যেমন হতে পারে, তেমনি আবার উপযোগ হ্রাস পেলে লোকসানও হতে পারে। লাভ ও লোকসানের আসল কারণ এখানেই। তবে কখনও কখনও উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে বিনিয়োগকারীর ব্যর্থতার দরুনও লোকসান হতে পারে।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য

১. মুনাফা সংযোজিত মূল্যের বিনিময় ঃ উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, বিনিয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট/সংযোজিত উপযোগের মূল্যই হচ্ছে মুনাফা যা মোট মূল্যের মধ্যেই থাকে।

২. মুনাফা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের পার্থক্য ঃ "The margin between the price they paid and the price they charge, the difference between the sale price and the purchase price is called profit. The same is described as the difference between total revenue (TR) and total cost (TC), in order to cover things made/prepared by the seller as in the handicraft and manufacture. A peasant selling agricultural products grown on his own land can also be covered by the same, and so on."[৬৫]
"তাদের প্রদত্ত দাম ও ধার্যকৃত দামের ব্যবধান তথা বিক্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্যের পার্থক্যকে বলা হয় মুনাফা। (অর্থনীতিতে) একে মোট আয়ের (TR) সাথে মোট ব্যয়ের (TC) ব্যবধান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতার মোট যে আয় (TR) হয়, আর পণ্যটি তৈরী/প্রস্তুত করতে সে যা ব্যয় করে (TC), যেমন হস্তশিল্প ও শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে করা হয়, এতদুভয়ের পার্থক্য হচ্ছে মুনাফা। একজন কৃষক যে তার নিজ জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে তার বেলায় এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এই একইভাবে মুনাফা অর্জিত হয়।"

পাশ্চাত্য অর্থনীতির মতে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন উৎপাদনের এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে উৎপাদন করার পর উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে প্রাপ্ত মোট আয় Total Revenue (TR) হতে ভূমিকে দেওয়া হয় পূর্ব নির্ধারিত ভাড়া, শ্রমকে দেওয়া হয় পূর্ব নির্ধারিত মজুরী আর ধারকৃত মূলধনের জন্য দেওয়া হয় পূর্ব নির্ধারিত সুদ; চুক্তিবদ্ধ এসব দেনাকে বলা হয় Total Cost (TC). এই TC পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় মুনাফা যা সংগঠন পেয়ে থাকে। সুতরাং মুনাফা

---

৬৫. ইবিদ, পৃ: ৪৫।

www.icsbook.info

হচ্ছে অবশিষ্টাংশ বা TR-TC=Profit. কিন্তু ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ। ইসলামী অর্থনীতিতে তাই পুঁজির জন্য সুদ দিতে হয় না; বরং ভূমি ও শ্রমের পাওনা পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে পুঁজির মালিক ও উদ্যোক্তা চুক্তি অনুসারে তা ভাগ করে নেয়। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতেও মুনাফা হচ্ছে অবশিষ্টাংশ তবে ভিন্নতর অর্থে।

৩. মুনাফা ঝুঁকিপূর্ণ ঃ এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন কারণে বাজারে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার অথবা যোগান বেশি হওয়ার কারণে পণ্যের বাজার পড়ে গেলে বিনিয়োগকারী তার নির্ধারিত দামের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং তাকে লোকসান দিতে হয়। অপরদিকে, কোন কারণে যদি পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পায় এবং বাজার দর উঠে যায় তাহলে বিনিয়োগকারী তার আশার চেয়েও বেশি লাভ পেয়ে যায়। ড. সিদ্দিকী বলেছেন, "Sometimes the difference between the sale price and the purchase price i.e., that between revenue and cost is negative. In that case it is called loss. Trade is subject to profits as well as losses. No language has different words for loss making trade and profit making trade. It is the nature of this activity to be subject to occasional losses."[৬৬] "কখনও কখনও বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্যের পার্থক্য তথা মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য ঋণাত্মক হয়; একে বলা হয় লোকসান। ব্যবসা লাভ-লোকসান সাপেক্ষ। কোন ভাষাতেই লোকসানী কারবার ও মুনাফাজনক কারবারের জন্য আলাদা আলাদা কোন শব্দ/পরিভাষা নেই। এটাই হচ্ছে ব্যবসার প্রকৃতি, স্বভাবধর্ম ও বৈশিষ্ট্য যে, কখনও কখনও এতে লোকসানও হতে পারে।"

৪. মুনাফা বাজারের দান ঃ লাভ-লোকসানের বিষয়টি আসলে বাজারের ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই ব্যবসায়ে ঝুঁকি বহনের প্রশ্ন আসে। অন্যথায় বিনিয়োগ করা, বিনিয়োগে মেধা ও শ্রম খাটানো, উপযোগ সৃষ্টি করা ও মূল্য সংযোজনের বিনিময় হিসেবে মুনাফা তো নিশ্চিত হবারই কথা। সুতরাং চূড়ান্তভাবে লাভ ও লোকসান হচ্ছে বাজারের দান বা Gift of market or Result of market। আল-কুরআনের পরিভাষায় একেই বলা হয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ বা ফদল।

৫. মুনাফা পূর্বনির্ধারিত হয় না ঃ "Profit is residual, a surplus determined post facto and could very well be negative."[৬৭] "মুনাফা হচ্ছে উদ্বৃত্তাংশ, এমন একটি উদ্বৃত্ত যা কেবল ঘটনা শেষেই নিরূপণ করা সম্ভব এবং তা ঋণাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক।" মুনাফা কখনও ইতিবাচক, কখনও নেতিবাচক হতে পারে। সুতরাং লাভ কখনও পূর্বনির্ধারিত (Predetermined) হয় না। অর্থাৎ পূর্বাহ্নেই চুক্তির মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ বা হার নির্ধারণ করা যায় না।

---

৬৬. সিদ্দিকী, এম, এন, পূর্বোক্ত, পৃ:৪৫।
৬৭. ইবিদ, পৃ: ৬৩।

www.icsbook.info

৬. ***মুনাফা প্রতিমূল্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ*** আলোচনায় দেখা গেল যে, মুনাফা বা লাভ হচ্ছে বিনিয়োগকারী কর্তৃক সংযোজিত উপযোগ, মূল্য এবং ঝুঁকির দাম যা বাজার উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির দ্বারা পণ্য-সামগ্রীর যে দাম নির্ধারিত হয়, মুনাফা বা লোকসান তার অন্তর্ভুক্ত, দাম বহির্ভূত বা অতিরিক্ত কিছু নয়।

৭. ***মুনাফা বিনিময়হীন নয় ঃ*** মুনাফা মূল্যের (counter-value) একটা অংশ বা উপাদান যার বিনিময় হচ্ছে সংযোজিত উপযোগ। আল্লামা মওদূদী, এ ব্যাপারে বলেছেন, "ব্যবসায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমান সমান মূল্যের বিনিময় হয়। ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে বিক্রেতা যে বুদ্ধি, শ্রম ও মেধা ব্যয় করে ক্রেতার জন্য পণ্যটি জোগাড় বা উৎপাদন করে সে তারই মূল্য গ্রহণ করে।"[৬৮] এ প্রসঙ্গে ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেছেন, "মুনাফা সুদের ন্যায় কোন অতিরিক্ত (excess) নয়। ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ স্বাধীন পর্যবেক্ষণ, বুঝ ও উপলব্ধি অনুসারে সুনির্দিষ্ট উপকার (advantage) পেয়ে লাভবান হয়। "In other words, there is always a counter value to profit in trade whereas there is no counter value to interest."[৬৯] "অন্য কথায়, কারবারে অর্জিত মুনাফার প্রতিমূল্য সর্বদাই আছে, কিন্তু সুদের কোন প্রতিমূল্য নেই।"

উপরের আলোচনার সার কথা হলো, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে দুটি কাউন্টার ভ্যালুর বিনিময়; যার মধ্যে লাভ-লোকসানও অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকে। লাভ উৎপাদন খরচ বা ক্রয়-মূল্যের সাথে সংযোজিত মূল্য এবং counter-value-এর অংশ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা কাউন্টার ভ্যালুর ওপরে ধার্যকৃত অতিরিক্ত (excess) ও কাউন্টার ভ্যালুহীন (without counter-value) নয়।

মুনাফার সীমা

পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে (Profit maximization) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি গণ্য করা হয়। এই অর্থনীতিতে বলা হয়েছে যে, কোন ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) যেখানে এর প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান হয় সেখানে ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। এই মুনাফা অর্জনই হচ্ছে উদ্যোক্তার লক্ষ্য।

কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি হচ্ছে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ (secular/positive)। এ অর্থনীতিতে মানুষকে মনে করা হয় 'পূর্ণ স্বাধীন র‍্যাশনাল ইকোনমিক ম্যান'। সেখানে মনোপলি, কার্টেল ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তাদের শোষণ করে অস্বাভাবিক মুনাফা লুটে নেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল। এখানে মানুষ হচ্ছে

---

৬৮. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা: *তাফহীমুল কুরআন*, বাংলা অনুবাদ, মুহাম্মদ, আব্দুর রহীম, ১ম জেলদ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, সূরা আল-বাকারাহ, টীকা-৩১৮ক।

৬৯. সিদ্দিকী, এন, নুর, উপরোক্ত, পৃ: ৪৬।

www.icsbook.info

'ইসলামিক র‍্যাশনাল ম্যান'। তাঁদের মতে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ - পুঁজিবাদী এই দর্শনের স্থান ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিতে মুনাফার সীমা নির্ধারিত থাকা উচিত। তাদের মতে, "এই সীমা মোট পুঁজির ১০% বা ৩৩% এর অধিক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এই মতের পক্ষে কোন দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[৭০]

ইসলামী অর্থনীতিতে মুনাফার সীমা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. মান্নান বলেছেন যে, ইসলাম মুনাফার অনুমোদন দিয়েছে সীমাবদ্ধ অর্থে। সুতরাং ইসলামে মুনাফা হবে স্বাভাবিক (normal) মুনাফা যেখানে কোন নতুন ফার্মের জন্য কারবারে প্রবেশের প্রবণতা থাকবে না; আবার পুরাতন কোন ফার্মও কারবার থেকে বেরিয়ে যাবে না।[৭১] ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী এক্ষেত্রে সন্তোষজনক (Satisfactory profits) মুনাফার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামের কোন বিধি-বিধান লংঘন না করে সর্বোচ্চ যে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব সেটাই হবে মুনাফার উর্দ্ধতন সীমা। অপরদিকে উৎপাদনকারীর জন্য ভালভাবে জীবন যাপন এবং অতীত লোকসান পূরণের জন্য যথেষ্ট মুনাফাই হচ্ছে লাভের নিম্নতম সীমা। তাঁর মতে এই উর্ধ্বতন ও নিম্নতম সীমার মধ্যবর্তী যে কোন পরিমাণ মুনাফাই হচ্ছে 'সন্তোষজনক মুনাফা'।[৭২] কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক অর্থনীতিবিদ মুনাফার এসব ধারণাকে আত্মকেন্দ্রিক (subjective) ও অস্পষ্ট বলে সমালোচনা করেছেন।

মুনাফার সীমা সম্পর্কে ড. আরীফের অভিমত হচ্ছে, MR=MC নয়, বরং কোন ফার্মের AR (বা গড় আয়) যেখানে AC-এর (বা গড় ব্যয়ের) সমান হবে ইসলামী অর্থনীতিতে সেটাই হবে ভারসাম্য বিন্দু এবং এই পর্যায়ে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যাবে একজন মুসলিম উদ্যোক্তার মুনাফা সেই পরিমাণই হওয়া উচিত।[৭৩] এলমি নূরের মতে, সামাজিক বিচারে এসবই হচ্ছে সদিচ্ছা (good wishes); কিন্তু এর মৌলিক যুক্তি ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত নয়। তাঁর মতে, মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টাকে ভ্রাতৃত্বসুলভ, মানবিক বিবেচনা বা এহ্সান ও বদান্যতার সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কারণ ইহ্সান হচ্ছে ব্যবসায়িক কার্যাবলী ও প্রচেষ্টা থেকে আলাদা। আর ব্যবসায়িক কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে অধিকতর মুনাফা অর্জন করা।[৭৪]

জেড, হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে জনাব নূর লিখেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যকে অর্থ-লিপ্সা এবং ইসলামী নৈতিক বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়; কিন্তু তার পরেও ইসলামী অর্থনীতিতে এ তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি

---

৭০. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৬।

৭১. Mannan, M. A. : *Introduction of Islamic Economics*, p. 168, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃ: ৭৮।

৭২. সিদ্দিকী, এম, এন, উদ্ধৃত, ইবিদ।

৭৩. M. Ariff (ed), *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, ICRIE, 1982, p. 8, উদ্ধৃত, ইবিদ, পৃ: ৭১।

৭৪. নূর, ই, এম, ইবিদ, পৃ: ৭৯।

www.icsbook.info

দেখিয়েছেন, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ধারণার একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য আছে; সেজন্য মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ধারণা (predictive) করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফা তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব বলে গণ্য হতে পারে। পরিবর্তনশীল (dynamic) অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুকাবিলায় এই ধারণাই কোন ফার্মকে সৃজনশীল ও সম্প্রসারিত হতে প্রেরণা যোগায়।[৭৫]

বস্তুতঃ ইসলাম মুনাফার কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। এমনকি, হাদীসে দেখা যায় যে, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পণ্য-সামগ্রীর দাম বেঁধে দিতেও রাজী হননি; বরং তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, "দাম তো আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন, সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা দানকারী একমাত্র তিনিই এবং তিনিই রিযিকদাতা"।[৭৬] এ ছাড়া উবাদা ইবনে সামিত বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) "তোমরা যে কোন দামে বিক্রি করতে পার" বলে ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন দামকেই বৈধ করে দিয়েছেন। এই বাণী দ্বারা তিনি বাজারে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দামের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আর এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত দামে যখন যে পরিমাণ মুনাফা আসে সেই মুনাফাই হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনুমোদিত মুনাফা। অন্য আর এক হাদীসে নবী (সাঃ) এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, "জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন শহরবাসী যেন কোন পল্লীবাসীর পক্ষে কেনাবেচা না করে। লোকদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের একের দ্বারা অপরের রিযিকের ব্যবস্থা করেন।"[৭৭] এই হাদীসের নির্দেশ স্পষ্ট; লোকদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। অন্য আর একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কুরবানীর বকরী কিনতে গিয়ে এক সাহাবী (হাকিম বিন হিযাম রাঃ) শতকরা ১০০ ভাগ মুনাফা করেন; এর পরেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ব্যবসায় বরকত দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।[৭৮]

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাকে অনুমোদন করেছে, ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় উদ্যম-উদ্যোগের স্বাধীনতা দিয়েছে, মুনাফাকে আল্লাহর নেয়ামত বা অনুগ্রহ ঘোষণা করেছে, দামের (price) মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ বণ্টন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছে, বাজারে চাহিদা-যোগানকে স্বাভাবিক রাখার জন্য যথোপযুক্ত বিধি-বিধান দিয়েছে এবং সুদসহ সকল প্রকার জুলুমমূলক লেনদেন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামের ইত্যাকার সীমার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা হলে তা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া মুনাফাই হচ্ছে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, উৎপাদন, উন্নতি ও

---

৭৫. ইবিদ, পৃঃ ৭৯।

৭৬. *মিশকাত শরীফ*, হাদীস নং ২৭৬৮, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ এবং তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী।

৭৭. মুসলিম, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৬, হাদীস নং ৩৬৮৪।

৭৮. জামে আত-*তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২, হাদীস নং ১১৯৫, আবূ দাউদ;* উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃঃ ৭৬।

www.icsbook.info

সমৃদ্ধির আসল চাবিকাঠি। সুতরাং মুনাফার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া ইসলামের কাম্য নয়। সর্বোপরি প্রত্যেক কারবার তথা বিনিয়োগে সর্বোচ্চ লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি লোকসানের মাধ্যমে সাকল্য পুঁজি খোয়া যাওয়ার আশংকাও রয়েছে। আর একথা সত্য যে, লোকসানের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এর বিপরীতে লাভের কোন সীমা না থাকাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন ব্যক্তি যাতে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে; সে জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হতে হবে পারস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ, সামষ্টিক স্বার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয়।

ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণীবিন্যাস

স্কলারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সামনে নিয়ে বিভিন্নভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণী-বিন্যাস করেছেন। তবে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণী-বিন্যাস করার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন আমাদের আলোচনার জন্য সেটিই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক এবং রিবা বুঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সূরাতুল বাকারাহ্‌র ২৮২ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে বাকি ও নগদ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

এদিকে উবাদা ইবনে সামিত থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্রয়-বিক্রয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ সমজাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় যেমন, সোনার বদলে সোনা ইত্যাদি এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় যেমন, সোনার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে খেজুর ইত্যাদি।

সুতরাং আল-কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুসারে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে নিম্নোল্লেখিত চার প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় ঃ

১) **সমজাতের পণ্য, সেবা বা অর্থ নগদ ক্রয়-বিক্রয়** (Spot transaction of goods, services or currencies of same kind or same species under same genus) যেমন, সোনার বদলে সোনা, টাকার বদলে টাকা, খেজুরের বদলে খেজুর ইত্যাদি।

২) **সমজাতের পণ্য, সেবা ও অর্থ বাকি ক্রয়-বিক্রয়** (Deferred sale of goods, services or currencies of same kind or same species under same genus); যেমন, আজ সোনা দিয়ে এক মাস পর সোনা নেওয়া, আজ টাকা দিয়ে এক মাস পর টাকা নেওয়া, আজ খেজুর দিয়ে এক মাস পর খেজুর নেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে আসলে ঋণ বা ধার; কারণ, ঋণ হচ্ছে কোন ফাঞ্জিবল পণ্য একই জাতের পণ্যের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করা।

৩) **অসম জাতের পণ্য, সেবা ও অর্থ নগদ ক্রয়-বিক্রয়** (Spot sale of dissimilar, different or heterogeneous kinds of goods, services or currencies); যেমন, সোনার বদলে রূপা, টাকার বদলে ডলার অথবা খেজুরের বদলে গম ইত্যাদি।

www.icsbook.info

৪) **অসম জাতের পণ্য, সেবা ও অর্থ বাকি ক্রয়-বিক্রয়** (Deferred sale of dissimilar, different or heterogeneous kinds of goods, services or currencies); যেমন, আজ সোনা দিয়ে এক মাস পর রূপা নেওয়া, আজ টাকা দিয়ে এক মাস পর টেবিল নেওয়া, আজ টাকা দিয়ে এক মাস পর ডলার নেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে যে কাউন্টার ভ্যালু প্রদান স্থগিত রাখা হয় তাকেই বলা হয় দাইন বা দেনা।

ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফার গুরুত্ব

১) ক্রয়-বিক্রয় মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয়। দুনিয়ায় মানুষের অভাব অসীম ও বহুমুখী। কিন্তু পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিই তার সকল অভাব পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্য-সামগ্রী ও সেবা একা নিজেই উৎপাদন করতে পারে না। এজন্য যে বহুমুখী যোগ্যতা-প্রতিভা, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশ দরকার তাও এককভাবে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির আয়ত্তে নেই। এখানে প্রত্যেকে কেবল সেই পণ্য-সামগ্রী বা সেবা উৎপাদন করে যা উৎপাদন করায় তার সর্বাধিক যোগ্যতা-প্রতিভা রয়েছে, যার প্রতি তার ঝোঁক-প্রবণতা বেশি, যার উপায়-উপকরণ তার জন্য সহজলভ্য এবং পরিবেশ সবচেয়ে বেশি অনুকূল। এক কথায়, প্রত্যেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি কেবল সেই সব পণ্য-সামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করে যা সে সর্বাধিক দক্ষতার সাথে এবং তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করতে সক্ষম। অতঃপর সে তার উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর উদ্বৃত্তাংশের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির কাছ থেকে অপরাপর পণ্য-সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে তার যাবতীয় অভাব পূরণ করে থাকে। এভাবে সর্ব নিম্ন খরচে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। আর পারস্পরিক বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয় হয়ে ওঠে অত্যাবশ্যকীয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোই হচ্ছেন পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদ যাঁরা বাণিজ্যের মাধ্যমে সকল পক্ষের উপকৃত হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবার পরস্পর বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তির অস্তিত্ব যেমন বিপন্ন হতে বাধ্য, তেমনি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গোষ্ঠী ও জাতির অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

২) ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে অর্থনীতির ভিত্তি ঃ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে মানব সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় বিষয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে বাজার অর্থনীতির ভিত্তি ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

৩) মুনাফা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি ঃ মুনাফা হচ্ছে যাবতীয় অর্থনৈতিক তৎপরতার চালিকাশক্তি; কেবল জীবিকা অর্জন নয়, বরং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বাহনও হচ্ছে মুনাফা। কৃষক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে জমি চাষ ও বীজ বপন করে। আশা যে,

www.icsbook.info

বিনিময়ে সে অধিক ফসল পাবে। শ্রমিক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার শ্রম বিনিয়োগ করে; বিনিময়ে মজুরী পায়, যার দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে। শিল্পপতি তার মেধা ও অর্থ খাটিয়ে ছোট-বড় কারখানা গড়ে তোলে; উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে লাভ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ী পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়তো লাভ পাবার উদ্দেশ্যেই। অপরপক্ষে লক্ষ্য করা যায় যে, মুনাফার সম্ভাবনা নেই এমন কাজে হাত দিতে কেউ উৎসাহবোধ করে না; সেসব কাজে বিনিয়োগ করতে কেউ এগিয়ে আসে না।

৪) মুনাফা উন্নতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি ঃ বাজার অর্থনীতিতে মুনাফার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুনাফাই হচ্ছে জীবিকা অর্জনের বৈধ ও সম্মানজনক পথ। মুনাফাই অর্থনৈতিক কাজে উৎসাহ যোগায় ও উদ্বুদ্ধ করে। দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মূল প্রেরণাই হচ্ছে মুনাফা। মুনাফা ছাড়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম স্থবির ও অচল হয়ে পড়তে বাধ্য।

৫) মুনাফা কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যকীয় ঃ জীবিকা অর্জন ও সম্পদ আহরণের পথ হিসেবে ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে ব্যবসাকে সর্বাধিক লাভজনক ও কল্যাণকর এবং সবচেয়ে মহৎ কাজ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে একটি সামাজিক দায়িত্ব (Social obligation)।

৬) ব্যবসা-বাণিজ্য ফরজে কিফায়া ঃ ইসলামী আইনবেত্তাগণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে ফরজে কিফায়া[৭৯] ঘোষণা করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করা মুসলমানদের ওপর সামগ্রিকভাবে অবশ্যপালনীয়। সমাজের সকল ব্যক্তি অথবা সকলের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এ দায়িত্ব অবশ্যই আঞ্জাম দিতে হবে; অন্যথায় সমাজের সকলকেই এ দায়িত্ব অবহেলা করার দায়ে দায়ী হতে হবে।

৭) মুনাফা আল্লাহর অনুগ্রহ ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুনাফাকে আল্লাহর অনুগ্রহ আখ্যায়িত করেছেন এবং মানব জাতির উপকারার্থে নদী, সাগর ও মহাসাগরে জাহাজ, নৌকার মাধ্যমে মালামাল পরিবহনের ওপর বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় বলে ঘোষণা করেছেন।

৮) জীবিকা অর্জন করা ফরজ ঃ আল-কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে আল্লাহর অনুগ্রহ রূপে মুনাফা অর্জনে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আল-কুরআন বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে জাহাজ তৈরীর উপকরণ দান করেছেন এবং নদী, সাগর ও মহাসাগরকে তাদের কল্যাণার্থে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, "তিনিই– যিনি তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা হতে নতুন তাজা গোশ্ত আহরণ করে খেতে পার এবং এমন সব

---

[৭৯] নুর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯।

www.icsbook.info

সৌন্দর্য-শোভার জিনিস বের করে নিতে পার যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা দেখছ যে, নৌকা-জাহাজ নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে চলাচল করে। এসব কিছু এজন্য যে, তোমরা তোমাদের আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করে নিবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।" (১৬ঃ১৪) আবার সূরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের রব তো তিনিই যিনি নদী-সমুদ্রে তোমাদের নৌকা-জাহাজ চালাচ্ছেন যেন তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। আসল কথা হচ্ছে, তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।" (১৭ঃ৬৬)

এছাড়া, মানুষ যাতে তাদের জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর যমীনকে মানুষের অধীন করে দেওয়ার কথাও বলেছেন। সূরা আল-মূলক-এ বলা হয়েছে, "সেই আল্লাহই তো তোমাদের জন্য ভূগোলককে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, যাতে তোমরা এর বক্ষের ওপর চলাচল কর এবং তা থেকে আল্লাহর দেয়া রিযক খাও।" (৬৭ঃ১৫) বস্তুতঃ ইসলাম প্রত্যেক উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে তার নিজের এবং অধীনস্থদের জন্য জীবিকা অর্জন করা ফরজ করে দিয়েছে।

৯) পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন পৃথক নয় ঃ সর্বোপরি ইসলাম মানবজীবনের আধ্যাত্মিক আর বস্তুগত দিককে আলাদা আলাদা অংশে বিভক্ত করে দেয়নি; বরং আধ্যাত্মিক পিপাসার পাশাপাশি বস্তুগত প্রয়োজনকে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল-কুরআন দিনের বেলার সময়কে মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহার করার জন্য তাকিদ করেছে। একদিকে সময়মত নামায, বিশেষ করে, জুময়ার নামায আদায় এবং জুময়ার নামাযের আযান হলেই বেচাকেনা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে; অন্যদিকে নামায সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে জীবিকা অন্বেষণের কাজে লেগে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছে। বলা হয়েছে, "ওহে যারা ঈমান এনেছ, জুময়ার দিন যখন নামাযের জন্য ডাক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনাবেচা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম, যদি তোমরা জান। পরে যখন নামায সম্পূর্ণ হবে তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর।" (আল- কুরআনঃ ৬২ঃ৯-১০)

১০) হাদীসের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসেও ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যবসায়ী দল যদি সত্য কথা বলে এবং উপদেশ দেয়, তাহলে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়; কিন্তু যদি তারা ঠকায় এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ব্যবসা বরকত বঞ্চিত হয়।"[৮০] নবী (সাঃ) আরও বলেছেন, সত্যবাদী, আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি (কেয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের দলে থাকবেন।"[৮১] সুতরাং ইসলামে গুরুত্বের দিক থেকে ব্যবসা আর জিহাদকে আলাদা করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

---

৮০. বুখারী ও মুসলিম, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।

৮১. তিরমিযী, পৃঃ ৩৬৭, হাদীস নং ১১৪৭, দারেমী, দারা কুতনী, উদ্ধৃত, মিশকাত শরীফ, ২৬৭৪।

www.icsbook.info

রিবা বা সুদ

সুদের অর্থ, সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে প্রথমে তদানীন্তন জাহেলী আরবে যে *রিবা* প্রচলিত ছিল, যে *রিবা* উচ্ছেদ করার জন্য আল-কুরআনের আয়াত নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে *রিবা* উচ্ছেদ করেছেন, সেই *রিবার* ধরন-প্রকৃতি জানা দরকার।

জাহিলী যুগে রিবা

সম্মানিত মুফাস্‌সিরীনে কিরাম, ফক্বীহবৃন্দ, গবেষক, স্কলার ও অর্থনীতিবিদগণ ইসলামপূর্ব যুগে বিশেষ করে, আরব দেশে প্রচলিত সুদী লেনদেনের চিত্র তুলে এনেছেন। এতে দেখা যায়, সে যুগে ঋণ, দেনা, এমনকি নগদ ক্রয়-বিক্রয়েও *রিবা* লেনদেন হতো। নিচে তার কতিপয় তথ্য পেশ করা হলো :

বাকি ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে রিবা

ঋণ বা কর্যের ওপর রিবা

জাহিলী যুগে ঋণের ওপর যে *রিবা* লেনদেন করা হতো সে ব্যাপারে ফখরউদ্দীন আল-রাযি লিখেছেন, "জাহিলী যুগে আরবরা অর্থ ধার দিতো এবং এর ওপর মাসে মাসে নির্ধারিত পরিমাণ *রিবা* আদায় করতো, কিন্তু আসল পরিমাণটা পাওনা থেকেই যেতো। অতঃপর মেয়াদ শেষ হলে ঋণদাতা তার আসল ফেরত চাইতো। ঋণগ্রহীতা আসল ফেরত দিতে না পারলে ঋণদাতা পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধির বিনিময়ে সময় বাড়িয়ে দিতো। এটাই ছিল জাহিলী যুগের *রিবা* যা তারা লেনদেন করতো"।[১]

আবূ বকর আল জাস্‌সাস লিখেছেন, "আরবরা যে *রিবার* সাথে পরিচিত ছিল এবং যে *রিবা* লেনদেনে তারা অভ্যস্ত ছিল তা হচ্ছে, তারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য দিরহাম ও দীনার ঋণ দিতো এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করতো।" তিনি আবার বলেছেন, "এটা সুপরিজ্ঞাত যে, জাহিলী *রিবা* ঋণের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত, আর এই অতিরিক্ত ধার্য করা হতো প্রদত্ত মেয়াদের বিনিময়ে।"[২]

---

১. আল-রাযিঃ *আল তাফসীর আল কবীর*, ভলি-৭, তেহরান, পৃঃ ৯১; উদ্ধৃত উসমানী, মুহাম্মদ তকি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫।

২. আল-জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, ভলি-১, লাহোর, ১৯৮০, পৃঃ ৪৬৫।

www.icsbook.info

ইবনে জরীর আল-তাবারি যায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তি যদি কারও কাছ থেকে উট ধার করত, তাহলে মেয়াদ শেষে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট গিয়ে বলতো, 'তুমি আমার পাওনা পরিশোধ করবে, না এর পরিমাণ বৃদ্ধি করবে'? যদি ঋণগ্রহীতার কাছে কিছু থাকত সে তা নিয়ে নিতো, অন্যথায় ঋণদাতা তার পাওনা বাড়িয়ে এর পরবর্তী বয়সের উটে উন্নীত করে দিত; প্রদত্ত উটটি *বিনতে মাখাদ** হলে দ্বিতীয় বছর সে *বিনতে লাবুন** দাবী করত, তার পরবর্তী বছর দাবী করত *হিক্কাহ**, এর পরে *জাযাআহ**, এর পরের বছর পরিশোধ না করলে সে চার বছর বয়সের উট দাবী করত এবং এভাবে উটের বয়স বাড়াতে থাকত। দেনা যদি 'আইন' (দীনার বা দিরহাম) হতো পাওনাদার দেনাদারের কাছে গিয়ে বলতো, তুমি পাওনা পরিশোধ কর অথবা পরবর্তী এক বছর মেয়াদের জন্য তা দ্বিগুণ কর। এভাবে পরিশোধ করা না হলে প্রতি বছরই পূর্ববর্তী বছরের পাওনার পরিমাণকে দ্বিগুণ করা হতো। পাওনা যদি ১০০ হতো, দ্বিতীয় বছর তা দুশো করা হতো। পরের বছর এই পরিমাণ পরিশোধ না করলে তৃতীয় বছর একে চারশোতে উন্নীত করা হতো; এভাবে দাতা হয় তার পাওনা আদায় করে নিতো অথবা প্রতি বছর এর পরিমাণ দ্বিগুণ করে ধার্য করে দিত।"[৩]

আল-মুয়াফাক্বাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জাহিলী *রিবা* এমন ছিল যার মাধ্যমে মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধ করা না হলে মূল দেনাকে বৃদ্ধি করে বড় আকারের নতুন দেনা সৃষ্টি করা হতো।"[৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম শওকানী লিখেছেন, "সেকালে লোকেরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদী কারবার করত; তারা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের ভিত্তিতে মূলধন লগ্নি করত। সেই মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে মূলধনকে বাড়িয়ে ধরা হতো সেই মেয়াদ পর্যন্ত প্রাপ্য সুদকে মূলধনের সাথে যোগ করে। অতঃপর এই বাড়তি মূলধনের ওপর সুদের হিসাব করা হতো। এভাবে যতবারই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হতো ততবারই মূলধন ও সুদের হিসাব বাড়িয়ে ধরা হতো।"

আতা'র সূত্রে আল-তাবারি আরও একটি বর্ণনা লিখেছেন যে, "জাহিলিয়্যাতের যুগে বনি মুগীরা গোত্র বনি সাকিফ গোত্রের কাছ থেকে ধার নিতো। মেয়াদ শেষে বনি সাকিফ

---

* বিনতে মাখাদ হচ্ছে, যে উষ্ট্রী শাবকের (মাদী) বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে; বিনতে লাবুন– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে; হিক্কাহ– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে এবং গর্ভ ধারণক্ষম হয়েছে; জাযাআহ্– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বর্ষ শুরু হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০৭, পৃঃ ৪৪৬।)

৩. ইবনে জারীর আল-তাবারিঃ *জামি আল বয়ান*, ভলি-৪, পৃঃ ৫৯; উদ্ধৃতঃ বাদাবী, যাকি আল-দ্বীনঃ *Theory of Prohibited Riba;* ইংরেজী অনুবাদঃ ইমরান আহসান খান নিয়াজী, info@nyazee.com, ডিসেম্বর ৪, ২০০০, পৃঃ ৩৮-৩৯।

৪. আল-শাতিবী, আবূ ইসহাক, *আল-মুয়াফাক্বাত*, ভলি-৪, পৃঃ ৪০; উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।

www.icsbook.info

গোত্র বনি মুগীরাকে বলতো, 'তোমরা যদি আমাদের পাওনা পরিশোধ বিলম্বিত কর, তাহলে আমরা তোমাদের দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবো' ।"[৫]

দেনার ওপর রিবা

তাবারি কাতাদাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "নির্ধারিত সময়ে দাম পরিশোধ করার শর্তে কোন ব্যক্তি অপর কারও কাছে বাকিতে পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করত; মেয়াদ শেষে ক্রেতা বকেয়া দাম পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সে তার দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতো আর অপর পক্ষ মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিতো ।"[৬] আল-যাহ্হাকের সূত্রে তিনি আরও লিখেছেন, "জাহিলী যুগে তাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে *রিবা* উদ্ভূত হতো ।"[৭]

সুয়ূতি তাঁর *আল-দুররু আল মানসুরে* মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, "তারা (জাহিলী যুগের আরবরা) বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করতো । দেনা পরিশোধের মেয়াদ শেষে এক পক্ষ তাদের দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত আর অপর পক্ষ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিত ।"[৮]

সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন, "কোন ব্যক্তির দেনা পরিশোধের সময় হলে দেনাদার পাওনাদারকে বলতো, "আমার জন্য দেনা পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবো" । তাদেরকে যখন বলা হতো যে, এটা তো *রিবা*; উত্তরে তারা বলতো, "বাকি বিক্রয়ের সময়ে দাম বাড়িয়ে ধরা হোক বা মেয়াদ শেষে দেনার পরিমাণ বাড়ানো হোক উভয় বৃদ্ধি তো একই ।"[৯]

মুজাহিদের সূত্রে তাবারি আরও বলেছেন যে, "জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তির যদি অন্য কোন ব্যক্তির কাছে কোন দেনা থাকতো, তাহলে মেয়াদান্তে দেনাদার পাওনাদারকে বলতো 'তুমি আমার কাছে এই পাবে । আমাকে পরিশাধের সময় বাড়িয়ে দাও, আমি আমার দেনার পরিমাণ এত এত বাড়িয়ে দেবো' ।"[১০]

সুয়ূতি লিখেছেন, "ইবনে আবি হাতিম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে যুবায়ের বলেছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছে কোন সম্পদ পাওনা থাকলে, মেয়াদান্তে পাওনাদার দেনাদারকে তার পাওনা পরিশোধ করতে বলতো । দেনাদার বলতো, আমাকে সময়

---

৫. আল-তাবারিঃ *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৫; *দার আল-মানসুর*, ভলি-২, পৃঃ ৭১; উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯-৪০ ।

৬. আল-তাবারিঃ *পূর্বোক্ত*, ভলি-৩, পৃঃ ৬৭; উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১ ।

৭. উপরোক্ত ।

৮. আল-সুয়ূতিঃ পূর্বোক্ত, ভলি-২, পৃঃ ৭১; উদ্ধৃত, বাদাবী, উপরোক্ত, পৃঃ৪০ ।

৯. আল-সুয়ূতিঃ উপরোক্ত, ভলি-১, পৃঃ ৩৬৫; উদ্ধৃত, উপরোক্ত, পৃঃ৪০-৪১ ।

১০. আল-তাবারিঃ পূর্বোক্ত, ভলি-৩, পৃঃ ৬৭; উদ্ধৃত, ইবিদ, পৃঃ৩৯ ।

www.icsbook.info

বাড়িয়ে দাও, আমি আমার দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেবো। তারা উভয়ে এতে সম্মত হয়ে যেতো। এটাই ছিল দ্বিগুণ, বহুগুণ *রিবা*।"[১১]

এভাবে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রথমে পণ্যের দাম বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হতো যা আসল দামের সাথে একীভূত হয়ে যেত। অতঃপর দেনাদার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রতিবার মেয়াদ বৃদ্ধি করার বিনিময়ে দেনার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হতো যাকে নির্ধারিত *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে বিনিময়হীন বৃদ্ধি বা *রিবা* বলা হতো। এজন্য আল-শাফিঈ, আল-বায়হাকি ও আল-জারকানির ন্যায় ফক্বীহ ও হাদীসবেত্তাগণ বলেছেন যে, জাহিলী যুগের *রিবা* হতো ক্রয়-বিক্রয় বা বাই থেকে।

নগদ ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে রিবা

ইতিহাস ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, তদানীন্তন আরবে আরও কতিপয় *রিবার* লেনদেন প্রচলিত ছিল। আরবরা সচরাচর সেসব লেনদেন করত; কিন্তু সেটা যে *রিবা* তা তারা জানতো না এবং একে *রিবা* বলতো না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেসব লেনদেনকে *রিবা* বলে ঘোষণা করেছেন এবং সেরূপ লেনদেন না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ লেনদেনের কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে ঃ

ক) ***সমজাতীয় মুদ্রা নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবাঃ*** জাহিলী যুগে আরব দেশে মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ছিল দীনার ও দিরহাম। দীনার হলো স্বর্ণমুদ্রা আর দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা। আরবরা দীনারের পরিবর্তে দীনার এবং দিরহামের পরিবর্তে দিরহাম পরিমাণে কম-বেশি করে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করত। তারা এরূপ করত মুদ্রার গুণ ও মানগত পার্থক্যের কারণে। এরূপ কেনাবেচার কথা হাদীসেও উল্লেখ আছে। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, "খাইবারের দিন আমরা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে ছিলাম। আমরা ইহুদীদের সাথে এক *উকিয়া* স্বর্ণ দুই অথবা তিন দীনারের বিনিময়ে কেনাবেচা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা সমান সমান ওজন ছাড়া স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করো না।" (মুসলিম) (চল্লিশ দিরহামের সমান ওজনকে এক *উকিয়া* বলা হয়।)

খ) সমজাতের পণ্য নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবাঃ জাহিলী যুগে আরব দেশের লোকেরা কোন একজাতের নিম্নমানের পণ্যের সাথে একই জাতের উন্নত মানের পণ্য পরিমাণে কম-বেশি করে বিনিময় করত। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে, নিম্নমানের খেজুরের সাথে উন্নত মানের খেজুর বিনিময়ের উল্লেখ বেশ কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুদ অধ্যায়ে সুদ সংক্রান্ত হাদীসের ক্রমিক নং ৭৫ থেকে ৮০ নম্বরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো দ্রষ্টব্য।

---

১১. জালাল আল-দ্বীন আল-সুয়ূতিঃ *আল-দুররর আল মনসুর*, ভলি-২, পৃঃ ৭১; উদ্ধৃত, বাদাবী, উপরোক্ত, পৃঃ ৩৯।

www.icsbook.info

গ) অসমজাতের পণ্য নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা ঃ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জাহিলী যুগে আরবরা নিলামে মাল বেচাকেনা করত। এ ব্যাপারে কখনও কখনও বিক্রেতার পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত দালাল মিথ্যা ডাক দিয়ে নিলামের পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিত। ফলে ক্রেতা উক্ত ডাকের ওপরে দাম বাড়িয়ে ডাক দিতে বাধ্য হতো। এভাবে প্রতারণামূলক ডাকের মাধ্যমে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে প্রকৃত দামের চেয়ে বেশি দাম আদায় করে নিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে বর্ধিত দামকে *রিবা* আখ্যায়িত করেছেন এবং মিথ্যা ডাকদাতাকে 'অভিশপ্ত *রিবা* গ্রহীতা' বলে নিন্দা করেছেন। (হাদীস নম্বর ৮৭ দ্রষ্টব্য)

এ ছাড়া সুপারিশের বিনিময়ে উপহার গ্রহণ, প্রতারণা করে দাম বেশি নেওয়া এবং অনবহিত লোককে ঠকানো হলে তাকেও রিবা বলা হয়েছে। হাদীস থেকে একথাও পাওয়া যায় যে, রিবার ৭০/৭৩ টি ধরন রয়েছে। (হাদীস নম্বর ১১৪-১১৫ এবং ৮৬-৯৮ দ্রষ্টব্য)

উল্লেখিত তথ্যাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম পূর্ব যুগে আরবরা অর্থ (দিরহাম-দীনার), সোনা-রূপা, অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী এমনকি উট দ্বারা ঋণ লেনদেন করত এবং ঋণের ওপর *রিবা* ধার্য করত। দ্বিতীয়ত, তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতের অর্থ ও পণ্য-সামগ্রী বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করত। ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে উক্ত দেনা পরিশোধ করতে না পারলে বিক্রেতা পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে তার পাওনার পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। তৃতীয়ত, একই জাতের অর্থ বা পণ্য পরিমাণে কম-বেশি করে নগদ বেচাকেনা করা হলে সেই বৃদ্ধিকেও *রিবা* বলা হয়েছে। চতুর্থত, প্রতারণামূলক বর্ধিত দাম ও সুফারিশের পারিতোষিককেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) *রিবা* ঘোষণা করেছেন। হাদীস থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, *রিবার* আরও বহু ধরন চালু ছিল।

উক্ত তথ্যাবলী থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ঋণ ও দেনার ওপর *রিবা* ধার্য ও লেনদেন করার পদ্ধতি ও রূপও ছিল বিভিন্ন।

প্রথমত, ঋণদাতা ঋণ প্রদানের সময়ই তার পাওনার ওপর অতিরিক্ত দাবী করত এবং ঋণগ্রহীতা অতিরিক্ত দিতে রাজী হলে ঋণদাতা উক্ত বর্ধিত পরিমাণসহ ঋণ ফেরতের শর্তে ঋণ প্রদান করত। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে অতিরিক্তসহ দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণদাতা তার মোট পাওনার (*কাউন্টার ভ্যালু* + অতিরিক্ত) ওপর আবার অতিরিক্ত ধার্য করে সময় বাড়িয়ে দিত।

দ্বিতীয়ত, ঋণদাতা মাসিক ভিত্তিতে অতিরিক্ত ধার্য করত এবং মাসে মাসে তা আদায় করত। আর ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আসল পাওনার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকত। অতঃপর মেয়াদান্তে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে আবারও মাসে মাসে অতিরিক্ত পরিশোধের শর্তে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত।

www.icsbook.info

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, "সকল প্রকার সুদী লেনদেনের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হচ্ছে, দেনার আসলের ওপর একটি অতিরিক্ত পরিমাণ (ফদল) ধার্য করা। দেনা কখনও বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্টি হতো, কখনও বা ঋণ বা *কর্জ* থেকে দেনা সৃষ্টি হতো। সব ক্ষেত্রেই বর্ধিত অতিরিক্ত অংশকে বলা হতো *রিবা*। কারণ, *রিবা* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি (ফদল)।"[১২] এমনকি, সমজাতের ও অসম জাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে মানের তারতম্যের কারণে বা প্রতারণামূলকভাবে এক পক্ষের নির্ধারিত দামের ওপর বর্ধিত অংশকেও বলা হয়েছে রিবা।

এতে আরও লক্ষণীয় যে, এই বৃদ্ধি ধার্য করা হতো ঋণগ্রহীতা বা দেনাদারের দেনার ওপর যার বিনিময়ে পাওনাদার দেনাদারকে কিছুই দিতো না; অর্থাৎ *রিবা* হচ্ছে বিনিময়হীন।

আর বিনিময় ছাড়া এই অতিরিক্ত (ফদল) দেনাদার পরিশোধ করতে বাধ্য হতো শুধুমাত্র তার সম্মতির কারণে। ঋণদাতা বা বাকি বিক্রেতা অতিরিক্ত দাবী করতো, ঋণগ্রহীতা বা বাকি ক্রেতা সম্মত হতো। এভাবে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত ধার্য ও লেনদেনের চুক্তি হয়ে যেতো। এই চুক্তি হচ্ছে *রিবার* উৎস। *রিবার* ওপর ঋণদাতার অধিকার সৃষ্টি হতো চুক্তি বলে; আর ঋণগ্রহীতা *রিবা* পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতো এই চুক্তির কারণেই (তার সম্মতির কারণে)।

সুতরাং রিবার মৌলিক যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল তা হচ্ছে ঃ

তদানীন্তন রিবার বৈশিষ্ট্য

ক) নির্ধারিত মূল্যের ওপর (বাকি বা নগদ) বৃদ্ধি ধার্য করা;

খ) অপরপক্ষ এই বৃদ্ধির বিনিময় বা প্রতিমূল্য না দেওয়া; এবং

গ) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষ এতে সম্মত হওয়া (চুক্তি করা)।

---

[১২] উসমানী, মোহাম্মদ তকিঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।

www.icsbook.info

রিবার অর্থ, সংজ্ঞা, শ্রেণীবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য

রিবার আভিধানিক অর্থ

নির্ভরযোগ্য অভিধানসহ আল-কুরআনের তাফসীরকার, হাদীস বিশারদ, ফিক্বাহবিদ, স্কলার ও অর্থনীতিবিদ সকলেই একমত যে, *রিবা* শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, বাড়তি, অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত (surplus), বেশি, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি, উঁচু হওয়া, ফুলে উঠা, লাভ (gain), বহুগুণ হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, পাওনার চেয়ে বেশি নেওয়া, একদিকে বৃদ্ধি অন্যদিকে বৃদ্ধি ছাড়াই ইত্যাদি।

বিখ্যাত আরবী অভিধান *লিসান আল-আরব রিবার* শাব্দিক অর্থ লিখেছে, "বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি।"[১৩] আল যাবিদি তাঁর *তাজ আল-আরুস* এবং ইমাম রাগিব আল ইস্পাহানি তাঁর *মুফরাদাত আল-কুরআনেও রিবার* এই একই অর্থ লিখেছেন। এছাড়া প্রাচীন তাফসীরকারদের সকলেই *রিবার* অনুরূপ অর্থ করেছেন।[১৪]

Advanced-Learner Dictionary-তে (1989:564) *রিবা* শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে, "excess, addition and surplus" "মাত্রাতিরিক্ত, অতিরিক্ত সংযোজন, উদ্বৃত্ত।" আর ক্রিয়াপদে এর অর্থ করা হয়েছে, "to increase, to exceed, to exact more than was due, to practise *usury*."[১৫] "বৃদ্ধি করা; মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া, পাওনার চেয়ে বেশি আদায় করা, সুদ খাওয়া।"

Lane's Lexicon *রিবার* অর্থ লিখেছে, "to increase, to augment, swelling, forbidden, addition, to take more than what is given, the practising or taking of *usury* or the like, an excess, or an addition, an addition over and above the principal sum (that is lent or expended)."[১৬] "বৃদ্ধি করা, বাড়ানো, স্ফীত করা, নিষিদ্ধ-বেআইনী, অতিরিক্ত, সংযোজন, যা প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক গ্রহণ করা, সুদ খাওয়া বা সুদ গ্রহণ করা অথবা অনুরূপ, অতিরিক্ত, বাড়তি সংযোজন, মূল পরিমাণের (যা ধার দেওয়া হয়েছিল বা ব্যয় করা হয়েছিল) ওপর অতিরিক্ত সংযোজন।"

আল্লামা মওদূদী বলেছেন যে, "*রিবা* শব্দের মূলে আছে আরবী ভাষার ('রা-বা-ওয়াও') এই তিনটি হরফ। কুরআন মজীদে এই মূল থেকে নির্গত শব্দাবলী যত জায়গায়

---

১৩. ইবনে মনযুর, *লিসান আল-আরব*, ১৯৬৮।

১৪. চাপরা, এম, উমর, *Prohibition of Interest: Does it Make Sense?* Islamic Dawah Movement (IDM) Publications, Southern Africa, 2001, p. 2, Foot note-3.

১৫. উদ্ধৃত ঃ সিদ্দিকী, শহীদ হাসান *Riba, Usury and Interest- Historical and Quranic Concept*, Journal of Islamic Banking and Finance, Oct.-Dec., 1993, p. 44.

১৬. Lane's Lexicon 1874; উদ্ধৃত, ইবিদ।

www.icsbook.info

ব্যবহৃত হয়েছে সেই সকল স্থানেই এ থেকে বৃদ্ধি, উচ্চতা, বিকাশ ইত্যাদি অর্থ পাওয়া যায়।"[১৭] এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের *শরীয়াহ আপীলেট* বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়েছে, "In the Quran, the word signifies 'to rise', 'at a height', 'to increase', 'to prosper', 'to swell', 'to nurture', 'to raise', 'to grow', and 'augmentation' or 'increase in power'." "আল-কুরআনে শব্দটি ওপরে উঠা, উচ্চতা, বৃদ্ধি করা, উন্নতি করা, স্ফীত হওয়া, পুষ্ট করে তোলা, উঁচু করা, বড় হওয়া এবং বাড়ানো বা শক্তি বেশি হওয়া ইত্যাদি অর্থ বুঝানো হয়েছে।" আবার বলা হয়েছে, "Federal Shariat Court records that the term *riba*, in its various linguistic forms, occurs at about twenty places in the Quran."[১৮] "ফেডারেল শরীয়ত আদালত লিখেছে যে, ভাষাগত বিভিন্ন রূপে রিবা শব্দটি কুরআন মজীদে বিশটির মত স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।" নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

১. "যখন আমরা তার ওপর পানি বর্ষণ করলাম তখন তা সতেজ হলো ও ফুলে উঠলো (*রাবাত*)।" (সূরা আল-হজ্জ-২২:৫)
২. "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদাকাহকে ক্রমবৃদ্ধি (*ইউরবি*) দান করেন।" (সূরা আল-বাকারাহ- ২:২৭৬)
৩. "আবার যখন প্লাবন আসলো তখন উপরিভাগে (*রাবিয়ান*) ফেনাও জেগে উঠলো।" (সূরা আল-রায়াদ- ১৩:১৭)
৪. "যেন এক জাতি অপর জাতি অপেক্ষা অগ্রসর (*আরবা*) হয়ে যায়।" (সূরা আল-নাহল- ১৬:৯২)
৫. "তিনি তাদেরকে কঠোর-কঠিনভাবে (*রাবিয়াতান*) পাকড়াও করলেন।" (সূরা আল-হাক্কাহ্- ৬৯:১০)
৬. "এবং তাদেরকে (মরিয়ম ও ঈসা) একটি উচ্চ স্থানে (*রাবওয়াতেন*) আশ্রয় দিলাম।" (সূরা আল-মুমিনুন- ২৩:৫০)
৭. "লোকদের অর্থের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি (*ইউরবি*) পাবে এজন্য তোমরা যে সুদ দাও, তা আল্লাহর কাছে বাড়ে (*ইয়ারবু*) না।" (সূরা আল-রূম- ৩০:৩৯)

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে তিন ধরনের বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ ১) নিজ পরিমাণে বৃদ্ধি, ২) তুলনামূলক বৃদ্ধি এবং ৩) মানগত বৃদ্ধি। সামি হামুদ বলেছেন, "এই বৃদ্ধি খাঁটি ভাষাগত অর্থে কোন বস্তুর নিজ পরিমাণ বেড়ে যাওয়া হতে পারে, অথবা দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনামূলকভাবে একটির পরিমাণ অপেক্ষা অপরটির পরিমাণ

---

১৭. মওদূদী, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, বাংলা অনুবাদ, আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৮৪।

১৮. *Sharia Law Report*, February, 2000, Lahore, Vol. 01, No. 02, Pakistan, p. 10.

www.icsbook.info

বৃদ্ধি পাওয়া হতে পারে, অথবা গুণ-মানের তুলনায় একটি বস্তু অপর একটি বস্তু হতে উন্নততর হওয়াও এর অর্থ হতে পারে।"[১৯]

ইমাম আল-ওয়াহিদী ওপরে ১ নম্বরে উল্লেখিত আয়াত ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এখানে মাটি 'ফুলে-উঠলো'কে '*রাবাত*' বলা হয়েছে। এ *রাবাত* থেকে মাটির নিজস্ব আকৃতি সম্প্রসারিত ও বৃদ্ধি পাওয়া অর্থ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে ২ নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে '*ইউরবি*' শব্দ দ্বারা যাকাতের নিজস্ব পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ৪ নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত '*আরবা*' শব্দ দ্বারা এক জাতির তুলনায় অপর জাতি সংখ্যায় বেশি এবং মানে উন্নততর হওয়া বুঝা যায়। এখানে পরিমাণগত ও মানগত উভয় বৃদ্ধিকেই বুঝানো হয়েছে।[২০] এ প্রসঙ্গে আল-তাবারি বলেছেন, আরবীতে সাধারণত বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের চেয়ে ভাল (*আরবা*); এই বাক্যে '*আরবা*' শব্দ দ্বারা মানগত অগ্রসরতার কথাও বুঝানো হয়।[২১] তৃতীয়ত, ৫ নম্বরে উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত '*রাবিয়াতান*' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তির তুলনায় ফেরাউনের শাস্তি যে অধিক কঠিন ও কঠোর ছিল তাই বুঝিয়েছেন।[২২] এ প্রসঙ্গে আল-তাবারি বলেছেন যে, পাহাড়কে '*রাবিয়া*' বলা হয়; কারণ পাহাড় ভূমির চেয়ে উচ্চতায় বড়।[২৩]

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসেও *রিবা* শব্দের এইরূপ বিভিন্ন দিক থেকে বৃদ্ধি অর্থ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এক হাদীসে কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, "একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন তখন দেখলেন, খাদ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, পাত্র থেকে যে পরিমাণ খাবার তুলে নেওয়া হচ্ছিল, নিচ থেকে খাবার বৃদ্ধি পেয়ে তত পরিমাণ আবার পূরণ হচ্ছিল।"[২৪] উক্ত সাহাবী এখানে '*রাবা*' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং এর দ্বারা খাদ্যের নিজস্ব পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "*আল-ফেরদৌস* হচ্ছে *আল-রাবওয়াহ*।"[২৫] এখানে *রাবওয়াহ্* শব্দ দ্বারা জান্নাতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় *ফেরদৌসের* উত্তম ও সর্বোচ্চ হওয়া বুঝানো হয়েছে।

---

[১৯] Sami Hamaud (1985), *Islamic Banking*, Arabian Information, London, p. 67, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

[২০] M. Al-Sharaf Al-Nawawi, *al-Tahzib Al-Asthma Wallughat*; Section-2, Vol. 1, p. 118, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

[২১] উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

[২২] M. Al-Sharaf Al-Nawawi, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

[২৩] আল-তাবারি ঃ *আল-হাক্ব*, আয়াত ১০, ভলি-১২, পৃঃ ৩৪, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

[২৪] আল-বুখারী, *মুয়াক্বিত*, পৃঃ ৭৯; উদ্ধৃত, ই, এম, নূর; পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

[২৫] উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

www.icsbook.info

দেখা যাচ্ছে, *রিবা* শব্দের অর্থের মধ্যে উপরোক্ত তিন ধরনের বৃদ্ধিই সন্নিহিত আছে। অর্থাৎ *রিবা* অর্থ বৃদ্ধি; এই বৃদ্ধি পরিমাণগত হতে পারে, মানগত হতে পারে; বস্তুর নিজ পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া হতে পারে, আবার অপর বস্তুর তুলনায় পরিমাণ ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়াও এর অর্থ হতে পারে।

অপরাপর ভাষায় রিবার প্রতিশব্দ

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিশব্দ থেকেও *রিবার* এই একই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় *মুফাস্‌সিরদের* অনেকেই বলেছেন যে, ইহুদীদের ওপর যে *রিবা* নিষিদ্ধ ছিল তা তদানীন্তন আরবে প্রচলিত *রিবার* অনুরূপ ছিল। আল-তাবারি ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ *রিবার* ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "তারা (ইহুদীরা) যে *রিবা* গ্রহণ করতো তা ঋণের আসল পরিমাণের ওপর অতিরিক্ত হিসেবে ধার্য করা হতো।"[২৬] ...ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্ট দায়ের ওপর ধার্য করা হতো।"[২৭]

বাদাবী এ প্রসঙ্গে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে প্রচলিত *রিবা* (তাওরাতে নিষিদ্ধ *রিবা*) এবং জাহিলী যুগে প্রচলিত (আল-কুরআনে নিষিদ্ধ) *রিবার* তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, উভয় *রিবা* ছিল এক ও অভিন্ন। তিনি বলেছেন ঃ

"আল-কুরআন সেই *রিবাকেই* নিষিদ্ধ করেছে যা ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আর আজও ইহুদীদের মধ্যে সেই *রিবাই* চালু রয়েছে; কারণ প্রাচীনকালে *রিবার* প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য যা ছিল এখনও তাই আছে- এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। এভাবে ইহুদীদের মধ্যে বর্তমানে যে *রিবা* চালু আছে তা হচ্ছে, ঋণের ওপরে সময়ের ভিত্তিতে ধার্যকৃত অতিরিক্ত, যদিও *রিবার* হারে পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং আল-কুরআন যে *রিবাকে* নিষিদ্ধ করেছে তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল।" গবেষকগণ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ/পরিভাষার অর্থের সাথে *রিবার* অর্থের মিল থাকার কথাও তুলে ধরেছেন।

এক্সোডাস ও ডিটারোনমিতে বাইবেলীয় হিব্রু ভাষায় সুদকে বলা হয়েছে '*নেশেখ*'; আর *লেভিটিকাসে* '*টারবিট*' বা '*মারবিট*' শব্দের সাথেই '*নেশেখ*' শব্দ বসানো হয়েছে।[২৮] "নেশেখ অর্থ হচ্ছে *gain* যা অর্থ, পণ্য-সামগ্রী বা যে কোন প্রকার সম্পদ-সম্পত্তি ঋণ দিয়ে তার ওপর অর্জন করা হয়।"[২৯] *এনসাইক্লোপেডিয়া জুডাইকায়* নেশেখের অর্থ করা হয়েছে '*bite*'; আর শব্দটি সুদ খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হতো।[৩০]

---

২৬. আল-তাবারি, *জামি আল-বয়ান*, ভলি-৬, পৃঃ ১৭; উদ্ধৃত, বাদাবী , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৮।

২৭. বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯-৮০।

২৮. বাদাবী, উপরোক্ত, মাহবুব উল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫।

২৯. Siddiqui, Dr. Shahid Hasan, *Riba, Usury and Interest – Historical & Quranic Concept*, Journal of Islamic Banking & Finance, Vol. 10, No. 04, October-December 1993, p. 44.

৩০. Cohn. H. Harvey, *USURY: Encyclopedia Judaica*, Jerusalem: Keter Publishing House, p. 17. উদ্ধৃত করেছেন, Mehboob ul Hassan, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

www.icsbook.info

রিবার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে *Interest* ও *Usury. Interest* মধ্য যুগীয় ল্যাটিন শব্দ *Interesse* থেকে নির্গত হয়েছে। আর ল্যাটিন শব্দ *usura* থেকে এসেছে *Usury*।[৩১] *Interesse* অর্থ হচ্ছে আসলের ওপর বৃদ্ধি। *Usura* মানে হচ্ছে প্রদত্ত ঋণ থেকে অর্জিত উপভোগ (enjoyment); ক্যানন ল'তে এর মানে হচ্ছে অর্থ ধার দিয়ে তার বিনিময়ে আসল পাওনার ওপর অতিরিক্ত গ্রহণ করা।[৩২] *Encyclopaedia of Religions and Ethics*-এ বলা হয়েছে *Usury* ও *Interest* শব্দ দুটি এক ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হতো।"[৩৩]

এতে আরও বলা হয়েছে যে, অতীতে কখনও *ইউসারী*কে আধুনিক কালের ন্যায় উচ্চ হারের *ইন্টারেস্ট* অর্থে ব্যবহার করা হতো না। *The New Encyclopaedia Britannica*-য় যুক্তরাজ্যে প্রচলিত পূর্বতন আইন অনুসারে '*ইউসারীর*' ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "পূর্বতন ইংরেজ আইন অনুসারে *ইউসারীর* অর্থ হচ্ছে অর্থ ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কম-বেশি যাই হোক।" *Encyclopaedia Americana- International Edition (1970)*-এ বলা হয়েছে, "*ইন্টারেস্ট* হচ্ছে অর্থ ব্যবহারের মূল্য (Charge)। মধ্য যুগের শেষ নাগাদ ঋণের ওপর আরোপিত যে কোন পরিমাণ অতিরিক্তকেই সাধারণত *ইউসারী* গণ্য করা হতো।" *Encyclopaedia Americana*-য় বলা হয়েছে "পূর্বে (Previously) *ইউসারী* বলা হতো *ইন্টারেস্ট*কে যা ঋণদাতাকে তার ক্ষতিপূরণ করা বাবদ দেয়া হতো। অপরদিকে, অর্থ (বা কোন *ফাঞ্জিবল* পণ্য) ব্যবহারের বিনিময় হিসেবে প্রদত্ত মূল্যকে বলা হতো *ইউসারী*।" এভাবেই মূলতঃ (Originally) *ইউসারী* শব্দ দ্বারা *ইন্টারেস্টের* ভিত্তিতে ঋণ লেনদেন করাকেই বুঝাতো এবং সংস্কার আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থ ব্যবহারের বিনিময়ে গৃহীত কম-বেশি যে কোন পরিমাণ *ইন্টারেস্টকে ইউসারী* বলা হতো এবং একেই *ইউসুরিয়াস* (সুদখোরী) আখ্যায়িত করা হতো। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মূল অর্থের দিক থেকে ঋণের ওপর ধার্যকৃত *ইন্টারেস্টই* হচ্ছে *ইউসারী*, *ইউসারী* ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেকালে সকল *ইন্টারেস্টকে ইউসুরিয়াস* বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটলে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং *ইউসারীর* সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা অপরিহার্য মনে করা হয়। ফলে ১৩শ শতকে যুক্তরাজ্যে সুদকে বৈধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে একটা সুনির্দিষ্ট হার পর্যন্ত *ইউসারীকে* বরদাশ্‌ত করার কথা বলা হয় এবং আইন দ্বারা বৈধকৃত এই সীমা পর্যন্ত *ইউসারীর* হারকে *ইন্টারেস্ট* নাম দেওয়া হয়। এই সূত্র ধরেই *The Concise*

---

৩১. Qureshi. A. Iqbal, *Islam and the Theory of Interest*, Lahore: Ashraf Publication, 1991, p. 2.

৩২. Cohn, H. Harvey, পূর্বোক্ত।

৩৩. উদ্ধৃত করেছেন, সিদ্দিকী, শহীদ হাসান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪।

www.icsbook.info

Oxford Dictionary-তে উচ্চ হারের *ইন্টারেস্টকে ইউসারী* বলা হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত *ইউসারীর* সংজ্ঞা হচ্ছে, "the practice of lending money at exorbitant interest, especially at higher interest than is legal." "অতি উচ্চ সুদের হারে অর্থ ধার দেওয়া, বিশেষ করে বৈধ হারের চেয়ে উচ্চতর সুদের হারে।" *The New Encyclopaedia Britannica*-য় *ইন্টারেস্টের* সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, *ইন্টারেস্ট* হচ্ছে "ঋণ অথবা অর্থ ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদত্ত দাম।" আর *ইউসারীর* সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "মধ্য যুগের ন্যায় আর্থিক ঋণের ওপর অতি উচ্চ হারে *ইন্টারেস্ট* ধার্য করা হচ্ছে *ইউসারী*। মূলতঃ অতীতে সকল হারের *ইন্টারেস্টকেই ইউসুরিয়াস* গণ্য করা হতো, কিন্তু ১৩শ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে *ইউসারীকে* নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা জরুরী হয়ে উঠে।"

সুতরাং *ইন্টারেস্ট* ও *ইউসারীর* মধ্যে মৌলিকভাবে কোন পার্থক্য কখনো ছিল না এবং নেই। ব্রিটিশ আইনে এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাও কেবল হারের পার্থক্য, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগত কোন পার্থক্য নয়।

সুদ শব্দটি এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লামা মওদূদী লিখেছেন, "কুরআন মজীদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে *রিবা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।"[৩৪] সুদ অর্থ হচ্ছে ঋণ দিয়ে আসলের ওপর অতিরিক্ত নেওয়া। যাকী আল দ্বীন বাদাবীও একইভাবে বলেছেন যে, "*রিবা* এক বিশেষ ধরনের অতিরিক্তকে বুঝায়।[৩৫]

সুতরাং ব্যুৎপত্তি ও শব্দার্থের দিক থেকে *রিবা*, *নেশেখ*, *টারবিট*, *মারবিট*, *ইন্টারেস্ট*, *ইউসারী* ও সুদ সব কটি শব্দ সমার্থবোধক। "*Riba*, *Usury* and *Interest*, therefore, have one and the same meaning and have a common factor of pre-determined positiveness."[৩৬] "সুতরাং রিবা, ইউসারী ও ইন্টারেস্ট এসব কয়টি শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। আর এদের সবকয়টিরই একটি সাধারণ উপাদান রয়েছে; তা হচ্ছে, পূর্বনির্ধারিত ধনাত্মক বৃদ্ধি।" পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, "Biaj, neshec, sood, *Interest*, *Usury* or *riba*, whatever name be ascribed to an 'increase', 'addition', 'excess', or 'gain', accruing on the principal amount loaned, the notion is practically as old as civilization itself. Essence of the transaction has been and remains a fixed or pre-determined and thus predictable, return for the use of money lent or advanced in a purely time related arrangement"[৩৭]

---

৩৪. মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪।

৩৫. বাদাবী, যাকি আল-দ্বীন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪।

৩৬. সিদ্দিকী, শহীদ হাসান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

৩৭. *শরীয়ত ল' রিপোর্টস*, লাহোর, ফেব্রুয়ারী, ২০০০, পৃঃ ৭।

www.icsbook.info

"বিয়াজ, নেশেখ, সুদ, ইন্টারেস্ট, ইউসারী বা রিবা যে নামই দেওয়া হোক, ঋণের আসলের ওপর বৃদ্ধি, সংযোজন, অতিরিক্ত বা লাভের ধারণা আদিকাল থেকে চলে আসছে। বস্তুতঃ মানব সভ্যতা যত পুরাতন এই ধারণাটিও ততই প্রাচীন। এরূপ লেনদেনের অপরিহার্য উপাদান আগে যা ছিল আজও তাই আছে। সেটা হলো ঃ ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ ব্যবহারের বিনিময়ে নিখাদ সময়ের ভিত্তিতে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত বা নির্ধারিত এবং সেহেতু সুপরিজ্ঞেয় আয়।"

রিবার পারিভাষিক অর্থ

রিবার শব্দার্থ তথা আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে; কিন্তু *রিবার* পারিভাষিক বা টেকনিক্যাল অর্থ নিয়ে তাফসীরকার, হাদীসবিশারদ, ফিক্বাহবিদ, বিশেষজ্ঞ স্কলার ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মাযহাবে *রিবাকে* ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আর এর ফলে আল-কুরআনে বর্ণিত *রিবা* এবং হাদীসে বর্ণিত *রিবা* ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে *রিবার* আভিধানিক অর্থ এবং এর পারিভাষিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে; এমনকি, এক সংজ্ঞার সাথে অপর সংজ্ঞার এমন অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে যে, যে কোন লোকের পক্ষে দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার সম্মুখীন হয়ে হতবুদ্ধি হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কেউ কেউ আবার এমনভাবে *রিবাকে* সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, *রিবা নাসীয়াহ্* সংজ্ঞার আওতায় এলেও *রিবা ফদল* সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে; তারা আবার *ইন্টারেস্ট* ও *ইউসারীর* যে অর্থ, হুবহু সেই একই অর্থে *রিবাকে* সংজ্ঞায়িত করেছেন। কোন কোন সংজ্ঞায় আবার *রিবার* আওতা-পরিধি এত ব্যাপকতা পেয়েছে যে, যা *রিবা* নয় তাও এর আওতায় এসে গেছে। যা হোক, এতসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ লেখায় সম্ভব নয়। এখানে কেবল বিশিষ্ট ফক্বীহদের সংজ্ঞা এবং তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

রিবার সমন্বিত সংজ্ঞা

ফিক্বাহ ও বিশেষজ্ঞগণ *রিবার* যেসব সংজ্ঞা দিয়েছেন তন্মধ্যে ইমাম সারাখসী এবং তাঁর সাথে অপর কতিপয় ফক্বীহর প্রদত্ত সংজ্ঞাকেই সর্বব্যাপী, উত্তম ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা বলা যায়। তাঁরা *রিবার* অর্থ করেছেন অতিরিক্ত, বৃদ্ধি, excess (ফদল), বিনিময়হীন বৃদ্ধি, excess without counter value, একদিকে বৃদ্ধি অপরদিকে বৃদ্ধি ছাড়াই ইত্যাদি। তাঁদের মতে, "ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিমূল্য (counter value) নাই এমন প্রতিটি বৃদ্ধিই হচ্ছে *রিবা*।"[৩৮] হানাফী মাযহাবের ফক্বীহ ইমাম সারাখ্সী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "*riba* in *Shariah* is the stipulated excess in one of the two counter values without counter value in transaction of exchange

---

৩৮. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ভলি-১২, পৃঃ ১০৯; উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

www.icsbook.info

(*bay*)''[৩৯]. অর্থাৎ "শরীয়তে *রিবা* হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি প্রতিমূল্যের কোন একটির ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত (ফদল) যার কোন বিনিময় নেই।" *আল নিহায়া ফী শরহি হিদায়া*-তে বলা হয়েছে, "*Riba* is a specific increase entitled to either party without counter value"[৪০] অর্থাৎ "*রিবা* হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বৃদ্ধি যা কোন এক পক্ষ অপর পক্ষকে *কাউন্টার ভ্যালু* না দিয়েই গ্রহণ করে।

মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফক্বীহ ইবনে আরাবী বলেছেন, "every increase which is without an '*iwad*' or an equal counter value is *riba*" অর্থাৎ "বদলা বা সমান প্রতিমূল্য দেওয়া হয় না এমন প্রত্যেক বৃদ্ধিই *রিবা*।" তিনি আরও লিখেছেন, "*riba* literally means an increase and in the Qur'anic verse *riba* is meant every kind of increase '*Ziadah*' in an exchange which is without an equivalent counter value or return '*iwad*.''[৪১] অর্থাৎ "*রিবার* শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, আর কুরআনের আয়াতে *রিবা* দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৃদ্ধি '*যিয়াদা*'-কে বুঝানো হয়েছে যার সমমূল্যের কোন *কাউন্টার ভ্যালু* বা বিনিময় '*ইওয়ায*' নাই।"

এ ব্যাপারে সানআনী লিখেছেন, "*riba* literally means any '*fadal*' or excess which by stipulation does not bring any '*iwad*' or any equivalent return to the other party in a contract of '*muawada*' barter or exchange of commodities and services.''[৪২] অর্থাৎ "ভাষাগত অর্থে *রিবা* হচ্ছে *ফদল* বা অতিরিক্ত যা *মুয়াবাদা বার্টার* বা পণ্য-সামগ্রী ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির শর্ত অনুসারে অপরপক্ষের জন্য কোন বদলা (*ইওয়ায*) বা সমমূল্যের প্রতিদান বয়ে আনে না।"

সম্প্রতি এস. এ. চৌধুরীও রিবাকে একটি সাধারণ পরিভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্যের ওপরে অতিরিক্তকে রিবা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "*riba* is a generic Quranic terminology for all kinds of excess above the value of a thing.''[৪৩] "রিবা হচ্ছে সামগ্রিক অর্থজ্ঞাপক একটি কুরআনী পরিভাষা যা জিনিসের মূল্যের ওপর আরোপিত সকল প্রকার অতিরিক্তকে বুঝায়।" ই, এম,

---

৩৯. সারাখসী, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।

৪০. *আল-নিহায়া ফী শরহি হিদায়া*, ভলি-২, পৃঃ ৫২৪; উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

৪১. ইবনে আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, ভলি-১, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫২, পৃঃ ২৪১, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।

৪২. সানআনী, *সুবুস সালাম*, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।

৪৩. M. A. Chowdhury, *Riba, Financial Interest, Foundation for Islamic Economics*, পৃঃ ১০৩, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

www.icsbook.info

নূরের মতে, এই সংজ্ঞানুসারে মূল্যের ওপর যে কোন বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে রিবার আওতাভুক্ত।[৪৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, *রিবা* উদ্ভূত হওয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়। দুটি একজাতের অর্থ, পণ্য বা সেবা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করলে স্থগিতকৃত *কাউন্টার ভ্যালু* হয় ঋণ, ঋণের ওপর সময়ের ভিত্তিতে ধার্যকৃত বিনিময়হীন (মাগনা) অতিরিক্তকে বলা হয়েছে *রিবা*। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতের অর্থ, পণ্য বা সেবা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে স্থগিতকৃত *কাউন্টার ভ্যালু* হয় দেনা/পাওনা। এই দেনা/পাওনার ওপর সময়ের ভিত্তিতে ধার্যকৃত অতিরিক্তকেও বলা হয় *রিবা*। অপরদিকে একজাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারিত কোন *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বিনিময়হীন বাড়তি নেওয়া হলে তাকে বলা হয়েছে *রিবা*। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে কোন *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বিনিময় না দিয়ে বাড়তি নেওয়া হলে সেই বাড়তিকেও বলা হয়েছে *রিবা*। বস্তুতঃ *রিবা* হচ্ছে বাকি, নগদ উভয় ক্রয়-বিক্রয়ে এক পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বিনিময়হীন (মাগনা) বৃদ্ধি (ফদল যিয়াদা)। পার্থক্য হচ্ছে বাকির ক্ষেত্রে রিবা ধার্য করা হয় সময়ের কারণে, সময়ের ক্ষতিপূরণ বা মূল্য হিসেবে। আর নগদের ক্ষেত্রে *রিবা* ধার্য হয় সময় ছাড়া অন্যবিধ কারণে। উক্ত সংজ্ঞায় সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্ভূত সকল সুদই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে পৃথক শর্তের ফলে যে রিবা উদ্ভূত হয়, সে কথাও সংজ্ঞায় এসেছে। এক কথায়, রিবার সকল বৈশিষ্ট্যই উক্ত সংজ্ঞায় রয়েছে।

রিবার শ্রেণীবিন্যাস

ফিক্বাহ শাস্ত্রে *রিবাকে* প্রধানত *রিবা নাসীয়াহ্* ও *রিবা ফদল* এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকার *রিবার* সংজ্ঞা পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। এরূপ বিভক্তি কুরআন ও সুন্নাহয় পাওয়া যায় না। আল-কুরআনে তো শুধু 'রিবা' ও 'আল-রিবা' আছে। আর হাদীসে বলা হয়েছে রিবা হচ্ছে 'ফদল'; 'ফদল' অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি; আবার বলা হয়েছে, 'নাসীয়াহ ব্যতীত রিবা হয় না', 'যা নাসীয়াহ তাই রিবা'। বুঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রিবা শব্দের অর্থ করেছেন ফদল। আর রিবা হওয়ার কারণ বলেছেন নাসীয়াহ্ যার অর্থ হচ্ছে বিনিময়হীন। এ থেকে রিবার দু'টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে ফদল বা বৃদ্ধি, অপরটি হচ্ছে নাসীয়াহ বা বিনিময়হীন। মূল কথা দাঁড়াচ্ছে যে, ফদল যখন বিনিময়হীন হয় তখনই তা রিবায় পর্যবসিত হয়। ফদলের যদি বিনিময় দেওয়া হয় তাহলে তা রিবা হয় না। "নাসীয়াহ ব্যতীত রিবা হয় না" কথার তাৎপর্য এটাই। সুতরাং রিবা নাসীয়াহ হারাম করা হয়েছে আল-কুরআনে, আর রিবা ফদল নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে, একথা যথার্থ নয়; বরং হাদীসে রিবার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বিনিময়হীন বৃদ্ধি হিসেবে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, নাসীয়াহ্র

---

৪৪. ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

www.icsbook.info

অর্থ হচ্ছে বিনিময়হীন; এটাই হচ্ছে সকল প্রকার রিবার মূল বৈশিষ্ট্য। আর ফদল অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত। এই দৃষ্টিতে সকল প্রকার রিবাই হচ্ছে ফদল ও বিনিময়হীন; এক কথায়, রিবা হচ্ছে বিনিময়হীন ফদল বা বৃদ্ধি। সুতরাং কিছু রিবাকে রিবা নাসীয়াহ্ আর কিছু রিবাকে রিবা ফদল হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা ঠিক নয়। তবে নাসীয়াহ্ শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে, অবকাশ বা মেয়াদ, সেই হিসেবে ফিক্বাহশাস্ত্রের উক্ত বিভক্তিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই অর্থেই এখানে প্রথমে *রিবা নাসীয়াহ্* ও দ্বিতীয় পর্যায়ে *রিবা ফদলের* অর্থ ও সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

রিবা নাসীয়াহ্ ঃ অর্থ

আরবী *'নাসায়া'* শব্দ থেকে *নাসীয়াহ্* শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে।[৪৫] J. M. Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*-এ *নাসায়া* অর্থ লিখেছেন ঃ

> *নাসা* - to put off, postpone, delay, defer, procrastinate (পিছিয়ে দেওয়া–বাতিল করা; স্থগিত করা, বিলম্বিত করা, মুলতবি করা, গড়িমসি করা।)
>
> *নাসাআ* - to allow time to pay, grant credit (পরিশোধের জন্য সময় দেওয়া; ঋণ মঞ্জুর/প্রদান করা।)
>
> *নাসাআ* - long life, longevity (দীর্ঘ জীবন, দীর্ঘায়ু।)

আল-মুনজাদ-এ লিখা হয়েছে: *নাসাআ* কাউকে ঋণে অবকাশ দেওয়া। *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধানে 'নাসীয়াহ্র'* অর্থ লিখা হয়েছে, পরিশোধে বিলম্ব, পরিশোধের জন্য প্রদত্ত সময়, বাকি, ধার।[৪৬]

ড. চাপরা লিখেছেন, *নাসায়া* শব্দের অর্থ হচ্ছে সময়, মেয়াদ বা অবকাশ। ঋণ বা দেনা পরিশোধ করার জন্য ধার্যকৃত/প্রদত্ত মেয়াদকে বলা হয় *নাসায়া*।[৪৭] ইংরেজীতে একে বলা হয় waiting আর বাংলায় বলা হয় প্রতীক্ষা। ঋণ ও বাকি প্রদান করে তার *কাউন্টার ভ্যালু* ফেরত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এজন্য দেনা ও ঋণকে বলা হয় waiting বা প্রতীক্ষা। *কর্দুর রিবা* বা সুদী ঋণে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ঋণ বা দেনা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ এবং পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে বর্ধিত মেয়াদের ওপর এত হারে সুদ ধার্য করা হবে। এভাবে সময় বা মেয়াদের বিনিময় হিসেবে এ *রিবা* ধার্য করা হয় বলে একে বলা হয় *রিবা নাসীয়াহ্* বা মেয়াদী সুদ। ইংরেজীতে একে বলা হয় reward for waiting or time value of money (প্রতীক্ষার প্রতিদান বা অর্থের সময়ের মূল্য।)। বলা হয়েছে, "*Riba* in

---

৪৫. চাপরা, এম, উমর, *Towards A Just Monetary System*, Islamic Foundation, U.K., পৃঃ ৫৭।

৪৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, পৃঃ ৮৮৪।

৪৭. চাপরা, এম, উমর ঃ উপরোক্ত, পৃ: ৫৭।

www.icsbook.info

deferred transaction is nothing but a charge for the period of indebtedness...This charge is also called a time value of money."[৪৮] **"বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রিবা ঋণগ্রস্ত থাকা কাল/মেয়াদের দাম ছাড়া আর কিছুই না। ...... এই দামকে অর্থের সময়ের মূল্যও বলা হয়।"** *হাদীসে বলা হয়েছে, "রিবা হয় নাসীয়াতে" "(riba is in nasiah)' অথবা বলা হয়েছে, "নাসীয়াহ্ ব্যতীত রিবা হয় না।" "(There is no riba except in nasiah)"; অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, "যা ইয়াদান বিইয়াদিন তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু যা নাসীয়াহ্ তা রিবা।"*[৪৯] সুতরাং ঋণ বা দেনার ওপর মেয়াদ বা সময়ের ভিত্তিতে ধার্যকৃত *রিবা হচ্ছে রিবা নাসীয়াহ্*।

জাহিলী যুগে এই ধরনের *রিবা* ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং সকলেই একে *রিবা* বলে জানত। সেই জন্য কেউ কেউ একে বলেছেন *রিবা আল-জাহিলিয়্যাত*। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও একে *রিবা আল-জাহিলিয়্যাত* আখ্যায়িত করেছেন। *কর্দ* (ঋণ) ও *দাইনের* (দেনা) ওপর ধার্য করা হয়, এজন্য কেউ কেউ একে বলেছেন, *রিবা আল-কর্দ*, কেউ কেউ আবার বলেছেন *রিবা আল-দাইন*। আল-কুরআনে সূরাতুল বাকারায় সুদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে যে বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তাতে তদানীন্তনকালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত *রিবা নাসীয়াহ্*র প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাছাড়া সূরা আলে-ইমরানের ১৩০ আয়াতে দ্বিগুণ, চারগুণ, বহুগুণে বর্ধিত সুদ বলতেও মুখ্যত *রিবা নাসীয়াকেই* বুঝানো হয়েছে। এ থেকেই ধারণা করা হয়েছে যে, আল-কুরআন কেবল *রিবা নাসীয়াকে* নিষিদ্ধ করেছে। এজন্য অনেকেই একে *রিবা* আল-কুরআন আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং *রিবা* আল-জাহিলিয়্যাত, *রিবা* আল-*কর্দ*, *রিবা* আল-*দাইন*, *রিবা* আল-কুরআন দ্বারা আসলে *রিবা নাসীয়াকেই* বুঝায়।

রিবা নাসীয়া ঃ সংজ্ঞা

তাফসীরকার, ফিক্বাহবিদ, অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও স্কলারগণ *রিবা* সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তারা সকলেই নিজ নিজ ভাষায় *রিবা নাসীয়ার* সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে কতিপয় সংজ্ঞা পেশ করা হলো। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ স্কলারের সংজ্ঞায় কেবল *রিবা নাসীয়াকেই রিবা* বলা হয়েছে, *রিবা ফদল* এসব সংজ্ঞার আওতায় আসেনি। এজন্য এসব সংজ্ঞাকেও *রিবা নাসীয়াহ্* শিরোনামের অধীনে পেশ করা হলো।

---

৪৮. Muhammad Anwar: *Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking*, p. 2. The Article was received by the IERB for publication in its journal, Thoughts on Economics.

৪৯. বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ।

www.icsbook.info

আল-কুরআনে বর্ণিত সুদ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের আলোকে আল-জাসসাস তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর *আহকামুল কুরআনে* নিম্ন ভাষায় রিবার সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ

"জাহিলিয়্যাত যুগের *রিবা* হচ্ছে, ঋণের আসলের ওপর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক দেয় সেই অতিরিক্ত যার বিনিময়ে ঋণদাতা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করত।"[৫০]

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ আল-কুরতুবী লিখেছেন, "মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ঋণের আসলের ওপর বৃদ্ধিই হচ্ছে *রিবা*, সে বৃদ্ধি যদি হয় এক মুঠো খড়, যেমন ইবনে মাসুদ বলেছেন, কিংবা যদি শস্যের একটি কণাও হয়, তাহলেও তা *রিবাই*।"[৫১]

আল্লামা রাগেব লিখেছেন, "ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণের শর্ত হিসেবে বা পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে মূল পরিমাণের অতিরিক্ত যাই গ্রহণ করে তাই *রিবা*।"[৫২]

আল্লামা আব্দুর রহমান আল-জাযিরি বলেছেন, "*রিবার* শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি; তবে *ফিক্বাহর* পরিভাষায় সমজাতীয় পণ্য বিনিময়কালে পণ্যের পরিমাণে কম-বেশি করা হলে এবং অতিরিক্ত অংশের বিনিময় বা মূল্য দেওয়া না হলে সেই বাড়তি অংশকে বলা হয় *রিবা*।" তিনি বলেছেন, উক্ত বৃদ্ধি যদি অন্য পক্ষের পণ্য প্রদান স্থগিত (deferred) বা বিলম্বিত (waiting) করার কারণে হয় তাহলে একে বলা হয় *রিবা আল-নাসীয়াহ্*। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীষ্মকালে ১.৫০ *ইরদাব* (পরিমাণ) গম প্রদানের শর্তে যদি শীতকালে ১ *ইরদাব* গম বাকিতে বিক্রয় করা হয়, তাহলে এই .৫০ *ইরদাব* অতিরিক্ত গম হবে *রিবা আল-নাসীয়াহ্*; কারণ ১ *ইরদাব* গমের মূল্যের সাথে অতিরিক্ত .৫০ *ইরদাব* যুক্ত করা হয়েছে অথচ বিক্রীত ১ *ইরদাব* গমের সাথে এর কোন বিনিময় মূল্য দেওয়া হয় নাই; বরং এই অতিরিক্ত নেয়া হয়েছে কেবল বিলম্বে দাম পরিশোধ বা সময়ের কারণে।"[৫৩]

আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ বলেছেন, "ভাষাগত দিক থেকে *রিবা* শব্দ দ্বারা কোন জিনিসের মূল আয়তন বা পরিমাণের ওপরে অতিরিক্ত (addition) বা বৃদ্ধিকে (increase) বুঝায়। আর আল-কুরআনের পরিভাষা হিসেবে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ বা পণ্য-সামগ্রীর ওপর সুদ (*Interest*) হিসেবে ধার্যকৃত অবৈধ অতিরিক্তই হচ্ছে *রিবা*।"[৫৪]

---

৫০. আল-জাসাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬৯। উদ্ধৃত করেছেন, উসমানী, মুহাম্মদ তকী, *সুদ নিষিদ্ধ ঃ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, বাংলা তরজমা, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পৃঃ ২৮।

৫১. *তাফসীর আল কুরতুবী*, ১৯৬৭, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪১।

৫২. *তাফসীরে আয়াতুল আহকাম*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩।

৫৩. আব্দুর রহমান আল-জাযিরিঃ *আল-ফিক্বহ্ আলা আল-মাযাহিব আল-আরবায়াহ*, উদ্ধৃত করেছেন, চাপরা, এম, উমর, Towards A Just Monetary System, The Islamic Foundation, U.K., p. 241.

৫৪. আসাদ, মোহাম্মদ, *The Message of the Quran*।

www.icsbook.info

আল্লামা মওদূদী *রিবার* ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এমন এক বর্ধিত অংশের অর্থকে *রিবা* বলতো যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী ঋণ বাবদ প্রদত্ত মূল অর্থের বাইরে আদায় করত। আমাদের ভাষায় আমরা একেই বলি সুদ। কুরআন নাযিলের সময় আরবে নিম্নোক্ত তিন ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল ঃ

১. এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম পরিশোধের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার পর যদি দাম পরিশোধ না হতো, তাহলে তাকে আবার অতিরিক্ত সময় দিতো এবং প্রাপ্য দামের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতো।

২. একজন অন্যজনকে ঋণ দিতো। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি হতো যে, অমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এত পরিমাণ অর্থ বেশি ফেরত দিতে হবে; এবং

৩. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরীকৃত হয়ে যেতো। সেই সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ পরিশোধ না হলে পূর্বের চেয়ে বর্ধিত হারে পরিশোধের শর্তে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হতো।"[৫৫]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, সুদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ৩টি :

"১. ঋণের আসল পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া;

২. সময়ের অনুপাতে আসল বৃদ্ধির সীমা, পরিমাণ বা হার নির্ধারিত হওয়া এবং

৩. উপরের দুটিকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।"

তিনি বলেছেন, "ঋণ সংক্রান্ত যে কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তা নিঃসন্দেহে সুদী লেনদেনে পরিণত হবে। এতে ঋণের উদ্দেশ্য এবং ঋণগ্রহীতা ধনী বা দরিদ্র যাই হোক তাতে কারবারের আসল চরিত্রে কোন পার্থক্য হবে না।"[৫৬]

ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী আল-বাদাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "এটা সর্বসম্মত যে, *রিবা* অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি। .... তবে অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, *রিবা* হচ্ছে ঋণ প্রদান-গ্রহণ কালে কৃত চুক্তি অনুসারে আসলের ওপর ধার্যকৃত সুদ (*Interest*) ; এ ছাড়া দেনাদার যদি ঋণ বা দেনার চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/দেনা পরিশাধে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রতি বর্ধিত মেয়াদের জন্য ঋণ/দেনার আসলের ওপর আরোপিত সকল অতিরিক্তই *রিবার* মধ্যে শামিল।"[৫৭]

---

৫৫. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আলা; *তাফহীমুল কুরআন; সূরাতুল বাকারাহ্*, টীকা-৩১৫।

৫৬. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*; বাংলা অনুবাদ, আব্বাস আলী খান ও আব্দুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৮৮।

৫৭. সিদ্দিকী, এম, এনঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮।

www.icsbook.info

এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ কুতুব শহীদ লিখেছেন, "যে *রিবা* বা সুদ জাহেলী যুগে পরিচিত ছিল এবং যা উচ্ছেদ করার জন্য আল-কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে তা ছিল প্রধানত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে প্রদত্ত অর্থ বা দ্রব্য ফেরত নেয়ার সময়ে বেশি নেয়া। লেনদেনের সময় একই জিনিস বেশি নেয়া বা বেশি দেওয়া, আসল পণ্যের ওপর অধিক গ্রহণ করা। আর অবকাশ বলতে সেই সময়কে বুঝায় যার জন্য অতিরিক্তটা নেওয়া হয়। আর এই ফায়দা লেনদেনের শর্ত হিসেবে বিবেচিত হলে তখন তা সুদ হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন মালের পরিবর্তে সমশ্রেণীর মাল কিছু বেশি নেয়া হতো তো এই সময়ের কারণেই।"[৫৮]

ড. উমর চাপরা লিখেছেন, "*রিবার* শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, সম্প্রসারণ বা প্রবৃদ্ধি। আর শরয়ী পরিভাষায়, *রিবা* সেই অতিরিক্তকে (premium) বুঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে অথবা ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির দরুন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার প্রদত্ত ঋণের আসলসহ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।"[৫৯]

আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম, বিশেষজ্ঞ ও স্কলারদের বিভিন্ন সম্মেলন ও বৈঠক হতেও সর্বসম্মতিক্রমে *রিবার* অনুরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. চাপরা লিখেছেন, "প্রাথমিক যুগ থেকেই মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ *রিবাকে* সর্বসম্মতভাবে এই অর্থেই বুঝে আসছেন। আধুনিক কালে ইসলামী আইনবেত্তাদের বেশ কয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সম্মেলনের মধ্যে মুতামার আল-ফিকৃহ আল-ইসলামীর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসে ১৯৫১ সালে; আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে কায়রোতে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ও রাবেতা ফিকৃহ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে কায়রোতে এবং ১৯৮৬ সালে মক্কায়। এ সকল সম্মেলনসহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সকল সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতভাবে *রিবা* সম্পর্কে উক্তরূপ রায় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং *রিবাকে* ভিন্নতর অর্থে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই।"[৬০]

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপীলেট বেঞ্চ-এর রায়ে বলা হয়েছে ঃ "বিচারপতি খলিলুর রহমান খান, বিচারপতি ওয়াজীহুদ্দীন আহমদ ও বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী কর্তৃক লিখিত পৃথক পৃথক তিনটি রায়ে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ কারণসমূহের প্রেক্ষিতে এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ভোগ বা উৎপাদন যে উদ্দেশ্যেই

---

৫৮. সাইয়েদ, কুতুব শহীদ ঃ *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন* ঃ বাংলা অনুবাদ, আল-কুরআন একাডেমী, লন্ডন, ৪র্থ খণ্ড, ২০০১, পৃঃ ৪৬৯-৪৭২।

৫৯. চাপরা, ড. এম. উমর : *The Nature of Riba*, Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 6, No. 3, July-Sept., 1989; p. 7.

৬০. চাপরা, ড. এম. উমর : *Prohibition of Interest* : Does it Make Sense? Islamic Da'wa Movement, IDM Publications, South Africa, 2001, pp. 2-3.

www.icsbook.info

হোক, নির্বিশেষে সকল ঋণ বা দেনার চুক্তিতে আসলের ওপর ধার্যকৃত, কম হোক বেশি হোক, যে কোন অতিরিক্তই হচ্ছে আল-কুরআনে *হারাম* ঘোষিত *রিবা*।"[৬১]

ড. জিয়াউল হক লিখেছেন, মুসলিম আইনবেত্তাগণ একে *রিবা নাসীয়াহ্* বলে উল্লেখ করেছেন। এটা হচ্ছে স্থগিত বৃদ্ধি (deferred increase) বা সময়ের ভিত্তিতে অতিরিক্ত (excess in time), ঋণগ্রহীতা যার কোন ক্ষতিপূরণ (recompense) বা সমমূল্য (equivalence) (*Iwad*, *Badal*) পায় না; সুতরাং "সুদ হচ্ছে অনুপার্জিত আয়, যাতে ঋণগ্রহীতাকে কোন বিনিময় (return) বা *কাউন্টার ভ্যালু* দেওয়া হয় না। মুসলিম আইনবেত্তাদের এটাই অভিমত।"[৬২]

বিশেষজ্ঞদের উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ঋণ ও দেনার ওপর চুক্তি অনুসারে ধার্যকৃত যে কোন অতিরিক্ত, যার কোন বিনিময় দেওয়া হয় না, যা সময়ের সাথে গুণে গুণে বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের সাথে যার কোন সম্পর্ক নাই তাই হচ্ছে *রিবা নাসীয়াহ্*। এক কথায়, সময়ের কারণে ঋণের *কাউন্টার ভ্যালু*/দেনার ওপর বৃদ্ধিই (ফদল/যিয়াদা) হচ্ছে *রিবা নাসীয়াহ্*।

অন্য কথায় ঋণকে যখন অতিরিক্তের কারণ বানানো হয়, তথা অতিরিক্তকে ঋণের বিনিময়, ঋণের দাম বা price of credit বানানো হয় অথবা অতিরিক্ত দেওয়ার শর্তে যখন ঋণ দেওয়া হয় তখন সেই অতিরিক্ত হয় *রিবা নাসীয়াহ্* বা মেয়াদী সুদ। এই বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত যে আকারেই হোক, একই জাতের অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত কোন পরিমাণ হোক বা অন্য কোন অর্থ বা পণ্যের কোন পরিমাণ হোক, এমনকি, যদি কোন সেবা, বেনিফিট (benefit), উপহার, উপঢৌকন বা দানও হয়, তাহলেও তা সুদ বলে গণ্য হবে। সুতরাং ঋণের শর্ত হিসেবে আসলের অতিরিক্ত যাই নেয়া হোক তাই হচ্ছে বিনিময়ের অতিরিক্ত তথা *রিবা নাসীয়াহ্*। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি ১০০/- টাকা এই শর্তে ধার দেয় যে, ঋণগ্রহীতা ১ বছর পর ১০০/- টাকা পরিশোধ করবে এবং তার সাথে আরও ১০/- টাকা বেশি দেবে অথবা ১০০/- টাকার সাথে ১ কেজি পেঁপে দেবে বা তার গাড়ীতে করে ঋণদাতাকে তার বাসায় পৌঁছে দেবে, তাহলে অতিরিক্ত এই ১০ টাকা বা ১ কেজি পেঁপে বা গাড়ীর সেবা হবে *রিবা নাসীয়াহ্* বা মেয়াদী সুদ।

ঋণের অতিরিক্ত যাই হোক, তা হবে বিনিময়হীন বা মাগনা, আর মাগনা বলেই এই ১০/- টাকা বা ১ কেজি পেঁপে বা গাড়ীর সেবা হবে *রিবা* বা সুদ। ঋণগ্রহীতা যদি এক বছর নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আসলের *কাউন্টার ভ্যালু* ও এর সাথে মাগনা বা অতিরিক্ত হিসেবে ১০% সুদ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য

---

৬১. উসমানী, মুহাম্মদ তকী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৬২. হক, ড. জিয়াউল : *Riba and Interest*, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 6, No. 4, October-December, 1989, Autumn Issue, p. 8, 9.

www.icsbook.info

চুক্তি অনুসারে বার্ষিক ১০/- টাকা হিসেবে প্রতিদিন সুদের অংক বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং যতদিন ঋণগ্রহীতা তার মূল ঋণ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিনই বৃদ্ধির গতি অব্যাহত থাকবে। এমনকি তা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, বহুগুণও হয়ে যেতে পারে। আর এই সকল বর্ধিত অংশই হবে মাগনা ও একতরফা (unilateral)। অনুরূপভাবে কোন ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ১ কিলো লবণ এই শর্তে ধার দেয় যে, ঋণগ্রহীতা এক মাস পর ১.৫০ কিলো লবণ ফেরত দেবে, তাহলে এই .৫০ কিঃ লবণ হবে মূল লবণের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে অতিরিক্ত ও মাগনা, সুতরাং *রিবা*।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি অন্য কাউকে ঋণ দেয়, অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতার সামনে খাবার ডিশ পেশ করে, তাহলে ঋণদাতার উচিত সেটা গ্রহণ না করা; আর ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতাকে তার বাহন পশুর ওপর আরোহণ করার প্রস্তাব করে, তাহলে ঋণদাতার উচিত তা গ্রহণ না করা, যদি না তারা পূর্ব থেকেই পরস্পর অনুরূপ আনুকূল্য ও সুবিধা বিনিময়ে অভ্যস্ত হয়।" (সুনান আল-বায়হাকি)

হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, যদি এমন হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণ করার পূর্বে জীবনে কখনও ঋণদাতাকে খাওয়ায় নাই, অথবা কখনও তার ঘোড়ায় উঠে ভ্রমণ করার সুযোগ দেয় নাই; কিন্তু তার নিকট থেকে ঋণ নেওয়ার পর সে তাকে খাবার সেধেছে এবং তার বাহনে ভ্রমণ করার প্রস্তাব করেছে, এতে স্বাভাবিকভাবেই আশংকা হয় যে, ঋণ দেওয়ার কারণেই সে এখন ঋণদাতাকে এই সব সুযোগ-সুবিধা দিতে আগ্রহী। আর যদি তাই হয়, তাহলে ঋণ হবে এই সুবিধাগুলোর কারণ। আশংকা যে, এ অবস্থায় সুবিধাগুলো *রিবা* হয়ে যাবে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে যদি পূর্ব থেকেই পরস্পরকে খাওয়ানো বা একজন আর একজনের বাহনে উঠার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঋণ গ্রহণের পরে খাওয়া বা বাহনে উঠার প্রস্তাব করলে তা ঋণের কারণে নয় বরং পারস্পরিক সম্পর্ক ও অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সুদে পরিণত হওয়ার আশংকা থাকবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ব থেকে অভ্যস্ত না হলে উল্লেখিত অফার (offer) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অতিরিক্ত যদি ঋণের কারণে বা ঋণের শর্ত হিসেবে হয়, তাহলে তা হয় *রিবা*।

অন্য একটি হাদীসে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ঋণ দেয়, তাহলে (ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে দেয়া) কোন উপহার (gift) গ্রহণ করা তার উচিত নয়।" (মিশকাত, বোখারীর সূত্রে উদ্ধৃত।)

আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমি মদীনায় এসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি (আব্দুল্লাহ

www.icsbook.info

ইবনে সালাম) বলেছেন, "আপনি এমন এক দেশে বাস করেন যেখানে অবাধে এবং ব্যাপকভাবে (rampant) *রিবা* লেনদেন চালু আছে। সুতরাং আপনার কাছে ঋণী কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এক বোঝা খড় অথবা সামান্য কিছু যব, অথবা এক আঁটি শুষ্ক তৃণ উপহার দেয়, তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন না, কারণ এটা *রিবা*।" (মিশকাত, বোখারীর সূত্রে উদ্ধৃত।)

উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণের শর্তে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসও যদি আসলের অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে তা অবশ্যই *রিবা*; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ফাদালাহ ইবনে উবাইদ সম্ভবত এজন্যেই বলেছেন যে, "The benefit derived from any loan is one of the different aspects of *riba*" "ঋণ থেকে আহৃত (derived) সুবিধা হচ্ছে সুদের বিভিন্ন ধরনের একটি।" – (সুনান আল বায়হাকি)।

লক্ষণীয় যে, কোন কোন বিশেষজ্ঞের সংজ্ঞায় সমজাতের অর্থ বা পণ্য বিনিময়কালে পরিমাণে কম-বেশি করা হলে *রিবা* উদ্ভূত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কথা ঠিক যে, সমজাতের অর্থ বা পণ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে ঋণের সৃষ্টি হয় এবং এই ঋণের ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে তা হয় *রিবা*। কিন্তু কেবল ঋণের ক্ষেত্রে নয় দেনার ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্তও *রিবা* হয়। আর দেনার সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রা বা পণ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক ক একজন চাল বিক্রেতা আর খ হচ্ছে চালের ক্রেতা। খ ক-এর কাছ থেকে ৪০ কেজি চাল এক মাসের জন্য বাকিতে কিনতে চাইলো। ক বাকিতে চাল বিক্রি করতে রাজী হলো। উভয়ে দরকষাকষি করে স্থির করলো প্রতি কেজি চালের দাম হবে ৩০/- টাকা অর্থাৎ ৪০ কেজি চালের মোট দাম দাঁড়ালো ১,২০০/- টাকা। এই ১,২০০/- টাকা হলো ৪০ কেজি চালের *কাউন্টার ভ্যালু*, ক-এর পাওনা এবং খ-এর দেনা। এই বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ে অথবা পরবর্তীতে ক ও খ সম্মত হয়ে এটাও স্থির করলো যে, খ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত দেনার ওপর বার্ষিক ১০% হিসেবে সুদ ধার্য করা হবে এবং খ তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। অতঃপর খ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে লেনদেন শেষ হয়ে যাবে এবং খ-কে কোন সুদ দিতে হবে না। কিন্তু যদি তার দেনা সম্পূর্ণ বা এর কোন অংশ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে নির্ধারিত এক মাস পর হতে তার অপরিশোধিত দেনার ওপর প্রতিদিন সুদের অংক যোগ হতে থাকবে যত দিন সে সম্পূর্ণ মূল দেনা ও সুদ পরিশোধ না করবে। সুতরাং একজাতের অর্থ বা পণ্যের বাকি ক্রয়-বিক্রয় তথা ঋণের ক্ষেত্রে *রিবা* উদ্ভূত হয় একথা যেমন যথার্থ তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতের অর্থ, পণ্য বা সেবার বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সৃষ্ট দেনার ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে তাও *রিবা* হয়, একথাও সত্য।

www.icsbook.info

রিবা ফদল ঃ অর্থ

আরবী *ফদল* শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত, বাড়তি, বেশি ইত্যাদি। হাদীস থেকে জানা যায় যে, এক দীনারের বদলে দুই দীনার, এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম, এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' খেজুর, হাতে হাতে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা হলে দীনার, দিরহাম বা খেজুরের অতিরিক্ত পরিমাণ হয় *রিবা* (মুসলিম)। এছাড়া নিলামে প্রতারণামূলক ডাকের মাধ্যমে দাম বাড়ানো হলে, পারিতোষিকের বিনিময়ে কারও জন্য সুপারিশ করা হলে অথবা প্রতারণা করে দাম বেশি নেওয়া হলে দামের সেই সব বর্ধিত অংশ ও পারিতোষিককেও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) *রিবা* ঘোষণা করেছেন। ফিক্বাহ শাস্ত্রে এই ধরনের যাবতীয় *রিবাকে* বলা হয়েছে *রিবা ফদল*। সুতরাং *রিবা নাসীয়ার* ন্যায় ঋণ ও দেনার ক্ষেত্রে নয়, বরং হাতে হাতে নগদ বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ে *রিবা ফদলের* উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ *রিবা নাসীয়াহ্* ও *রিবা ফদলের* মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, *রিবা নাসীয়াহ্* হয় ঋণ ও দেনার ক্ষেত্রে তথা বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে; অপরদিকে *রিবা ফদল* হয় নগদ বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, *রিবা নাসীয়ায়* নেওয়া ও দেওয়ার মাঝে থাকে সময়ের ব্যবধান তথা *রিবা নাসীয়াহ্* হচেছ সময়ের বিনিময়; কিন্তু *রিবা ফদলে* নেওয়া ও দেওয়ার মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকে অনুপস্থিত। নগদ বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই *রিবা* হয়, এজন্য কেউ কেউ একে *রিবা আল-বুয়ূ* বা ক্রয়-বিক্রয়ের *রিবা* আখ্যায়িত করেছেন। কেউ কেউ আবার একে *রিবা আল-নকদ* বা নগদ *রিবা* বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের *রিবায়* সময় নাই, শুধু বৃদ্ধি আছে। এজন্য কেউ কেউ একে বলেছেন *রিবা আল-ফদল*। এই *রিবার* উল্লেখ হাদীসে করা হয়েছে; এই জন্য কেউ কেউ একে বলেছেন *রিবা আল-সুন্নাহ*। সুতরাং *রিবা আল-বুয়ূ*, *রিবা আল-নকদ*, *রিবা আল-সুন্নাহ* ও *রিবা আল-ফদল* একই ধরনের *রিবা* অর্থাৎ *রিবা আল-ফদলেরই* বিভিন্ন নাম মাত্র।

রিবা ফদল ঃ সংজ্ঞা

উলামায়ে কিরাম ও বিশেষজ্ঞগণ *রিবা ফদলকে* নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উল্লেখ্য যে, *রিবা ফদলের* সংজ্ঞায় সকলেই সমজাতের পণ্য বা অর্থের নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে *রিবা ফদল* উদ্ভূত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য বা অর্থ নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবার বিষয়টি কারও কাছেই গুরুত্ব পায়নি। উদাহরণ স্বরূপ, ইবনে হাজার আস-কালানী লিখেছেন, "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে *রিবা*। যেমন, এক দীনারের বিনিময়ে দুই দীনার।"[৬৩] এখানে বিনিময় বলতে তিনি কেবল নগদ হাতে হাতে বিনিময়কে বুঝিয়েছেন। এছাড়া একজাতের মুদ্রা, অর্থাৎ দীনারের সাথে দীনার বিনিময়ের কথা বলেছেন।

---

৬৩. উদ্ধৃত, আফজালুর রহমান, *ইকোনমিক ডকট্রিনস অব ইসলাম*।

www.icsbook.info

একইভাবে সাইয়েদ কুতুব শহীদ তার ফী যিলালিল কুরআনে লিখেছেন, "হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ঘটনায় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তিনি খারাপ দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর নিয়েছেন। যেহেতু একই খেজুর থেকে অন্য খেজুরের জন্য হলো, সেজন্যেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে *রিবা* বলে ঘোষণা করেছেন।"[৬৪]

সাইয়েদ মওদূদীও *রিবা ফদলের* অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "একই জাতিভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে হাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি হয় তাকে বলা হয় *রিবা আল-ফদল*।"[৬৫]

আল্লামা আব্দুর রহমান আল-জাযিরি বলেছেন, "লেনদেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান না থাকা সত্ত্বেও যদি (একই জাতের পণ্য) কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ নেওয়া হয় এবং অতিরিক্ত অংশের মূল্যের ক্ষতিপূরণ করা না হয়, তাহলে সেই বাড়তি অংশ হয় *রিবা আল-ফদল*।"[৬৬]

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের শরীয়াহ আপীলেট বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে যে, "নবী করীম (সাঃ) কতিপয় লেনদেনকে *রিবা* আখ্যায়িত করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. অর্থের বিনিময়ে অর্থ লেনদেনে উভয় পক্ষের অর্থ যদি একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং উভয় পক্ষ যদি সমান সমান পরিমাণের অর্থ লেনদেন না করে, তাহলে বিনিময় তাৎক্ষণিক হাতে হাতে নগদ হোক (spot transaction) অথবা বাকির ভিত্তিতে হোক, সে লেনদেন হবে *রিবা*।

২. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলো যদি ওজন বা পরিমাপযোগ্য হয় এবং একই জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং যদি উভয় পক্ষের পণ্যের পরিমাণ অসমান হয় অথবা কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত বা বাকি রাখে, তাহলে এরূপ লেনদেন *রিবা* লেনদেনে পর্যবসিত হবে।

৩. বার্টার বা পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময়ে পণ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন জাত ও শ্রেণীভুক্ত হয় এবং সেগুলো যদি ওজন ও পরিমাপযোগ্য হয় আর কোন এক পক্ষ যদি তার পণ্য প্রদান স্থগিত বা বাকি রাখে, তাহলে তা *রিবা* লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৬৭]

হানাফী ফক্বীহদের মতে, "একই জাতের (similarily) বস্তুগত সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে, আইনত গ্রহণযোগ্য পরিমাপের ভিত্তিতে, কোন অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য করা হলে সেই অতিরিক্ত হচ্ছে *রিবা ফদল*।" "It is an excess of tangible property

---

৬৪. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭১।

৬৫. মওদূদী, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭১, পৃঃ ৯৬।

৬৬. আল্লামা আব্দুর রহমান আল-জাযিরি, *আল-ফিক্বহ আলা আল মাযাহিব আল-আরবায়াহ্*, উদ্ধৃত, চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪১।

৬৭. উসমানী, মুহাম্মদ, তকী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭-১২৮।

www.icsbook.info

stipulated in the exchange contract on the basis of legal criteria in the similarity of two items."[৬৮]

শাফেয়ী আইনবেত্তাদের মতে, "It is an exchange with an increase in one of the trade items over the other." অর্থাৎ "ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি পণ্যের কোন একটির পরিমাণ অপরটির চেয়ে বেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করাই হচ্ছে *রিবা ফদল*।"[৬৯]

হাম্বলী মাযহাবের ফক্বীহদের দৃষ্টিতে, "It is an increase in one of the exchange items identical in kind of measurable and weighable goods." অর্থাৎ "*রিবা ফদল* একই জাতের পরিমাপ ও ওজনযোগ্য পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন একটি পণ্যের পরিমাণ বেশি করা।"[৭০]

উক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হানাফী মাযহাবের মতে *রিবা* হচ্ছে, বাস্তব অর্থে অতিরিক্ত (excess) বা বৃদ্ধি (increase)। যথা, এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করা। এখানে এক পক্ষের অতিরিক্ত এক দিরহাম হচ্ছে *রিবা*। আর 'without a corresponding counter value' কথার তাৎপর্য হচ্ছে, উক্ত বাড়তি এক দিরহামের কোন *কাউন্টার ভ্যালু* নেই বা দেওয়া হয় নাই বা তা মাগনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সংজ্ঞাতে বাকির মেয়াদকেও রিবা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বেই বিশিষ্ট ফিক্বাহবিদদের মত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, নিষিদ্ধ হচ্ছে *ফদল* বা বৃদ্ধি যা বিনিময়হীন; সময় নিষিদ্ধ নয়, সময় বা মেয়াদ রিবা নয়। সর্বোপরি এইসব সংজ্ঞা অনুসারে *রিবা ফদল* উদ্ভূত হয় সমজাতের পণ্য-সামগ্রী নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে নিলাম ক্রয়-বিক্রয়ে দালাল কর্তৃক মিথ্যা ডাকের মাধ্যমে দাম বাড়ানো হলে, প্রতারণার মাধ্যমে দাম বেশি নিলে, বাজার সম্পর্কে অনবহিত লোককে ঠকিয়ে দাম বেশি নিলে ও পারিতোষিকের বিনিময়ে কারও পক্ষে সুপারিশ করা হলে, এসব বর্ধিত দাম ও পারিতোষিককে *রিবা* বলা হয়েছে। এসব ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্যের নগদ ক্রয়-বিক্রয়। এসব *রিবাকেও* সংজ্ঞার আওতায় আনা উচিত।

সুতরাং নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিমূল্যের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত যার কোন বিনিময় দেওয়া হয় না তাই হচ্ছে *রিবা ফদল*। এই সংজ্ঞায় নগদ ক্রয়-বিক্রয় বলতে সমজাতের পণ্য, অর্থ ও সেবার নগদ ক্রয়-বিক্রয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য, অর্থ ও সেবার নগদ ক্রয়-বিক্রয় সবই শামিল রয়েছে।

---

৬৮. উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

৬৯. উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

৭০. ইবিদ, পৃঃ ৩৬।

www.icsbook.info

আল-রিবা অর্থ

আল্লাহ তা'য়ালা আল-কুরআনে বলেছেন, "ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার রিবা" অর্থাৎ আল্লাহ বাইকে হালাল করেছেন, আর রিবাকে করেছেন হারাম। এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা '*বাই*' শব্দের পূর্বে '*আল*' যোগ করে '*আল-বাই*' বলেছেন; আর *রিবা* শব্দের পূর্বে '*আল*' বসিয়ে বলেছেন '*আল-রিবা*'। সকল বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, '*বাই*' শব্দের পূর্বে সংযোজিত '*আল*' দ্বারা সমগ্র বা জাতি বুঝানো হয়েছে। *বাই*-এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত সকল *বাই*কে বুঝানোই এর উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের এই অংশে আল্লাহ সকল প্রকার *বাই*কে (ক্রয়-বিক্রয়কে) *হালাল* ঘোষণা করেছেন। কিন্তু '*রিবা*' শব্দের পূর্বে বসানো '*আল*'-এর অর্থ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ প্রধানত তিন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

দাউদ আল-যাহিরী, তকি আল-দ্বীন আস-সুবকি, আত-তাহাভী, আব্দুল হামিদ আল-বায়যাবী, আত-তাবারী, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী ও ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ প্রমুখ তাফসীরকার, হাদীসবেত্তা ও ফিক্বাহবিদগণ বলেছেন, *রিবা* শব্দের পূর্বে সংযোজিত '*আল*' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবরা যে *রিবা* লেনদেন করত, যে *রিবা*র সাথে তারা পরিচিত ছিল, সেই বিশেষ পরিচিত (Previous Familiarity) *রিবা*কে বুঝানোর জন্যই '*আল*' শব্দ বসানো হয়েছে। এই *রিবা*কে *রিবা নাসীয়াহ্*ও বলা হয়। অর্থাৎ আয়াতের এই অংশে মহান আল্লাহ কেবল *রিবা আল-জাহিলিয়্যাত* বা *রিবা নাসীয়াকেই হারাম* ঘোষণা করেছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য সকল প্রকার *রিবা* নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীস দ্বারা।

অপর এক দল বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে যে, এখানে *রিবা*র পূর্বে যুক্ত '*আল*' শব্দটি সমষ্টি, সাধারণ (general/*mujmal*) ও জাত (genus) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, পূর্ব পরিচিতি অর্থে নয়। আল-কিয়া আল-হারিসী, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ বিশিষ্ট আইনবেত্তাগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, এখানে *আল-রিবা* বলতে সকল প্রকার *রিবা*কে বুঝানো হয়েছে। আল-কুরআনের এই নিষেধাজ্ঞা আইনত নিষিদ্ধ সকল প্রকার *রিবা*র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আল-জাস্সাস, আল-ফখর আল-ইসলাম, আল বাদাবী, ইবনে রুশদ আল-মালিকী ও হানাফী স্কুলের ফক্বীহগণ ভিন্নতর আর এক অবস্থান নিয়েছেন। তাঁদের মতে, আল-কুরআনে ব্যবহৃত *রিবা* শব্দটি হচ্ছে অস্পষ্ট (*Ijmal*/obscure/undetailed); আইন প্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা ব্যতীত এর প্রকৃত অর্থ বুঝা সম্ভব নয়।

তাঁরা বলেছেন, *রিবার* শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। কিন্তু শরীয়তে সকল প্রকার বৃদ্ধিকে *রিবা* বলা হয়নি; বরং এক বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে *হারাম* ঘোষণা করা হয়েছে। আল-জাস্সাস এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, আরবরা নির্ধারিত সময়ের জন্য দিরহাম ও দীনার ধার দিতো এবং ঋণের আসলের ওপর সময়ের বিনিময় হিসেবে 'অতিরিক্ত' ধার্য করতো। শরীয়তে এই বৃদ্ধিকে *রিবা* বলা হয়েছে। অপরদিকে সোনার সাথে সোনা বা রূপার সাথে রূপা পরিমাণে কম-বেশি করে নগদ বিনিময় করা হলে এক পক্ষের

www.icsbook.info

বাড়তি অংশ যে *রিবা* হয়, আরবরা তা জানতো না। তাছাড়া, সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা বাকিতে বিক্রয় করা হলে বাকির মেয়াদ যে *রিবা* (রিবা আল নাসা) হয় সেটাও তাদের জানা ছিল না। কিন্তু আইনে বাড়তি অংশ ও বাকির মেয়াদ এ দুটোকেই *রিবা* বলা হয়েছে। বস্তুতঃ *রিবা* শব্দটি অন্যান্য অস্পষ্ট বিশেষ্য পদের শব্দের ন্যায় একটি অস্পষ্ট বিশেষ্য পদের শব্দ; একে যথার্থ অর্থে বুঝতে হলে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী সুস্পষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সুতরাং হাদীসে যত প্রকার *রিবার* কথা বলা হয়েছে তার সবই *আল-রিবার* অন্তর্ভুক্ত।

আল-কুরতুবী এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ভিন্নতর যুক্তিতে। তাঁর মতে, "আয়াতে ব্যবহৃত *আল* শব্দটি পূর্ব পরিচিতি বুঝাচ্ছে, আর তা হচ্ছে, আরবরা যে *রিবা* লেনদেন করতো সেই *রিবা*; অতঃপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যেসব *রিবা* নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত...... ।"[৭১]

আল-শাতিবী বলেছেন যে, "এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জাহিলিয়্যাতের *রিবাকে* নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর *রিবার* একটি ধরন ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বিনিময়হীন অতিরিক্ত থাকার কারণেই এই ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর সুন্নাহ একই অর্থে সকল প্রকার *রিবাকে* এর সাথে শামিল করেছে।"[৭২]

বাদাবী দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিমতের মধ্যে তুলনা করে বলেছেন যে, এই দুই মতের প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় মতে একই কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সকল প্রকার *রিবাই আল-রিবা* শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি নিজে প্রথম অর্থাৎ আল-কুরআন কেবল *রিবা আল-জাহিলিয়্যাত* বা *রিবা আল-নাসীয়াকে* নিষিদ্ধ করেছে, এই মতকে অধিকতর পছন্দনীয় বলে অভিমত দিয়েছেন।[৭৩]

বস্তুতঃ তাফসীরকার, হাদীসবেত্তা ও ফিক্বাহবিদদের ব্যাখ্যা অনুসারে আল-কুরআনে নিষিদ্ধ *রিবা* ও আল-হাদীসে নিষিদ্ধ *রিবা* ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করার কারণেই *আল-রিবার* অর্থ ও আওতা-পরিধি নিয়ে উক্ত মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, ফিক্বাহ শাস্ত্রে বাকির মেয়াদকে *রিবা* বলার কারণে এই *রিবাকে আল-রিবার* মধ্যে শামিল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আল-কুরআনের *রিবা* সংক্রান্ত আয়াতসমূহে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার আলোকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আল-কুরআন কেবল *রিবা নাসীয়াকেই* নিষিদ্ধ করেছে যা জাহিলিয়্যাতের যুগে প্রচলিত ছিল; আর এর বাইরে *রিবা আল-ফদল* ও *রিবা আল-নাসাকে* নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসের দ্বারা।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী বলেছেন, *রিবা* হচ্ছে দুই প্রকারঃ এক প্রকার হচ্ছে প্রকৃত *রিবা* এবং অপরটি হচ্ছে *রূপক রিবা* (figurative/metaphorical); প্রকৃত *রিবা* হচ্ছে

---

৭১. *তাফসীর আল-কুরতুবী*, ভলি-৩, পৃঃ ৩৫৭, উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৪।

৭২. *আল-মুয়াফ্ফাক্বাত*, ভলি-৪, পৃঃ ৪১; উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৭৩. বাদাবী, ইবিদ, পৃঃ ৫৫।

www.icsbook.info

দেনার ওপর *রিবা* যা জাহিলী যুগে আরবরা ব্যাপকভাবে লেনদেন করতো; প্রকৃত *রিবাকে* নিষিদ্ধ করেছে আল-কুরআন; আর দ্বিতীয় প্রকারের *রিবা* হচ্ছে *'রিবা আল-ফদল'*; *রিবা আল-ফদলকে* নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। *রিবা-ফদল* হচ্ছে আসল *রিবার* সম্প্রসারণ (extension); একে কেবল রূপক অর্থে *রিবা* (as a metaphor/ figurative) বলা হয়েছে।[৭৪]

এ ব্যাপারে দাউদ আল-জাহিরী বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে *রিবা* হচ্ছে কোন বস্তুর নিজস্ব পরিমাণ বেড়ে যাওয়া (excess in the thing itself); তাই প্রতিমূল্যের ওপর বৃদ্ধি *রিবা* নয় বরং এরূপ বৃদ্ধিকে কেবল রূপক অর্থে রিবা বলা যায়।[৭৫]

বস্তুতঃ ঋণের ওপর বৃদ্ধিকে একই বস্তুর নিজ পরিমাণের বৃদ্ধি গণ্য করে তাকে বলা হয়েছে প্রকৃত *রিবা*। কিন্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে একই জাতের অর্থ বা পণ্যের বেশি পরিমাণকে বলা হয়েছে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বৃদ্ধি; একে বলা হয়েছে রূপক অর্থে *রিবা*। এটি একটি পরস্পরবিরোধী অবস্থা। কারণ, ঋণগ্রহীতা ঋণ হিসেবে যে জাতের অর্থ বা পণ্য গ্রহণ করে তা খরচ করে নিঃশেষ করে ফেলে। অতঃপর অনুরূপ অর্থ বা পণ্য যোগাড় করে ফেরত দেয়। সুতরাং ঋণে একই বস্তু লেনদেন হয় একথা আদৌ ঠিক নয়; বরং একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লেনদেন হয় যার একটি হয় অপরটির *কাউন্টার ভ্যালু*। আর ঋণের ক্ষেত্রে এই *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে তা হয় *রিবা নাসীয়াহ্*। একইভাবে কোন বস্তু ভিন্ন জাতের অপর কোন বস্তুর বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা হলে বাকি দাম হয় এক পক্ষের দেনা, অপরপক্ষের পাওনা কাউন্টার ভ্যালু। এই কাউন্টার ভ্যালুর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে তাকেও বলা হয় রিবা নাসীয়াহ্। সুতরাং প্রকৃত *রিবা* আসলে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরেই ধার্য করা হয়। অনুরূপভাবে কোন অর্থ বা পণ্য একই জাতের অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা হলে তার একটি হয় অপরটির *কাউন্টার ভ্যালু*। আর কোন একটি *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে (পরিমাণে বেশি করা হলে) তা হয় *রিবা ফদল*। ঋণ ও বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় নগদ লেনদেনেও অতিরিক্ত আসলে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরই ধার্য করা হয়, মূল বস্তুর ওপর নয়। একথা ঋণসহ সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেই সত্য। সুতরাং ঋণে মূল বস্তু বৃদ্ধি পায়, আর অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বৃদ্ধি ধার্য করা হয়– এই পার্থক্য সঠিক নয়।

প্রকৃত কথা হচ্ছে ঋণও এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়; আর ঋণসহ যে কোন ক্রয়-বিক্রয়ে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে *কাউন্টার ভ্যালুর* পরিমাণ বেড়ে যায়। এটাই হচ্ছে *কাউন্টার ভ্যালুর* নিজ পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া– excess in the thing itself. *রিবা* দ্বারা *কাউন্টার ভ্যালুর* পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; মূল বস্তুর পরিমাণ নয়।

---

৭৪. *Hujjat Allah Al-Balighah,* Vol-2,p. 106-107, উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩, টীকা নম্বর ঃ ১২।

৭৫. উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩, টীকা নম্বর ঃ ১১।

www.icsbook.info

উল্লেখ্য যে, হাদীস বা সুন্নাহ হচ্ছে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ যা কিছু 'ওহী' করেন তার সবটুকু, কোন প্রকার বাড়তি-কমতি না করে, দুনিয়াবাসীর কাছে হুবহু পৌঁছে দেওয়া এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তার যথার্থ অর্থ ও ব্যাখ্যা মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া। আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, "আমরা তোমার ওপর এই যিকর নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পার যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।" (*"And we have sent down unto thee Message (dhikr) that thou Mayest explain clearly to men what is sent for them."*) (আল-কুরআন)। বস্তুতঃ আল-কুরআনে নেই এমন কোন *রিবা*কে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ করেননি। সুতরাং কুরআনে ব্যবহৃত '*রিবা*' শব্দের পূর্বে *আল* বসিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা *রিবার* সংজ্ঞার আওতার মধ্যে পড়ে এমন সব *রিবাকেই* বুঝিয়েছেন; আর এই *রিবা* নিষিদ্ধ করে মৌলিক বিধি-বিধান আল্লাহ নিজে নাযিল করেছেন। তারই ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধান তুলে ধরেছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান প্রদান করেছেন এবং এসব বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা হলে বিভিন্ন ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে কিভাবে *রিবা* উদ্ভূত হয় তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বস্তুতঃ '*বাই*' যেমন এক ধরনের চুক্তি তেমনি *রিবা*ও আর এক ধরনের চুক্তি। উবাদা ইবনে সামিত বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত শর্ত মুতাবেক চুক্তি করা হলে তা হয় *বাই* বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, যা আল্লাহ *হালাল* করেছেন। আর এর কোন একটি, দুটি বা তিনটি শর্ত লঙ্ঘন করে চুক্তি করা হলে তা হয় *রিবা* চুক্তি, আল্লাহ যাকে *হারাম* করেছেন। হাদীসে বর্ণিত *বাই* সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান আল-কুরআনে নেই; তেমনি *রিবার* যাবতীয় আইন-বিধানও আল-কুরআনে নেই। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বক্তব্য মিলেই *আল-বাই* এবং আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ব্যাখ্যা মিলিয়েই *আল-রিবা*। সুতরাং *আল-রিবা*র মধ্যে কুরআনে বর্ণিত *রিবা* যেমন আছে, তেমনি হাদীসে বর্ণিত *রিবা*ও এর অন্তর্ভুক্ত। '*Al-Riba* is all inclusive.' অর্থাৎ "সকল রিবাই আল-রিবার অন্তর্ভুক্ত।"

আয়াতে ব্যবহৃত '*বাই*' ও '*রিবা*' দুটি শব্দই হচ্ছে এক বচনে (singular number), বিশেষ্য পদ (noun); আর উভয় শব্দের পূর্বে বসানো হয়েছে '*আল*'।[৭৬] তাছাড়া পারস্পরিক তুলনামূলক অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, "a singular noun with a confined meaning preceeded by the definite article denotes generality."[৭৭] "অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অর্থ জ্ঞাপক এক বচনে ব্যবহৃত কোন বিশেষ্য পদের পূর্বে নির্দিষ্ট আর্টিকেল বসালে তা সমগ্র অর্থ নির্দেশ করে।" যেমন আল-হামদু– সকল প্রশংসা। পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এখানে *বাই*

---

৭৬. কামালি, এম, হাশিমঃ পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৪২।

৭৭. উদ্ধৃত, বাদাবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫, টীকা নম্বরঃ ৪৭।

www.icsbook.info

অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়; আর এর পূর্বে *আল* যোগ করায় এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়; অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে '*আল-বাই*'। অনুরূপভাবে তুলনামূলক অর্থে *আল-রিবার* অর্থও সকল প্রকার *রিবা* হওয়া বাঞ্ছনীয়; সুতরাং *রিবার* সংজ্ঞার আওতায় আসে এমন সকল *রিবার* সমষ্টিই হচ্ছে '*আল-রিবা*'। এখানে *আল-রিবার* অন্যবিধ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সুদের বৈশিষ্ট্য

পূর্বে উল্লেখিত সুদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সুদের কতিপয় অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

১. সুদের ক্ষেত্র ক্রয়-বিক্রয়;
২. সুদ অবৈধ চুক্তির ফল;
৩. সুদ ক্রয়-বিক্রয়ে একদিকের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর আরোপিত অতিরিক্ত;
৪. সুদের কোন বিনিময় বা *কাউন্টার ভ্যালু* বা মূল্যের সমতা নেই (no equivalence);
৫. সুদে পারস্পরিক লেনদেন নেই (no reciprocity);
৬. সুদ গুণে গুণে বাড়ে;
৭. কারবার বা কারবারের ফলাফলের সাথে সুদের কোন সম্পর্ক নেই;
৮. সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত;
৯. সুদে কোন বাণিজ্যিক ঝুঁকি নেই।

নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১. সুদের ক্ষেত্র ক্রয়-বিক্রয় ঃ উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, সুদের সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে। ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে বিনিময় দিয়ে নেওয়া; কিন্তু সুদ হচ্ছে বিনিময় না দিয়ে নেওয়া। বিনিময় না দিয়ে পরের সম্পদ নেওয়ার বহু ধরন আছে। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, জবর-দখল, ধোকাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, চোরা-কারবারী, ঘুষ, দুর্নীতি, জুয়া, চোরাচালানী ইত্যাদি। এসবই হচ্ছে পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ বা গ্রাস করা। কিন্তু এর কোনটাকেই *রিবা* বলা হয়নি। রিবা হচ্ছে কেবল সেই অন্যায় ভক্ষণ যা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে একদিকের কাউন্টার ভ্যালুর ওপর ধার্য করে বিনিময় না দিয়ে নেওয়া হয়।

২. সুদ অবৈধ চুক্তির ফল ঃ সুদী লেনদেনে প্রকৃত পক্ষে দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয় ঃ একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি আর দ্বিতীয়টি *রিবা* বা সুদ চুক্তি। ক্রেতা-বিক্রেতা যখন কোন নির্ধারিত পণ্য, অর্থ বা সেবা নির্ধারিত *কাউন্টার ভ্যালুর* বিনিময়ে পরস্পর লেনদেন করে তখন তা হয় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি; কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারিত *কাউন্টার ভ্যালুদ্বয়ের* কেবল একটির ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য ও লেনদেন করতে রাজী হয় তখন সেই চুক্তি হয় সুদ বা *রিবা* চুক্তি। এই চুক্তিতে এক পক্ষের দেয় *কাউন্টার*

ভ্যালুর ওপর অতিরিক্ত ধার্য ও লেনদেনের কথা বলা হয় কিন্তু অপর পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অনুরূপ অতিরিক্ত ধার্য ও বিনিময় করার কথা বলা হয় না। ফলে *রিবা* চুক্তির বলে এক পক্ষের ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত হয়ে পড়ে বিনিময়হীন বা মাগনা। আর এজন্যই তা হয় সুদ বা *রিবা*। উদাহরণস্বরূপ, ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে দাতা বা মহাজন ঋণ প্রার্থীর কাছে প্রস্তাবিত ঋণের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর কখনও দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক সরল বা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ দাবী করে (সুদ প্রদানের ঈজাব বা প্রস্তাব করে); আর প্রার্থী উক্ত প্রস্তাবে রাজী (*কবুল*) হয়। এভাবে তাদের মধ্যে ঋণ তথা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে *রিবা* চুক্তি সম্পাদিত হয়। অনুরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য, অর্থ বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রেতা স্থগিতকৃত বা বাকি *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর স্থগিত মেয়াদ ও অপারগতায় পরবর্তী বর্ধিত মেয়াদের জন্য যদি সুদ দাবী করে আর ক্রেতা যদি তাতে সম্মত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বাকি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে *রিবা* চুক্তিও সম্পাদিত হয়ে যায়। অতঃপর *রিবা* চুক্তির শর্তানুসারে ঋণগ্রহীতা ও বাকি ক্রেতা কর্তৃক দেয় নির্ধারিত *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর প্রতিদিন সুদ যোগ হতে থাকে। চুক্তিতে সরল সুদ আরোপের শর্ত থাকলে সরল হারে, আর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য করার কথা থাকলে চক্র বৃদ্ধি হারেই সুদ বাড়তে থাকে। ঋণগ্রহীতা কোন *কাউন্টার ভ্যালু* না পাওয়া সত্ত্বেও একমাত্র চুক্তির কারণেই এই সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।

এ প্রসঙ্গে খান ও মিরাখোর বলেছেন, "Interest is regarded as representing an unjustified creation of instantaneous property rights: unjustified, because interest is a property right claimed outside the legitimate framework or recognized property rights; instantaneous, because as soon as the contract for lending upon interest is concluded, a right to the borrower's property is created for the lender"[৭৮]

অর্থাৎ "সুদ হচ্ছে সম্পদের ওপর সৃষ্ট অন্যায় ও তাৎক্ষণিক অধিকার; এ অধিকার অন্যায় (unjustified) এজন্য যে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার যাবতীয় বৈধ ও স্বীকৃত পন্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এক পদ্ধতিতে সম্পদের ওপর এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়; আর এ অধিকার তাৎক্ষণিক সৃষ্ট এজন্য যে, সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথেই ঋণগ্রহীতার সম্পদের ওপর ঋণদাতার এ অধিকার সৃষ্টি হয়।" এটা ঠিক জুয়ার চুক্তির মত। জুয়াতে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, খেলায় যে পক্ষ হারবে সে পক্ষ অপর পক্ষকে, ধরা যাক, ১০,০০০/- টাকা দিতে বাধ্য

---

৭৮. Khan Mohsin S. and Abbas Mirakhor, (Editors) 1987, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance,* The Institute for Research and Islamic Studies, p. 4, quoted by Siddiqui, M. N., *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition,* Islamic Research and Training Institute, 2004, Islamic Development Bank, Jeddah, KSA, P. 43.

www.icsbook.info

থাকবে। অতঃপর যে হারে সে অপর পক্ষকে ১০,০০০/- টাকা দিয়ে দেয়; এমনকি, অনেক সময় জমি-জমা, বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-সন্তান বিক্রি করে হলেও জুয়ার অর্থ পরিশোধ করতে দেখা যায়। এভাবে কেবল চুক্তির কারণে একজনের সম্পদ বিনামূল্যে অপরের কাছে চলে যায়। সুদের বেলাতেও ঠিক তাই হয়। বস্তুতঃ সুদ ধার্য ও পাওনা হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে *রিবা* চুক্তি। এই চুক্তির বলেই অনধিকারকে অধিকার বলে চালানো হয়। সুতরাং সুদ হচ্ছে অবৈধ চুক্তির ফল।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তো পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুদী কারবার এক ধরনের ব্যবসা। দাতা-গ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই সুদ-চুক্তি করা হয়। তাহলে এ চুক্তি অবৈধ হবে কেন?

একথা ঠিক যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে পারস্পরিক সম্মতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু মনে রাখতে হবে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে কোন *হালালকে* *হারাম* বা কোন *হারামকে* *হালাল* বানানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যিনা ও জুয়ার কথা বলা যায়। যিনা ও জুয়া ইসলামে *হারাম*; কোন নারী-পুরুষ যদি পরস্পর সম্মত হয়ে যিনায় লিপ্ত হয় অথবা কতিপয় খেলোয়াড় একমত হয়ে যদি জুয়ার আড্ডা বসায়, তাহলে এই যিনা বা জুয়া *হালাল* হয়ে যায় না। এমনকি, দুনিয়ার সকল মানুষ একমত হয়েও যদি যিনা ও জুয়াকে *হালাল* বলে তাহলে এসব *হারাম* কখনও *হালাল* হয় না। অনুরূভাবে ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ও *হালাল*। আর পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে একজনের সম্পদ বিনিময় না দিয়ে কেবল চুক্তির বলে আর এক জনে নিয়ে গেলে তাকে ক্রয়-বিক্রয় বলা যায় না। বরং একে বড় জোর পরের সম্পদ মাগনা নেওয়া, বাতিল পন্থায় পরের সম্পদ ভক্ষণ করা বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা মানব সমাজের জন্য কিছুতেই হিতকর হতে পারে না; তাই *হালাল* হতে পারে না। *আল*-কুরআনের যে আয়াতে আল্লাহ পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করার কথা বলেছেন সেই আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ এটাও বলেছেন যে, "তোমরা কেউ অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" ব্যবসা করতে হলে ক্রয়-বিক্রয় জরুরী; আর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে উভয় পক্ষের সম্পদের পারস্পরিক বিনিময়। সুদে পারস্পরিক বিনিময় নেই; সুদ ক্রয়-বিক্রয়ই নয়; পারস্পরিক সম্মতির প্রশ্নই এখানে অবান্তর।

৩. সুদ ক্রয়-বিক্রয়ে একদিকের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ঃ *রিবার* সংজ্ঞা আলোচনা পর্যায়ে বিভিন্ন মাযহাবের নেতৃস্থানীয় ফকী, বিশেষ করে, ইমাম সারাখসীর উদ্ধৃতি দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, "*রিবা* হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ে দুটি প্রতিমূল্যের কোন একটির ওপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত যার কোন *কাউন্টার ভ্যালু* নেই।" অতঃপর বিভিন্ন প্রকার ও ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে *কাউন্টার ভ্যালু* নির্ধারণের বিধান উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, বিধান অনুসারে নির্ধারিত কোন একটি *কাউন্টার ভ্যালুর*

www.icsbook.info

ওপরে, সময়ের কারণে হোক, অথবা ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে হোক, কোন প্রকার অতিরিক্ত ধার্য করা হলে এবং অপরপক্ষ সেই অতিরিক্তের বিনিময় না দিলে, সেই অতিরিক্ত হয় *রিবা*। এখানে আবার সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে কেবল এতটুকু বলে রাখা যায় যে, *রিবা* হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অতিরিক্ত যা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে কেবল এক পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর আরোপ করে আদায় করা হয়, আর অপর পক্ষ এর কাউন্টার ভ্যালু দেয় না।

৪. সুদের কোন বিনিময় বা কাউন্টার ভ্যালু নেই (no equivalence) ঃ উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, সুদ চুক্তিতে কেবল এক পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হয় অপর পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর সমমূল্যের বৃদ্ধি ছাড়াই। তাই সুদের কোন বিনিময় থাকে না। সুতরাং সুদ/*রিবা* হচ্ছে বিনিময়হীন বৃদ্ধি। এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থনীতিবিদগণ নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে সুদ কেন দিতে হবে তার যৌক্তিকতা দেখানোর অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। এসব যুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এর দ্বারা সুদের যৌক্তিকতা তথা সুদের *কাউন্টার ভ্যালু* আছে, সে কথা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। এসব যুক্তির অসারতা বুঝতে হলে দীর্ঘ আলোচনা দরকার। তাই পৃথকভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো ইনশাআল্লাহ্।

৫. সুদে পারস্পরিক লেনদেন নেই ঃ সুদ এক পক্ষ দেয়, অপর পক্ষ নেয়। যে নেয় সে এর বিনিময়ে কিছু দেয় না; আর যে দেয় সে এর বিনিময়ে কিছু পায় না। সুদ হচ্ছে একতরফা দেওয়া ও একতরফা নেওয়া। এর বিপরীতে ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষ দেয় এবং উভয় পক্ষ নেয়। এখানে লেনদেন উভয়টাই পারস্পরিক; কিন্তু সুদে পারস্পরিক লেনদেন হয় না। সকল প্রকার সুদেরই এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. সুদ গুণে গুণে বাড়ে ঃ সুদ, বিশেষ করে, *রিবা নাসিয়ার* স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময়ের সাথে গুণে গুণে বৃদ্ধি পাওয়া। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তা'য়ালা '*আদয়াফাম মুদায়াফাহ*' শব্দ দ্বারা সুদের এই প্রবণতার কথা বর্ণনা করেছেন। সুদের হার খুব নিম্ন হোক বা খুব উচ্চ হোক, সময়ের সাথে তা গুণে গুণে বৃদ্ধি পাবেই, এমনিক, সুদ যদি সরল হারের হয় তবুও। আর চক্রবৃদ্ধি হারের ক্ষেত্রে সুদের বৃদ্ধি আরও বেশি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

৭. কারবার বা কারবারের ফলাফলের সাথে সুদের কোন সম্পর্ক নেই ঃ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অর্জিত প্রকৃত ফলাফল তথা লাভ-লোকসানের ওপর ভিত্তিশীল নয়। বরং লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে সকল অবস্থাতেই সুদ অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া, সুদ কেবল উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক ঋণের ওপরই ধার্য করা হয় তা নয়; বরং চরম অভাবে নিপতিত লোকদের ভোগ্য ঋণ, এমনকি, রাজনৈতিক কারণে গৃহীত ঋণের ওপরও সুদ ধার্য করা হয়।

www.icsbook.info

সর্বোপরি, শুধু ঋণ ও দেনা নয়, বরং সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়েই সুদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের ধরন, উদ্দেশ্য ও ফলাফল সুদের শর্ত নয়।

৮. সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত ঃ সুদ হচ্ছে এক ধরনের চুক্তি; আর চুক্তিতে সুদ নির্ধারিত থাকাটাই স্বাভাবিক। এজন্যই বলা হয় সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। আধুনিককালে প্রচলিত সুদের ভাসমান হার (floating rate) সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে চুক্তিতে একথাই বলা হয় যে, এ ঋণে floating rate অনুসারে সুদ ধার্য করা হবে। এখানে floating rate-ই সুদের পূর্বনির্ধারিত হার, যা অবশ্যই ঋণাত্মক ও নিশ্চিত। কোন কোন ঋণ ও দেনার ক্ষেত্রে চুক্তি করার সময়ে সুদের চুক্তি করা হয় না, কিন্তু নির্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঋণ/দেনা পরিশোধ করতে না পারলে মিয়াদ বৃদ্ধির বিনিময়ে সুদ ধার্য করা হয়। এক্ষেত্রেও সুদ পূর্বনির্ধারিত; কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে সুদ চুক্তি যখন করা হয় তখনই সুদ নির্ধারণ করা হয়। সুতরাং সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত।

৯. সুদে কোন বাণিজ্যিক ঝুঁকি নেই ঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, উৎপাদন ও লাভ করাই হচ্ছে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য; কিন্তু চাহিদা-যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগে কখনও আশাতীত লাভ যেমন হয়, তেমনি আবার লোকসান, এমনকি, অস্বাভাবিক লোকসানও হয়ে থাকে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লোকসানের এই ঝুঁকিকে বলা হয় বাণিজ্যিক ঝুঁকি। কিন্তু সুদ হচ্ছে কাউন্টার ভ্যালুর ওপর আরোপিত বৃদ্ধি যা সর্বদাই ধনাত্মক (positive)। সুতরাং সুদে বাণিজ্যিক ঝুঁকি নেই।

www.icsbook.info

বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্ভূত রিবা

বস্তুতঃ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন এক চুক্তি (Contract) যেখানে সমমূল্যের পণ্য, মুদ্রা বা সেবা পারস্পরিক বিনিময় করা হয়। অপরদিকে, রিবা হচ্ছে এমন চুক্তি যা দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের দেয় কাউন্টার ভ্যালুর ওপর অতিরিক্ত ধার্য ও আদায় করে নেয়, কিন্তু সেই অতিরিক্তের দাম বা কাউন্টার ভ্যালু দেয় না। কোন লেনদেনে এই দু'টি চুক্তি একত্রিত হলেই তা সুদী লেনদেনে পর্যবসিত হয়। আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন। আর রিবাকে হারাম করেছেন"– এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ হালাল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে রিবা চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসে বিভিন্ন দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এক বিক্রয়ে দুই লেনদেন নিষিদ্ধ"; "এক লেনদেনে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ"; "এক ক্রয়-বিক্রয়ে দুই দাম নিষিদ্ধ"; "যে এক লেনদেনে দুই বিক্রয় করে তার উচিত কেবল মূলটা গ্রহণ করা, অন্যথায় সে সুদ খায়"; "যে এক লেনদেনে দুই বিক্রয় করে তাকে অবশ্যই কম দামটি গ্রহণ করতে হবে, অথবা সুদ খেতে হবে।" ইবনে মাসুদ বলেছেন, "এক ক্রয়-বিক্রয়ে দুই দাম সুদ জন্ম দেয়।" অধিকাংশ মাযহাবেও এই একই কথা বলা হয়েছে যে, "এক লেনদেনে দুই বিক্রয় করা হলে তা রিবা হয়।"[১] বিভিন্ন প্রকার হালাল ক্রয়-বিক্রয়ে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় পরবর্তী আলোচনায় তা দেখানো হলো।

বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা

বাকি ক্রয়-বিক্রয় দুই রকমের হয় ঃ ১) সমজাতের বস্তু বাকি ক্রয়-বিক্রয় ও ২) অসমজাতের বস্তু বাকি ক্রয়-বিক্রয়। প্রথম ক্ষেত্রে বাকি থাকা কাউন্টার ভ্যালুকে বলা হয় ঋণ, কর্দ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাকি থাকা কাউন্টার ভ্যালুকে বলা হয় দেনা বা দাইন। নিচে কর্দ ও দেনার পার্থক্য, কর্দ ও দেনা কাকে বলে এবং কর্দ ও দেনার ওপর পৃথক চুক্তি দ্বারা কিভাবে সুদ ধার্য করা হয় তা দেখানো হলো ঃ

কর্দ ও দাইনের পার্থক্য ঃ *কর্দ* ও *দাইন* শব্দ দুটি আরবী। *কর্দ* অর্থ হচ্ছে ঋণ, loan, debt, liability; *দাইনের*ও অর্থ হচ্ছে দেনা, loan, debt, liability. কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। *দাইন*-এর পরিধি ও আওতা *কর্দ* অপেক্ষা

১. নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।

www.icsbook.info

ব্যাপকতর। *দাইন* হচ্ছে সাধারণ (general): *কর্দ* (loan) হচ্ছে বিশেষ। অগ্রিম বিক্রয় (*বাই সালাম*), বাকি বিক্রয় (*বাই-মোয়াজ্জল*) ইত্যাদি সবই *দাইনের* অন্তর্ভুক্ত। Al-Raghib al-Ispahani, Ibn Athir and Wajhi al-Din al-Thanwi determined that dayn includes qard.[২] "আল-রাগিব আল ইস্পাহানি, ইবনে আছির ওয়াজি আল-দ্বীন আল-থানবী এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কর্দ দাইনের অন্তর্ভুক্ত।" It is obvious... about qard that the word dayn applies to it. This is maintained by the majority of the jurists, and those who oppose it are few[৩]. "এ ব্যাপারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্দের জন্য দাইন শব্দটি প্রযোজ্য। অধিকাংশ ফিক্বাহবিদের এটাই মত; যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।" কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে বা কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন অথবা অন্য কোন কারণে সেই ব্যক্তির ওপর যে আর্থিক বা অ-আর্থিক দায় বর্তায়, যা থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়, সেই সকল দায়কেই বলা হয় *দাইন* বা দেনা। ইবনে নাজিম বলেছেন, "কারো দায়িত্বে কোন হক (অধিকার) আদায় করা বাধ্যতামূলক হলে তাকে *দাইন* বলা হয়"।[৪] সুতরাং আর্থিক, অ-আর্থিক সকল প্রকার দায়ই *দাইনের* অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, আল্লাহর হক যেমন, অনাদায়ী '*সালাত*', '*যাকাত*' ও '*রোযা*' হচ্ছে আল্লাহর নিকট মুমিনের *দাইন*। আল্লাহর হকজনিত এই *দাইন*কে বলা হয় '*কাযা*'। যেমন, *কাযা রোযা*, *কাযা* নামায, *কাযা* হজ্জ ইত্যাদি। অপরদিকে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বা পণ্য ধার নিলে ঋণদাতার নিকট ঋণগ্রহীতার যে দেনা হয় তাকে বলা হয় *কর্দ*। "During the period between its delivery and satisfaction, it is established as a liability against a person and falls under the definition of dayn"[৫]. "কর্দ গ্রহণের সময় হতে পরিশোধ করা পর্যন্ত তা গ্রহীতার ওপর দায় হিসেবে থাকে এবং দাইনের সংজ্ঞার আওতায় এসে যায়।" আবার কোন পণ্য-সামগ্রী বাকিতে বিক্রয় করা হলে ক্রেতার কাছে বিক্রেতার পণ্যের দাম পাওনা থাকে। এই পাওনা হচ্ছে ক্রেতার *দাইন* বা দায়, liability, debt or loan. সুতরাং সাধারণভাবে কোন পণ্য, অর্থ বা সেবা সমজাতের (similar or homogeneous) অর্থ, পণ্য বা সেবার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় থেকে সৃষ্টি হয় *কর্দ*; আর কোন পণ্য, অর্থ বা সেবা ভিন্নতর (dissimilar or heterogeneous) কোন অর্থ, পণ্য বা সেবার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় থেকে উদ্ভূত হয় *দাইন*। নিচে আলোচনা করা হলো।

---

২. আল-জাসসাস, *আহকাম আল কুরআন*: উদ্ধৃত, বাদাবী, উপরোক্ত, পৃ: ৪৩।

৩. বাদাবী, উপরোক্ত, পৃ: ৪২।

৪. ইবনে নাজিম: *আল-মাউসুয়া আল-ফিক্বাহিয়্যাহ*, কুয়েত।

৫. Al-Hamawi, উদ্ধৃত, বাদাবী, উপরোক্ত, পৃ: ৪৩।

www.icsbook.info

নিচে ঋণ কাকে বলে এবং ঋণে কিভাবে *রিবা* হয়, তা নিয়ে আলোচনা করা হলো। পরবর্তীতে দেনা কাকে বলে এবং দেনায় কিভাবে সুদ হয়, তা দেখানো হবে।

কর্দ বা ঋণ

সমজাতের পণ্য, অর্থ বা সেবার বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র ধরন হচ্ছে '*কর্দ*' বা ঋণ। অবশ্য সমজাতের পণ্য, অর্থ বা সেবা লেনদেনের আরও কতিপয় ধরন চালু আছে। যেমন, *আমানত*, *ওয়াদীয়াহ*, *আরিয়্যাহ* ইত্যাদি। তবে এসব লেনদেন যথার্থ অর্থে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পড়ে না এবং এসব ক্ষেত্রে সুদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও তেমন একটা নেই। যা হোক, ঋণ কি, ঋণে কিভাবে সুদের উদ্ভব ঘটে সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে *ওয়াদিয়াহ* ও *আরিয়্যাহ* সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

***কর্দের* অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ** *কর্দের* আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কেটে আলাদা করা (to cut off)।[৬] সাধারণ অর্থে ভবিষ্যতে অনুরূপ জিনিস ফেরত পাওয়ার শর্তে কোন কিছু অপরকে দেওয়া হচ্ছে *কর্দ*।[৭] ইংরেজীতে একে বলা হয় loan, credit, debt, liability; বাংলায় আমরা বলি ঋণ, ধার, হাওলাত ইত্যাদি। লেন-এর আরবী ইংরেজী অভিধানে *কর্দের* সংজ্ঞা নিম্ন ভাষায় দেওয়া হয়েছে ঃ

"Loan in legal context is defined as a contract whereby one of the two parties transfers or passes the ownership of a definite amount of his property to the other party, so that the other party returns to the lender what is equivalent thereto in respect of quantity, kind and description."[৮] "ঋণের আইনী সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ঋণ হচ্ছে দুইটি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যেখানে এক পক্ষ তার সম্পদের সুনির্দিষ্ট পরিমাণের মালিকানা অপর পক্ষের নিকট এই শর্তে হস্তান্তর বা প্রদান করে যে, অপরপক্ষ ঋণদাতাকে এমন বস্তু ফেরত দিবে যা জাতে, মানে ও পরিমাণে প্রদত্ত সম্পদের সম্পূর্ণ সমান।"

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে "it is a contract by which the lender transfers something to the borrower in return for the latter's liability to give back the same thing, or its equivalence, or price/value in the

---

৬. আব্দুল্লাহ্ আলভী হাজী হাসান; (১৯৯৪), *Sales and Contracts in Early Islamic Law*, Islamic Research Institute, IIUC, P. 117; উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

৭. উমর বিন আব্দুল আজীজ মুত্রিকঃ *Al-Riba Wal Muamalat Al-Masrafiyyah,* 1st Edition, H. 1414, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।

৮. E. W. Lane, *Arabic English Lexicon,* Vol. 11, P. 25-151 উদ্ধৃত, ঈবিদ, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

market."[৯] "এটি (ঋণ) হচ্ছে এমন একটি চুক্তি যাতে ঋণদাতা কোন জিনিস এই শর্তে ঋণগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে যে, এই দায়ের বিনিময়ে ঋণগ্রহীতা অনুরূপ জিনিস বা এর সমতুল্য অথবা বাজার অনুসারে এর দাম/মূল্য ঋণদাতাকে ফেরত দিবে।" "It is also defined as a contract by which the lender transfers the ownership of something in return for its real equivalent or consideration."[১০] "ঋণকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, "এটি একটি চুক্তি যা দ্বারা ঋণদাতা প্রকৃত সমতুল্য বস্তু বা এর মূল্য ফেরতের শর্তে কোন বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর করে।" সম্মানিত ফক্বীহগণ বলেছেন যে, সাধারণভাবে *কর্দ* শব্দ দ্বারা অর্থ ও *ফাঞ্জিবল* পণ্যের ঋণকে বুঝায়; ঋণগ্রহীতা ব্যবহার করায় এ অর্থ বা পণ্য নিঃশেষ হয়ে যায়; ফলে তাকে যে পণ্য বা অর্থ ধার দেওয়া হয়েছিল সেই একই পণ্য/অর্থ (same goods) সে ফেরত দিতে পারে না; বরং বিবরণ অনুযায়ী অনুরূপ পণ্য (goods of identical description) বা অর্থ ফেরত দেয়।[১১] "সুতরাং *কর্দ* বলতে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা এবং মেয়াদ শেষে অনুরূপ (similar) পণ্য ফেরত দেওয়া বুঝায়।"[১২]

সুতরাং *কর্দ* হচ্ছে এক ধরনের বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (contract) যেখানে সমজাত ও মানের (identical, similar or homogeneous) অর্থ (মুদ্রা), ফাঞ্জিবল পণ্য বা সেবা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। "both in common usage of the term or in jurists' technical interpretation, the loan transaction represents a credit sale of this particular exchange (transference of the same good)."[১৩] "সাধারণ্যে প্রচলিত অর্থ বা ফিক্বাহবিদদের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা উভয় অর্থেই ঋণ হচ্ছে এই ধরনের (কোন বস্তু একই জাতের বস্তুর বিনিময়ে) বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়।"

সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ইত্যাদি তথা যে কোন পণ্য, অর্থ বা সেবা একই জাতের পণ্য, অর্থ বা সেবার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করা হলে ক্রেতার

---

৯. Nabel Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit*, 1992, p. 87, উদ্ধৃত, ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।

১০. ই, এম, নূর, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৬।

১১. ফারুক, আবু উমর এবং হাসান, এম, কবীর; *The Time Value of Money Concept in Islamic Finance*, The American Journal of Islamic Social Sciences, 23:1, পৃ: ৮৩।

১২. ফারুক, আবু উমর এবং হাসান, এম, কবীর : উপরোক্ত, p. 82.

১৩. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লাঃ *তরজমায়ে কুরআন মজীদ*, ফালাহ-ই-আম ট্রাষ্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, পৃ: ৬৮, টীকা : ১০২।

www.icsbook.info

কাছে এর *কাউন্টার ভ্যালু* বা বিনিময় মূল্য নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বাকি বা পাওনা থাকে। এই বাকি বা পাওনা *কাউন্টার ভ্যালুই* হচ্ছে ক্রেতা বা গ্রহীতার *কর্দ*, ঋণ, দায়, debt, liability or deferred liability।

কর্দের শর্ত ও বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে ঋণের যেসব শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঃ

১. বিনিময়ের পণ্য *ফানজিবল* বা *মালে ফানি* হওয়া;
২. মালিকানাসহ পণ্যটি ঋণগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করা;
৩. অনুরূপ পণ্য সমপরিমাণে (counter value) পরিশোধ করার শর্ত থাকা ও পরিশোধ করা;
৪. কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত থাকা;
৫. যাবতীয় ঝুঁকি গ্রহীতার ওপর থাকা;
৬. পাওনা *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর কোন বাড়তি বা উপহার-উপঢৌকনের শর্ত না থাকা।

নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো ঃ

১. বিনিময়ের পণ্য *ফান্‌জিবল* বা *মালে ফানি* হওয়া ঃ কর্দ বা ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময়ের পণ্য দুটি সাধারণত ফান্‌জিবল পণ্য হতে হয়। আরবী '*মালে ফানিকে*' ইংরেজীতে 'Fungible goods' বলা হয়। Fungible goods এমন পণ্যকে বলা হয় যা নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকারিতা (benefit) লাভ করা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, যে পণ্য ব্যবহার করলে পণ্যের উপযোগ (utility) বা usufruct এবং খোদ পণ্যটি একই দিকে চলে এবং উভয়টি একই সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় সেই পণ্যই হচ্ছে *ফান্‌জিবল* পণ্য। সহজ করে বলা যায়, যে পণ্য (একবার) ব্যবহার করলেই নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই পণ্যই হচ্ছে *ফান্‌জিবল* পণ্য। *ফান্‌জিবল* পণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটি। যথা ঃ

১. (একবার) ব্যবহার করলেই নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হওয়া;
২. সেবা প্রবাহ বা flow of service না থাকা এবং
৩. পণ্য থেকে পণ্যের সেবা (service) পৃথকযোগ্য না হওয়া।

উদাহরণস্বরূপ চালের কথা বলা যায়, একবার ব্যবহার করলেই চাল আর চাল থাকে না; নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, চালের সেবা আছে; কিন্তু সেবার প্রবাহ নেই; অর্থাৎ একই চাল একাধিকবার ভাত দিতে পারে না। তৃতীয়ত, চালের সেবাকে চাল থেকে পৃথক করা যায় না; অর্থাৎ চাল থেকে সেবা নেওয়া হলে চাল থাকে না; আর যতক্ষণ তা চাল থাকে ততক্ষণ এ থেকে কোন সেবা নেওয়া যায় না। অর্থ বা মুদ্রা, যেমন, টাকা, দীনার, দিরহাম, ডলার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এসব পণ্য, অর্থ বা সেবা কাউকে দিলে গ্রহীতার পক্ষে এ থেকে একবারের বেশি উপকার নেওয়া সম্ভব হয় না। একবার ব্যবহার করার সাথে সাথেই এসব পণ্য নিঃশেষ

www.icsbook.info

বা রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এর *কাউন্টার ভ্যালু* দায় হয়ে গ্রহীতার ঘাড়ে চেপে বসে। **এই দায়কেই বলা হয় কর্দ বা ঋণ।** গ্রহীতাকে পুনরায় সমপরিমাণের অনুরূপ পণ্য যোগাড় করে উক্ত ঋণ বা বাকি *কাউন্টার ভ্যালু* পরিশোধ করতে হয়; অন্যথায় ঋণের দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ফানজিবল পণ্য না হলে এরূপ দায় সৃষ্টি হয় না।

২. মালিকানাসহ পণ্যটি গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করা ঃ ঋণ বাবদ কোন অর্থ (মুদ্রা) বা পণ্য কাউকে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পণ্যটির মালিকানা গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া যাতে মালিক হয়ে নিজ ইচ্ছামাফিক সে পণ্যটি ব্যবহার করতে বা কাজে লাগাতে পারে। অবশ্য মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত করেছেন। কিন্তু ঋণ হচ্ছে একই জাতের পণ্যের বিনিময়ে বাকিতে কোন *ফান্‌জিবল* পণ্য বিক্রয় করা। আর পরস্পর মালিকানা হস্তান্তর ব্যতীত বাকি ক্রয়-বিক্রয় হয় না। ঋণ লেনদেনে ঋণদাতা মালিকানাসহ তার পণ্য, অর্থ বা সেবা তাৎক্ষণিক গ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করে দেয়। ফলে প্রদত্ত পণ্য, অর্থ বা সেবার ওপর থেকে তার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এর *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বাকি বা পাওনা হিসেবে গ্রহীতার জিম্মায় থাকে। অপরদিকে ঋণগ্রহীতা মালিক হয় গৃহীত পণ্য, অর্থ বা সেবার, যার *কাউন্টার ভ্যালু* হয় তার ঋণ, দেনা, debt, credit, liability। সুতরাং ঋণ বাবদ প্রদত্ত পণ্য, অর্থ বা সেবার মালিকানা হস্তান্তর করাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তা ঋণ বা বাকি ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হয় না।

৩. অনুরূপ পণ্য সমপরিমাণে (counter value) পরিশোধ করার শর্ত থাকা ও পরিশোধ করা ঃ ঋণ লেনদেনে সাধারণত ভবিষ্যতে আসল ফেরত দেওয়ার শর্তের কথা বলা বা লিখা হয়। এই আসল বলতে মূল প্রদত্ত অর্থ বা পণ্যের সমপরিমাণ বা কাউন্টার ভ্যালুকে বুঝায়। ঋণে প্রকৃত পক্ষে হুবহু আসল নয়, বরং আসলের দাম বা *কাউন্টার ভ্যালু* পরিশোধ করা হয়। আর যেহেতু লেনদেনের দুটি বস্তুই একজাতের সেহেতু উভয়ের মান ও পরিমাণ সমান হলেই কেবল এদের পারস্পরিক মূল্য সমান হবে। হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পণ্যের জাতগত মিল থাকলে অর্থাৎ সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার বদলে রূপা.... ইত্যাদি ক্ষেত্রে *মিস্‌লান বিমিস্‌লিন* (মানগত সমতা) ও *সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন* (পরিমাণগত সমতা) এই দুটি বিধান দিয়েছেন। এই বিধান নগদ ও বাকি উভয় ক্রয়-বিক্রয়েই প্রযোজ্য। সম্মানিত ফক্বীহগণ বলেছেন, ঋণে সমমানের (*মিসলিয়্যাত*) বস্তু সমপরিমাণে ফেরত না দিলে ঋণ বৈধ হয় না। সুতরাং ঋণে একজাতের, সমমান ও সমপরিমাণের বস্তু দ্বারাই আসলের দাম পরিশোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত থাকা ঃ ঋণ লেনদেনে আসলের *কাউন্টার ভ্যালু* প্রদান ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হয়; আর এজন্য তা ঋণে পরিণত হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণের বস্তু তার প্রয়োজনে ব্যবহার করে নিঃশেষ করে ফেলে।

www.icsbook.info

অতঃপর এর *কাউন্টার ভ্যালু* যোগাড় করে পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং *কাউন্টার ভ্যালু* সংগ্রহ করার জন্যই সময় বা মেয়াদ থাকা জরুরী। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু ঋণ হচ্ছে *বাই-মোয়াজ্জলের* মত বাকি বিক্রয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, *বাই-মোয়াজ্জলে* লেনদেনের বস্তু দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়; আর *কর্দে* বস্তু দুটি হয় একই জাতের। দাম ও তা পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতীত বাকি বিক্রয় বৈধ হয় না। ঋণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজীদে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা *দাইনের* লেনদেন কর, তবে তা লিখে নিও (আল-বাকারাহ, ২৮২)।" "এর থেকে এ বিধান নির্গত হয় যে, *দাইনের* ব্যাপারে মেয়াদ (সময়-সীমা) নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।"[১৪] আর ঋণও *দাইনের* অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বলা হয়েছে, "অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য বাকিতে বেচা-কেনা বৈধ নয়।" সুতরাং ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

৫. যাবতীয় ঝুঁকি গ্রহীতার ওপর থাকা ঃ যে কোন ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রীত মাল বুঝে নেওয়ার পর ক্রেতাই সে মালের মালিক হয় এবং এর যাবতীয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়; ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা একজন ক্রেতা। সুতরাং ঋণ বাবদ গৃহীত পণ্য, অর্থ বা সেবা বুঝে নেওয়ার পর ক্রেতা/গ্রহীতাই তার মালিক হয়, এটা হয় তারই সম্পদ এবং এর যাবতীয় ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হয়। গৃহীত পণ্য বা অর্থ হারিয়ে যাওয়া, চোর-ডাকাতে নিয়ে যাওয়া, কোন দুর্যোগে বিনষ্ট বা ধ্বংস হওয়া অথবা লোকসানে খোয়া যাওয়া ইত্যাদি, গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার আওতাভুক্ত বা আওতা বহির্ভূত, যে কোন কারণে অথবা তার নিজের অবহেলা ও ত্রুটির দরুন বিনষ্ট, ধ্বংস বা ক্ষতি হলে মালিক হিসেবে এর সকল দায়িত্ব ক্রেতা/গ্রহীতাকেই বহন করতে হয়, ঋণদাতা/বিক্রেতা এর কোন দায়িত্ব নেয় না, কারণ এ সম্পদ এখন তার নয়।

৬. পাওনা *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর কোন বাড়তি বা উপহার-উপঢৌকনের শর্ত না থাকা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ লেনেদেনে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পণ্য, অর্থ বা সেবা একই জাত, একই মান ও পরিমাণে সমান সমান হওয়া বিধেয়। এই বিধান প্রাকৃতিক, চিরন্তন ও শাশ্বত। এই বিধানের ব্যতিক্রম করার এখতিয়ার-অধিকার মানুষকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং ঋণদাতা, আইন দ্বারা নির্ধারিত এই *কাউন্টার ভ্যালু* ভবিষ্যতে ফেরত পাবে এই শর্তেই ঋণ দেয়। এটাই তার নির্ধারিত পাওনা। এটাই তার অধিকার, হক; এর অতিরিক্ত কিছু তার পাওনা নয়, তার হক নয়। এমনকি, অতিরিক্ত যদি খড়-কুটার ন্যায় অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুও হয়, ঋণকে উপলক্ষ বানিয়ে কোন দান, উপহার-উপঢৌকন হয়, কোন সেবা-বেনিফিট হয়, তা নেওয়ারও অধিকার ঋণদাতার নেই। ইতোপূর্বে উল্লেখিত আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীস থেকে এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট

---

[১৪] আল-কাসানিঃ *বাদাই*, ভলি-৭, পৃঃ ৩৯৫-৬।

www.icsbook.info

নির্দেশনা পাওয়া যায়। আনাস ইবনে মালিক থেকে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ঋণ দেয়, তাহলে কোন উপহার গ্রহণ করা তার উচিত নয়।" (মিশকাত, *কিতাবুল বুয়ূ*)। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইমামগণ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করে গেছেন। সুতরাং ঋণের বিপরীতে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে কোন অতিরিক্ত নেওয়া তো বৈধ নয়ই, কোন উপহার-উপঢৌকন, তুচ্ছ নগণ্য দান, এমনকি, কোন সেবা, বেনিফিট নেওয়াও বৈধ নয়। সকল মাযহাবের ফক্বীহ্দের মধ্যে এ ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে।

কর্দের বৈধতা

কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) অনুসারে *কর্দ* লেনদেন করা সম্পূর্ণ বৈধ। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর '*দাইন*' লেনদেন কর, তবে তা লিখে নাও।" (২:২৮২) বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে '*দাইন*' শব্দ দ্বারা সকল প্রকার দায়কেই বুঝানো হয়েছে।[১৫] আর ঋণ হচ্ছে এক প্রকার দায় বা দাইন।

কুরআন মজীদে কমপক্ষে ছয়টি স্থানে (২:২৪৫, ৫:১২, ৫৭:১১, ৫৭:১৮, ৬৪:১৭ এবং ৭৩:২০) করদে হাসনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; আর সব কয়টি আয়াতেই মানুষকে *করদে হাসানাহ্* দেওয়া হলে তা আসলে মানুষকে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহকে *কর্দ* দেওয়া হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এই *কর্দকে* বহুগুণে বর্ধিত করে দাতাকে ফেরত দেবেন এবং তার সাথে উত্তম প্রতিফল (*আজরুন কারীম*) দান করবেন বলে তিনি ওয়াদা করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ *কর্দের* অনুমতি দিয়েছেন কেবল তাই নয়, বরং *কর্দ* প্রদানকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) হাদীসেও *করদে হাসানাহকে সাদাকাহ* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক *কর্দই* আসলে *সাদাকাহ*।" ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "No Muslim provides a Muslim a loan for two times, if he does it is like charity of once"[১৬] "অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে এক ঋণ দু'বার দেয় না, যদি দেয় তাহলে তা হয় একবার দানের মত।" রাসূল (সাঃ) নিজেও *কর্দ* নিয়েছেন এবং পরিশোধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবদ্দশায়, অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের যুগ, তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীদের আমল, মুজতাহেদীন ও আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের কাল, এমনকি আজ অবধি মুসলিম সমাজে ঋণ লেনদেন হয়ে আসছে; কিন্তু কোন দিন কেউ এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও নিকটজনদের মধ্যে ঋণের প্রচলন চিরদিনই ছিল এবং আছে। বলা যায় ঋণ লেনদেন একটি সাধারণ

---

১৫. কামালি, মোহাম্মদ হাশিমঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪২।

১৬. উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

(common) ও সার্বজনীন (universal) বিষয়। সুতরাং কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমার ভিত্তিতেই *কর্দ* বৈধ ও বিরাট সওয়াবের কাজ। "মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।"[১৭]

কর্দের ওপর রিবা

কর্দ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত আসলের কাউন্টার ভ্যালুর ওপর সরল বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লেনদেনের চুক্তি করা হলে গোটা লেনদেনটি হয়ে যায় কর্দুর রিবা বা সুদ ভিত্তিক ঋণ। সুদখোর মহাজন, প্রচলিত ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদাতাদের অনেকেই কর্দুর রিবা বা সুদী ঋণের ব্যবসা করে। এরা কিভাবে ঋণ চুক্তির সাথে রিবা চুক্তি সংযোজন করে প্রচলিত ব্যাংকের সুদী ঋণদান ও সুদী ডিপোজিট গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ধরা যাক, ক একজন ব্যবসায়ী; ব্যবসার প্রয়োজনে তার ৫.০০ লাখ টাকা দরকার; সে প্রচলিত ধারার একটি ব্যাংক খ-এর কাছে ৫.০০ লাখ টাকা দুই বছরের জন্য ঋণ চেয়ে একটি আবেদন করল (ঈজাব)। ব্যাংক খ তাকে জানালো যে, এ ধরনের ঋণের ওপর তারা ১৫% সরল সুদ নিয়ে থাকে (ঈজাব)। ক সুদ দিতে রাজী হলো (কবুল)। ব্যাংক ঋণ দিতে রাজী হলো (কবুল)। এভাবে ক ও খ-এর মধ্যে এই মর্মে কর্দুর রিবা বা সুদী ঋণ চুক্তি সম্পাদিত হলো যে, খ ক-কে দুই বছর মেয়াদের বার্ষিক ১৫% সুদের ভিত্তিতে ৫.০০ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করছে; ক দুই বছরের মধ্যে ধার্যকৃত সুদসহ উক্ত আসল (আসলের কাউন্টার ভ্যালু যা সর্বতোভাবে আসলের সমান) পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

লক্ষণীয় যে, এ চুক্তিতে দু'টি ঈজাব ও দু'টি কবুলের মাধ্যমে দু'টি চুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। প্রথম চুক্তিটি হচ্ছে ৫.০০ লাখ টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব ও ব্যাংক কর্তৃক তা কবুল করার মাধ্যমে কৃত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এতে ৫.০০ লাখ টাকার কাউন্টার ভ্যালু হচ্ছে ৫.০০ লাখ টাকা যা মিস্লান বিমিস্লিন ও সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িনের শর্ত পূরণ করেছে; আর দুই বছরের মধ্যে কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধের চুক্তির দ্বারা ইয়াদান বিইয়াদিন শর্তটিও পূর্ণ হয়েছে। "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন'– এর দ্বারা এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর দুই বছরের জন্য বাকি ও গ্রহীতার জিম্মায় থাকা কাউন্টার ভ্যালু ৫.০০ লাখ টাকার ওপর বার্ষিক ১৫% সুদের কোন কাউন্টার ভ্যালু নেই। এক্ষেত্রে কাউন্টার ভ্যালুর জাত (জিন্স), মান (মিস্লান বিমিস্লিন) ও পরিমাণ (সাওয়ায়ান বিসাওয়ায়িন) সমান সমান করা এবং পারস্পরিক বিনিময় (ইয়াদান বিইয়াদিন) করা এর কোন শর্তই পূরণ হয়নি। সুতরাং এ চুক্তিটি হচ্ছে, বিনা মূল্যে পরের সম্পদ গ্রাস করার অবৈধ রিবা চুক্তি।

---

[১৭] উপরোক্ত, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

"আর (আল্লাহ) রিবাকে হারাম করেছেন"– এ কথা দ্বারা এইরূপ চুক্তিকেই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্যান্য অন্যায় ভক্ষণের সাথে রিবার পার্থক্য এটাই যে, রিবা খাওয়া হয় কাউন্টার ভ্যালুর ওপর ধার্য করে।

হাদীসের আলোকে দেখলে দেখা যায় যে, এখানে ৫.০০ লাখ টাকার দুটি কাউন্টার ভ্যালু/দাম ধার্য করা হয়েছে ঃ একবার বলা হয়েছে ৫.০০ লাখ টাকার দাম ৫.০০ লাখ টাকা; আবার বলা হয়েছে ৫.০০ লাখ টাকার দাম ৬.৫০ লাখ টাকা। প্রথমটি মূল ও কম। এটি গ্রহণ করতে হবে; অন্যথায় ২য় দামটি নিলে সুদ খাওয়া হবে ১৫% বর্ধিতাংশ। অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এখানে ৫.০০ লাখ টাকাকে দু'বার বিক্রি করা হয়েছে। একবার ৫.০০ লাখ টাকার বিনিময়ে ৫.০০ লাখ টাকা; আবার ৫.০০ লাখ টাকাকে ১৫% বৃদ্ধির বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে। একেই বলা হয়েছে Multiple sale of the samething. অথচ দ্বিতীয়বার এবং তৎপরবর্তীতে যা বিক্রি করা হচ্ছে তা আসলে বিক্রেতার কাছে নেই। থমাস একুইনস এই কথাই বলেছেন এবং একে ভণ্ডামি আখ্যায়িত করেছেন।

প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো তাদের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাবসমূহে যে ডিপোজিট গ্রহণ করে সেখানেও এই একইভাবে ক্রয়-বিক্রয় ও রিবা চুক্তির সম্মিলন ঘটানো হয়। আসলে ডিপোজিট হচ্ছে ঋণ। ব্যাংক বিভিন্ন হারে নির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য এসব ঋণ গ্রহণ করে; (অবশ্য সঞ্চয়ী ডিপোজিটে মেয়াদ নির্ধারিত থাকে না।) অতঃপর ঋণের মেয়াদ পূর্ণ হলে আসলের কাউন্টার ভ্যালু পরিশোধ করে দেয়; আর সুদ চুক্তি অনুসারে ধার্যকৃত সুদ দেয় যার কাউন্টার ভ্যালু ব্যাংক পায় না।

ঋণ লেনদেনের বস্তু যদি কোন পণ্য বা সেবা হয়, তাহলে একইভাবে দু'টি চুক্তি করা হলে তার একটি হবে সুদ চুক্তি। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি ৪০ কেজি নাজির শাইল ধান অপর কাউকে ১ মাসের জন্য ধার দেয়, তাহলে দাতার পাওনা কাউন্টার ভ্যালু হয় ৪০ কেজি সমমানের নাজির শাইল ধান। অতঃপর এই কাউন্টার ভ্যালুর ওপর যদি ৫ কেজি নাজির শাইল ধান বেশি ধার্য করা হয়, তাহলে প্রথম চুক্তিটি হয় বৈধ ক্রয়-বিক্রয় বা ঋণ চুক্তি; আর দ্বিতীয়টি হয় অবৈধ রিবা চুক্তি।

অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন গাড়ীর (Car) মালিকের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, গাড়ীর মালিক আজ তাকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেবে; আর এর বিনিময়ে ঠিক এক মাস (৩০ দিন) পরে সে উক্ত গাড়ীর মালিককে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেবে এবং তার ওপরে আরও ১০০/- টাকা দেবে, তাহলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়ার সার্ভিসের পারস্পরিক বিনিময় হবে সেবা লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি যা বৈধ। আর ১০০/- টাকা অতিরিক্ত লেনদেন চুক্তিটি হবে কাউন্টার ভ্যালুর ওপর বিনিময় না দিয়ে নেওয়ার অবৈধ রিবা চুক্তি।

www.icsbook.info

এই হচ্ছে, ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রা, পণ্য বা সেবার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুদ কিভাবে উদ্ভূত হয় তার উদাহরণ। কিন্তু শুধু পরিমাণ নয়, মুদ্রা, পণ্য বা সেবার মানে তারতম্য করা হলে অথবা বিদ্যমান তারতম্যের দরুন উভয় মুদ্রা, পণ্য বা সেবার বিনিময় রেশিওতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হলেও উভয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং এক পক্ষের বাড়তি মূল্যটুকু হবে বিনিময়হীন অতিরিক্ত বা রিবা।

সকল মাযহাবের সম্মানিত ফক্বীহগণ একে *রিবা* এবং অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে, "নীতিগতভাবে কর্দ চুক্তিতে ঋণদাতাকে কোন সুবিধা দেওয়ার শর্ত করা উচিত নয়, অন্যথায় তা রিবা হবে।"[১৮] হাম্বলী মাযহাবে বলা হয়েছে, "কর্দ হচ্ছে দান এবং তা দানই থাকা উচিত। এতে গুণগত বা পরিমাণগত কোন বৃদ্ধির শর্ত করা হলে তা ঋণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে।"[১৯] মালেকী মাযহাবে বলা হয়েছে, "কর্দ চুক্তিতে যদি বলা হয় যে, যে রূপ পণ্য দেওয়া হলো, তার চেয়ে ভাল পণ্য ফেরত দিতে হবে, অথবা ঋণদাতাকে কোন উপহার দিতে হবে তাহলে তা অবৈধ হবে।"[২০] শাফেয়ী মাযহাবের মতে, "ঋণদাতাকে পরিমাণের বেশি ও মানগত দিক থেকে উত্তম পণ্য ফেরত দেওয়া ইত্যাদি কোন সুবিধা প্রদান করা বৈধ নয়।"[২১]

সিকিউরিটি, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে *রিবা* ঃ সিকিউরিটি, বিল, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ডিপোজিট সার্টিফিকেট, বাণিজ্যিক পত্র, বন্ড, মর্টগেজ ইত্যাদি হচ্ছে বিভিন্ন ঋণপত্র। সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও কোম্পানী এসব ঋণপত্র ইস্যু ও বিক্রয় করে। এগুলো আসলে ঋণের সার্টিফিকেট বা দলীল। ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ এই সার্টিফিকেট দিয়ে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও জনসাধারণ, এক কথায়, ক্রেতাদের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে। পত্রগুলো বিভিন্ন পরিমাণ ও মেয়াদের হয়ে থাকে। আর সে অনুসারে এদের সুদের হারও কম-বেশি নির্ধারিত থাকে। ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কখনো কখনো এগুলো নিলামে বিক্রয় করে। ক্রেতাগণ সুদী আয় পাবার আশায় এগুলো ক্রয় করে, তথা এই সার্টিফিকেট গ্রহণ করে ইস্যুকারীকে ঋণ দেয়। নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হলে ক্রেতাগণ এগুলো ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করে এবং সুদসহ আসলের *কাউন্টার ভ্যালু* ফেরত পায়। প্রাপ্ত সুদ হয় তাদের আয়/মুনাফা। এসব ঋণপত্র হস্তান্তরযোগ্য; ক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে ক্রীত ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করে ঋণ বাবদ প্রদত্ত তার অর্থের *কাউন্টার ভ্যালু* ফেরত পেতে পারে। অবশ্য চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় বিধায় ক্রেতা কখনও কখনও লোকসানেও এগুলো

---

১৮. আল-কাসানিঃ *বাদাই*, ভলি-৭, পৃঃ ৩৯৫-৬, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, পূর্বোক্ত, পৃ: ১২০।

১৯. ইবনে কুদামাঃ *আল-মুঘনি*, ভলি-৪, পৃঃ ৩৫৪-৭, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃঃ ১২০।

২০. উপরোক্ত।

২১. আল-সিরাজী, *আল-মুজাযাহাব*, ভলি-১, পৃঃ ৩০৬, উদ্ধৃত, নূর, ই, এম, উপরোক্ত, পৃঃ ১২৫।

www.icsbook.info

বিক্রয় করতে বাধ্য হয়; আবার কোনও কোনও সময় লাভেও বিক্রয় করতে পারে। ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ তাদের স্বল্প মেয়াদী আর্থিক প্রয়োজন পূরণার্থে, যেমন সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ঋণপত্র ইস্যু করলে সেগুলোকে বলা হয় স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র। কিন্তু মেশিন, যা সাধারণত এক বছরের কম-বেশি সময় স্থায়ী হয়ে থাকে, ইত্যাদি ক্রয়ের প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে যখন এক বছর বা তার চেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণপত্র বিক্রয় করা হয়, তখন একে বলা হয় দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্র। প্রচলিত ভাষায় স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্রের বাজারকে বলা হয় অর্থ বাজার বা money market; আর দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্রের বাজারকে বলা হয় মূলধন বাজার বা capital market।

অন্যান্য ঋণের ন্যায় এসব ঋণপত্রের মাধ্যমে গৃহীত ঋণও হচ্ছে সমজাতীয় মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয়। ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ এসব পত্রের মাধ্যমে তাদেরকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদানের প্রস্তাব (*ঈজাব*) করে; আর ক্রেতা মেয়াদপূর্তিতে *কাউন্টার ভ্যালু* ফেরত পাওয়ার শর্তে ঋণ প্রদানে রাজী (*কবুল*) হয়। এটি পরস্পর *কাউন্টার ভ্যালুর* বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। দ্বিতীয়ত, ঋণগ্রহীতা গৃহীত অর্থের *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে নির্ধারিত সুদ প্রদান করবে বলে *ওয়াদা (ঈজাব)* করে; আর ঋণদাতাগণ উক্ত সুদ গ্রহণে রাজী (*কবুল*) হয়ে ঋণ দেয়। এটি একতরফাভাবে সুদ প্রদান ও গ্রহণের চুক্তি। সুদ গ্রহীতা গৃহীত সুদের কোন *কাউন্টার ভ্যালু* দেয় না। সুতরাং এটি মাগনা প্রদান ও গ্রহণের চুক্তি। তাই অবৈধ।

বিল ক্রয়-বিক্রয় ও বাট্টাকরণে *রিবা* ঃ বিল মানে হচ্ছে বিনিময় বিল বা Bill of Exchange। বিনিময় বিল প্রধানত দুই রকম হয়ে থাকে ঃ বিদেশী বিনিময় বিল বা Foreign Bills ও দেশী বিনিময় বিল বা Local Bills। দেশী মাল বিক্রেতা কর্তৃক বিদেশী ক্রেতার ওপর বিদেশী মুদ্রার অংকে কৃত বিলকে বলা হয় বিদেশী বিল। আর দেশী বিক্রেতা কর্তৃক দেশী ক্রেতার ওপর দেশীয় মুদ্রার অংকে বিল করলে তা হয় দেশী বিল। দেশী-বিদেশী উভয় প্রকার বিল আবার দুই ধরনের হয়: উপস্থাপন মাত্র পরিশোধযোগ্য বিল বা Demand Bills এবং মেয়াদী বিল। মেয়াদী বিলে পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এই সকল বিলই ক্রয় করে থাকে। সাধারণতঃ ডিমান্ড বিলের ক্ষেত্রে তারা বিল ক্রয় বা Purchase of Bills পরিভাষা ব্যবহার করে; আর মেয়াদী বিল ক্রয়কে তারা বিল বাট্টাকরণ বা Discounting of Bills বলে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই বিল বিক্রেতাগণ ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে বিলের অর্থ পেয়ে যায়, তাদেরকে ব্যাংক কর্তৃক বিলের অর্থ সংগ্রহ করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হয় না।

ডিমান্ড বিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তাদের মঞ্জুরকৃত মোট ঋণ থেকে সেবামূল্য ও কালেকশন ব্যয় কেটে রেখে বিলের অবশিষ্ট অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহককে (তার

www.icsbook.info

হিসাবে) পরিশোধ করে দেয়। অতঃপর স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট Drawee-এর কাছ থেকে এ সব বিলের অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত প্রদত্ত ঋণের ওপর কোন অতিরিক্ত বা সুদ নেয় না; ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদান এবং Drawee-র নিকট থেকে উক্ত বিলের মূল্য আদায় করে ঋণ সমন্বয় করার মাঝখানে সময়ের তেমন ব্যবধান না থাকায় স্বল্প সময়ের বিনিময়ে সুদ ধার্য করা হয় না।

কিন্তু মেয়াদী বিলের ক্ষেত্রে মঞ্জুরকৃত ঋণ হতে ব্যাংক তাদের সেবামূল্য ও বিলের অর্থ সংগ্রহ খরচ ছাড়াও বিলের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ নিয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে দুটি চুক্তি হয়ঃ একটি বিল ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি; আর অপরটি হচ্ছে *রিবা* বা সুদ চুক্তি। প্রথম চুক্তি দ্বারা ব্যাংক বিলের প্রাপককে সমমূল্যের অর্থ বিলে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণ দেয়; শর্ত থাকে যে, বিলদাতা নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হলে সমমূল্যের যে অর্থ পরিশোধ করবে তার দ্বারাই এই ঋণের *কাউন্টার ভ্যালু* পরিশোধ বা সমন্বয় করা হবে। আর দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা ঋণদাতা ব্যাংক বিলের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের ওপর বিলে নির্ধারিত সময়ের জন্য সুদ ধার্য করে, আর ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধে রাজী হয় ও পরিশোধ করে। এই সুদ হচ্ছে *রিবা নাসীয়াহ্*। একে 'বিল বাট্টাকরণ' বলার কারণ হচ্ছে ব্যাংক বিলের প্রাপক ঋণগ্রহীতাকে বিলের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করে; অতঃপর সুদ-চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের ওপর ধার্যকৃত সাকল্য সুদ কেটে রেখে মঞ্জুরকৃত মোট ঋণের অবশিষ্টাংশ বিলের প্রাপককে প্রদান করে। বিলের মোট মূল্য থেকে সুদ কেটে রাখাকেই বলা হয় বিল বাট্টাকরণ। এখানে উল্লেখ্য যে, বৈদেশিক মুদ্রার বিল দেশীয় মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাধারণত ঋণ মঞ্জুর করার দিন বিদ্যমান হার অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার দাম নির্ধারণ করে থাকে।

এখানে একটি কথা বলা জরুরী যাতে ব্যাংক ও বিল প্রাপক উভয়েই সুদের লেনদেন থেকে বাঁচতে পারে। বিদেশী মুদ্রার বিল যখন দেশীয় মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু দুটি (মুদ্রা দুটি) আসলে ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মুদ্রা দুটির বিনিময় হার নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোন দামে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। সুতরাং ঋণ ও সুদের দিকে না গিয়ে ব্যাংক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিদেশী মুদ্রার দাম নির্ধারণ করে বিক্রেতাকে পুরো মূল্য নগদ পরিশোধ করে দিতে পারে এবং পরবর্তীতে বিলের বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করে তা উচ্চতর হারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, পারস্পরিক সম্মতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ কেবল অসম জাতের মুদ্রার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু উভয় মুদ্রা যদি সমজাতের হয়, অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার বিল যদি দেশীয় মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাহলে বিলে লিখা মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং এর

www.icsbook.info

মূল্য বা *কাউন্টার ভ্যালু* বাবদ প্রদত্ত মুদ্রার পরিমাণ অবশ্যই সমান সমান হতে হবে; এতে ব্যত্যয় ঘটানোর কোন এখতিয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার নেই। এক্ষেত্রে মূল্য থেকে বাট্টা করে যদি মূল্য পরিমাণে কম দেওয়া হয়, তাহলে মোট বিলের পরিমাণ এর *কাউন্টার ভ্যালুর* পরিমাণের পার্থক্যটা হবে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে বাড়তি ও বিনিময়হীন; সুতরাং *রিবা*। এখানেও সমান সমান মূল্যের বিনিময় হবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি; আর বাড়তি লেনদেন হবে *রিবা* চুক্তি।

দেশে-বিদেশে অনেক চাকুরীজীবী, বিশেষ করে, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক তাদের বেতনের বিল অগ্রিম কম পরিমাণ টাকায় বিক্রি করে নগদ টাকা সংগ্রহ করে থাকেন। এটা আসলে বিল বাট্টাকরণ এবং সুদের মধ্যে শামিল।

আরিয়্যাহ ও রিবা

আরবী '*আরিয়্যাহ*' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ধার, borrowing বা loan. কিন্তু আভিধানিক অর্থ অভিন্ন হলেও বাস্তবে *কর্দ* এবং *আরিয়্যাহর* মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, সমজাতের *ফান্‌জিবল* (Fungible) পণ্য, মুদ্রা বা সেবা বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে ঋণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু *মালে গাইরে ফানি* বা Non-Fungible পণ্য ব্যবহার করার জন্য বিনা মূল্যে ধার দেওয়া হলে তাকে বলা হয় *আরিয়্যাহ*।

মালে গাইরে ফানি বা non-fungible goods হচ্ছে সেই সব বস্তু, ব্যবহার করা সত্ত্বেও যার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে, নিঃশেষ বা রূপান্তরিত হয়ে যায় না। সহজ কথায়, যেসব পণ্য, asset, property-কে এর নিজ রূপে বহাল রেখে বারবার ব্যবহার করা এবং উপকার নেওয়া যায় সেসব পণ্য, এসেট ও প্রপার্টিকে বলা হয় non-fungible goods। যেমন, গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী ইত্যাদি। *ফান্‌জিবল* পণ্যের ন্যায় *নন-ফান্‌জিবল* পণ্যেরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটি, যা *ফান্‌জিবল* পণ্যের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। *নন-ফান্‌জিবল* পণ্যের বৈশিষ্ট্য ৩টি হচ্ছে ঃ

১. ব্যবহার করার পরও অস্তিত্ব বহাল থাকে;

২. সেবা প্রবাহ বা flow of service আছে এবং

৩. বস্তু থেকে এর সেবা (service) পৃথক (separate) করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ীর কথা ধরা যাক। একবার নয় বারবার ব্যবহার করার পরও গাড়ীটি যথাযথ (অবচয় ছাড়া) বিদ্যমান থাকে। যতদিন অস্তিত্ব থাকে ততদিন গাড়ী থেকে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হওয়া যায়। সর্বোপরি গাড়ীটির অস্তিত্ব যথাযথ বহাল রেখেই এ থেকে সেবা নেওয়া যায়; এমনকি, গাড়ী বিক্রি না করেও আলাদাভাবে গাড়ীর সেবা বিক্রি করা যায়।

সুতরাং *আরিয়্যাহ* হচ্ছে, মূল্য বা বিনিময় ছাড়া কোন '*মালে গাইরে ফানি*' বা *নন-ফান্‌জিবল* বস্তু কাজ শেষে ফেরত দেওয়ার শর্তে কাউকে ব্যবহার করতে দেওয়া।

www.icsbook.info

যেমন, খ-এর কন্যার বিয়েতে মেহমান আপ্যায়নের জন্য ক তার ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারগুলো অনুষ্ঠান শেষে ফেরত দেওয়ার শর্তে খ-কে ধার দিল। এরূপ ধারকে বলা হয় *আরিয়্যাহ*।

বস্তুতঃ "*আরিয়্যাহ* হলো এমন বস্তু ধার দেওয়া, যা নিঃশেষ না করেও তা থেকে উপকারিতা (benefit) নেওয়া সম্ভব।"[২২] মিসর দারুল ইফতার শাইখ মুহাম্মদ ফাতের বলেছেন, "*আরিয়্যাহ* হচ্ছে বিনিময় ব্যতীত কোন বস্তুর উপকারিতার মালিকানা প্রদান করা, মূল বস্তুর নয়। .....*আরিয়্যাহর* মূল কথা হচ্ছে ঃ মূল বস্তুটি থেকে উপকারিতা নেওয়ার পর বস্তুটি ফেরত দেওয়া।"

আরিয়্যাহর মাল *আরিয়্যাহ* গ্রহীতার কাছে *আমানত* হিসেবে গণ্য হয়; মালের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা হয় না। গ্রহীতা যে কাজের জন্য মালটি গ্রহণ করে সে কাজে ব্যবহার করার পরও বস্তুটি তার কাছে বর্তমান থাকে এবং শর্ত অনুযায়ী সে মালিককে তা ফেরত দিয়ে দেয়। এছাড়া মালটি ব্যবহার করে এ থেকে যে উপকার সে নেয় তারও কোন মূল্য বা বিনিময় তাকে দিতে হয় না। সুতরাং *আরিয়্যাহয়* গৃহীত মাল এবং মালের ব্যবহার ও উপকার এর কোনটার জন্যই কোন দায় গ্রহীতার ওপর বর্তায় না। অবশ্য সংরক্ষিত *আমানত* হিসেবে *আরিয়্যাহর* বস্তু যথাযথ হেফাজত করা তার দায়িত্ব। তবে যথাযথ হেফাজত করা সত্ত্বেও যদি তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে মাল বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়, তাহলেও এর ক্ষতিপূরণ করার দায়িত্ব গ্রহীতার ওপর বর্তায় না। অবশ্য তার গাফলতি বা ত্রুটির কারণে মালের ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে। সুতরাং আরিয়্যাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল নয়। এতে সুদ হওয়ার আশংকা নেই। এমনকি, মাল ব্যবহারের মূল্য নেওয়া হলে তা হয় আজর বা ভাড়া; আর চুক্তিটি হয়ে যায় ইজারাহ। ইজারাহ সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে।

আল-ওয়াদিয়াহ ও রিবা

আল-ওয়াদিয়াহ মানে নিরাপদ সংরক্ষণ। *আল-ওয়াদিয়াহ* হচ্ছে সম্পদের মালিক এবং জিম্মাদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি যেখানে জিম্মাদার মালিকের গচ্ছিত সম্পদের নিরাপদ হেফাজত করে। ফিক্বাহ শাস্ত্রে *আল-ওয়াদিয়াকে* দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ ১) *আল-ওয়াদিয়াহ আল-আমানাহ* ২) *আল-ওয়াদিয়াহ আল-জামানাহ।*

১. ***আল-ওয়াদিয়াহ আল-আমানাহ ঃ*** সম্পদের মালিক যদি চাহিবা মাত্র হুবহু একই সম্পদ ফেরত দেওয়ার শর্তে কোন সম্পদ কারো কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখে, তাহলে সেই চুক্তিকে বলা হয় *আল-ওয়াদিয়াহ আল-আমানাহ*। সাধারণভাবে একে বলা হয় *আমানত*।

আমানত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল নয়, এতে বিনিময় নেই; একই বস্তু যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা হয় এবং মালিক চাইলে তার বস্তু হুবহু তাকে

---

[২২] ফক্বীহ কুনুবী ঃ *আনিসুল ফুক্বাহা*, পৃঃ ৬২৫।

www.icsbook.info

ফেরত দেওয়া হয়। জিম্মাদার কেবল হেফাজত করার দায়িত্ব পালন করে; এজন্য সেবামূল্য গ্রহণ করলে তা হয় সেবা ক্রয়-বিক্রয়। অপরদিকে *আমানতকারী* বা মালিক তার গচ্ছিত সম্পদের নিরাপত্তা পায় এবং দরকার হলে তা ফেরত নিয়ে যায়। তাকে কোন অতিরিক্ত প্রদান করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং *আমানতে* সুদের উদ্ভব ঘটার কোন আশঙ্কা নেই।

২. ***আল-ওয়াদিয়াহ আল-জামানাহ*** **ঃ** সাধারণভাবে এটি জামানত হিসেবে পরিচিত। সম্পদের মালিক যখন ব্যবহারের অনুমতি ও চাহিবা মাত্র অনুরূপ সম্পদ সমপরিমাণে ফেরত দেওয়ার শর্তে কোন অর্থ বা পণ্য কারও কাছে নিরাপদ হেফাজতের জন্য গচ্ছিত রাখে তখন তাকে বলা হয় *আল-ওয়াদিয়াহ আল-জামানাহ* বা *জামানত*। যে *জামানত* রাখার জন্য দেয় তাকে বলা হয় মালিক বা জামানতকারী, আর যে সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে তাকে বলা হয় *জিম্মাদার*।

***আল-ওয়াদিয়া আল-জামানাহ* ও ঋণ ঃ** *আল-ওয়াদিয়া আল-জামানাহ*-এর সাথে ঋণ তথা একজাতের পণ্য বাকি ক্রয়-বিক্রয় এবং *আরিয়্যাহর* যথেষ্ট মিল আছে। তবে ঋণ ও *ওয়াদিয়ার* মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঋণে দাতা বস্তুটি বিক্রয় করে এবং মালিকানাসহ তা গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়; অতঃপর বস্তুর সকল প্রকার ঝুঁকি এর নতুন মালিক ঋণগ্রহীতার ওপর বর্তায়। কিন্তু *ওয়াদিয়ায়* মালিক বস্তুর ওপর তার মালিকানা বহাল রেখে শুধু দখল (possession) হস্তান্তর করে এবং গ্রহীতাকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। *জিম্মাদার* বস্তুর যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে এবং বস্তু বা তার *কাউন্টার ভ্যালু* ফেরতের গ্যারান্টি দেয় ও ফেরত দিতে বাধ্য থাকে; তবে তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে সম্পদ বিনষ্ট হলে তা ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তার ওপর বর্তায় না। কিন্তু ঋণের বেলায় এরূপ ঝুঁকি গ্রহীতাকেই বহন করতে হয়।

একেতো *ফান্‌জিবল* পণ্য তারপর আবার ঋণের সাথে প্রায় মিলে যাওয়ার কারণে *আল-ওয়াদিয়াহর* বস্তু ব্যবহারের জন্য দাম নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। দাতা-গ্রহীতা যদি মালিককে এরূপ কোন অতিরিক্ত প্রদানের চুক্তি করে তাহলে চুক্তিটি পরিণত হয় ঋণ চুক্তিতে আর অতিরিক্ত লেনদেন হয় *রিবা* চুক্তি।

দাইন বা দেনা

এখানে ***দাইন*** কি, *দাইন* কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এতে কিভাবে *রিবা* বা সুদের উদ্ভব ঘটে সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

***দাইন* অর্থ ঃ** ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, '*দাইন*' শব্দটি আরবী; *দাইন*-এর অর্থ হচ্ছে দেনা, ঋণ, debt, liability.

***দাইনের* সংজ্ঞা ঃ** বাকি ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন বিক্রয় চুক্তি (sale contract) যেখানে বিনিময়ের দুটি বস্তুর মধ্যে একটি অথবা দুটি বস্তুই অনুপস্থিত থাকে এবং চুক্তিকালে

www.icsbook.info

এর/এদের হস্তান্তর ও সরবরাহ বুঝে (acquisition) নেওয়া হয় না; তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ/পক্ষদ্বয়ের ওপর যথাসময়ে তা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক থাকে। এভাবে *কাউন্টার ভ্যালু* প্রদান স্থগিত রাখার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের ওপর তা পরিশোধের যে দায় বর্তায় তাকে বলা হয় *দাইন*।

হাশিম কামালি সূরা আল-বাকারাহর ২৮২ আয়াতে ব্যবহৃত *'দাইন'* শব্দের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আয়াতে উল্লেখিত *'তাদাইয়ানতুম'* হচ্ছে ক্রিয়াপদ। শব্দটি বর্তমান কাল, বহুবচন ও পারস্পরিক মুডে (reciprocal mood) ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে এর দ্বারা একদিকে পারস্পরিকতা (reciprocity) এবং অপরদিকে স্থগিতকৃত দায়ের (deferred liability) ভিত্তিতে পণ্য-সামগ্রী ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় বুঝায়। সুতরাং *দাইন* হচ্ছে স্থগিতকৃত দায় যা পণ্য-সামগ্রী, অর্থ ও সেবার বাকি ক্রয়-বিক্রয় থেকে সৃষ্টি হয়। ক্রয়-বিক্রয়ে দাম প্রদান যদি ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য স্থগিত রাখা হয় অথবা বিক্রীত পণ্য ভবিষ্যতে প্রদান (delivery) করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহলে স্থগিত দায়কে (deferred liability) বলা হয় *দাইন*। "*Dayn* represents a charge or a personal commitment, on the *dhimmah* (legal personality) of its bearer". "অর্থাৎ দাইন হচ্ছে দাবি বা ব্যক্তিগত অঙ্গীকার যা বাহকের (আইনানুগ ব্যক্তিত্ব) জিম্মায় থাকে।" *'দাইন'* দ্বারা এমন বস্তুকে (asset) বুঝায় চুক্তিকালে যার বাস্তব অস্তিত্ব (tangible existence) থাকে না।

দাইন ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা

দাইন ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা আলোচনায় হাশিম কামালি দেখিয়েছেন যে, *দাইন* ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সূরাতুল বাকারাহর ২৮২ আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে পরস্পর *দাইন* লেনদেনের কথা বলে তা লিখে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতে এ কথা স্পষ্ট যে, দায় ছোট হোক বা বড় হোক, তা অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের দায়িত্ব ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে চুক্তিপত্র তথা দলীলে লিখতে হবে।

অতঃপর কামালি আইনবেত্তাদের বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন; এর সারসংক্ষেপ হলো ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আয়াতটি *'সালাম'* (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং অন্যান্য বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য নয়।

আর ইমাম রাযীর মতানুসারে এই আয়াত কেবল দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ এক প্রকার হচ্ছে বাকি বিক্রয় যেখানে দাম ভবিষ্যতের কোন দিনে পরিশোধ করা হয়; আর এক প্রকার হচ্ছে অগ্রিম বিক্রয় (*বাই-সালাম*)। এই উভয় প্রকার ক্রয়-

www.icsbook.info

বিক্রয়ে কেবল কোন এক পক্ষের ওপর দায় বর্তায়। সুতরাং বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের মূল্য প্রদান স্থগিত রাখা বৈধ নয়।

কামালি বলেছেন যে, প্রচলিত ফিক্বাহ্য় এ বিষয়ে এমন রুলিং দেওয়া হয়েছে যে, এর ফলে আসলে যাবতীয় রিয়েল (real) ও বাস্তব (tangible) বস্তু *দাইন* ক্রয়-বিক্রয়ের আওতা থেকে বাদ পড়ে গেছে। বলা হয়েছে যে, একটি গাড়ী বা একটি বাড়ী বিক্রয় করা হলে উভয় পক্ষের *কাউন্টার ভ্যালু* অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে বিনিময় ও হস্তান্তর করে দিতে হবে। তবে কেবল ক্রেতা তার দাম প্রদান স্থগিত রাখতে পারে যদি বিক্রেতা তাতে সম্মত হয়। কিন্তু গাড়ী বা বাড়ীর বিক্রেতাকে কিছুতেই তার গাড়ী বা বাড়ী হস্তান্তর স্থগিত রাখার সুযোগ দেওয়া যাবে না। বরং তা অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে এর নতুন ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। হাশিম কামালি বলেন, আইনগত এই অবস্থান খুব দৃঢ় ও অনমনীয়; ইজতেহাদী এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা জরুরী; আর এজন্য নতুনভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। তাছাড়া ফিক্বাহ্‌র এ সিদ্ধান্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বক্তব্যের পরিপন্থী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের (সাঃ) অন্যতম সাহাবী জাবির (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) কাছে তাঁর উট বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কি মদীনায় পৌঁছার পর উটটি নবীর (সাঃ) নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন? নবী (সাঃ) এতে সম্মতি দিলেন। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, জাবির (রাঃ) মদীনায় পৌঁছার পর উক্ত উটটি আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল কায়্যিম বলেছেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দ এ ব্যাপারে এই অভিমত দিয়েছেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সম্মত হলে পণ্যের হস্তান্তরও বিলম্বিত করা যেতে পারে; এমনকি সমাজে যদি বিলম্বিত করার প্রথা চালু থাকে, তাহলে প্রথা মুতাবিকও তা বিলম্বিত করা যাবে।

ইবনে আবেদীন বলেছেন যে, "কাউন্টার ভ্যালুদ্বয়ের তাৎক্ষণিক হস্তান্তর করাই হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম; তবে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে পরিশোধের মেয়াদ যদি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে, তা কোন বিরোধের সৃষ্টি করবে না তাহলে বাকি ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদিত।

মালিকী স্কুলের ফক্বীহবৃন্দও বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেছেন। তবে *গারার* (অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থবোধকতা) ও *রিবার* আশংকায় তাঁরা বেশ কতিপয় ধরনের বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদন দেন নাই। ইউসুফ আল-কারদাভী এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এসব ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি কুরআন অথবা সুন্নাহর ভিত্তিতে করা হয়নি; বরং এর ভিত্তি হচ্ছে ইজতিহাদ। এ কারণে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।"

হাম্বলী ফিক্বাহবিদগণও বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেছেন যদি তা *রিবা* ও *গারার*মুক্ত হয়। ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনে আল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বাকি ক্রয়-বিক্রয়কে

www.icsbook.info

বৈধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং যাঁরা তাৎক্ষণিক হস্তান্তরকে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল নিয়ম ও শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন তাদের এ অভিমতের কঠোর সমালোচনাও করেছেন।

ইমাম শাফেঈ এ ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ বিষয়ে আল-কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। সকল প্রকার *দাইনই* এর মধ্যে শামিল। এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন দায়ই (debt) বিলম্বিত করা বৈধ; যেমন, অগ্রিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা বৈধ হয়। ইবনে আব্বাসের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, "*সালাম* অথবা *সালাফ* দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি (ইবনে আব্বাস) কোন সময় ভিত্তিক ঋণ (periodic loan) বা অন্য কিছু বুঝিয়ে থাকবেন। আমরা আয়াতের উদ্দেশ্য অনুসারে এনালজির (analogy) ভিত্তিতে কুরআনের উক্ত বিধানকে সকল দায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে পারি।"

ইবনে কাছিরও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা আল-কুরআন ঈমানদারদেরকে পরস্পর বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি এবং তা লিখে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

উপরোক্ত মতামত উদ্ধৃত করে হাশিম কামালি বলেছেন যে, "*দাইন*-এর ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ *দাইনকে* সীমিত অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং মাত্র কয়েক প্রকার দায় লেনদেনের মধ্যে *দাইনকে* সীমিত রেখেছেন।। কিন্তু অন্যান্য স্কলারগণ *দাইনকে* সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক হিসেবে দেখেছেন এবং সকল প্রকার স্থগিত দায়ই *দাইন*-এর মধ্যে শামিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ আল-কুরআন '*দাইন*' বা '*মুদায়্যানাহ*'-এর ব্যবহার সাধারণ অর্থেই করেছে, এর অর্থ নির্দিষ্ট (specify) করে দেয়নি; আর এই সাধারণ অর্থের পরিবর্তে ভিন্নতর অর্থ গ্রহণে বাধ্য করে এমন কোন প্রমাণও নেই। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে যে, আল-কুরআনের ভাষা হচ্ছে সাধারণ ও শর্তহীন (unqualified); আর এই অর্থেই *দাইনকে* গ্রহণ করা উচিত।" ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আয়াতটি *বাই-সালাম* সম্পর্কে নাযিল হওয়ার কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ সেটা ছিল আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বা *শানে নুযূল*। আর *উসূলে ফিক্বাহর* নিয়ম হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হতে পারে, কিন্তু এজন্য আয়াতের অন্তর্নিহিত সাধারণ অর্থ এবং এর বিধান সীমিত হয়ে যেতে পারে না। আয়াতটি *বাই-সালাম* সম্পর্কে নাযিল হয়ে থাকলেও এর অর্থ সাধারণ এবং সকল দায়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। সুতরাং সকল প্রকার *দাইন-ই* শরীয়তে বৈধ, অবশ্য যদি সুদ, জুয়া ও *গারার* সংক্রান্ত কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত কোন বিধি লংঘন করা না হয়।

সূরাতুল বাকারাহর ২৭৫ আয়াত "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন *হারাম*," এর উদ্ধৃতি দিয়ে কামালি লিখেছেন যে, আয়াতে ব্যবহৃত '*বাই*' শব্দটি

www.icsbook.info

হচ্ছে এক বচনে বিশেষ্য পদ, আর এর পূর্বে সংযুক্ত করা হয়েছে '*আল*' (আলিফ লাম); ফলে এখানে বাই এর অর্থ হয়েছে সাধারণ বা *আ'ম*। এর দ্বারা সকল প্রকার *বাইকে* বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সকল *বাই-ই* বৈধ।

আল-কুরআনের এই সাধারণ বিধানের মধ্যে সকল প্রকার *বাই* যেমন, এক পণ্যের বিনিময়ে আর এক পণ্য বিক্রয় (barter) এক মুদ্রার বদলে অন্য মুদ্রা ক্রয় (al-Sarf), অর্থের বিনিময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় (cash sale), অগ্রিম বিক্রয় বা *সালাম*, খরচ দামে বিক্রয় (*al-Tawliyah*), লাভে বিক্রয় (*মুরাবাহা*), লোকসানে বিক্রয় (*al-Wadiah*), মোট দামে বিক্রয় (মুসাওয়ামাহ্) এবং নিলামে বিক্রয় (*al-Muzayadah*) সবই শামিল রয়েছে। এ সব *বাই-ই* বৈধ, এমনকি ফিউচারস্ ক্রয়-বিক্রয় যদি সুদ ও *গারার*মুক্ত হয়, তাহলে তাও বৈধ। তাছাড়া সুন্নাহ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয় নাই এমন সকল *বাই-ই* বৈধ।[২৩]

দাইনের ওপর রিবা

ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য, অর্থ ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত প্রধান প্রধান ধরন হচ্ছে, *বাই-মোয়াজ্জল* (বাকি বিক্রয়), *বাই-মুরাবাহা বিল আজল* (বাকি *মুরাবাহা*), *বাই-সালাম* (অগ্রিম বিক্রয়), *বাই-ইসতিসনা* (আদেশ ক্রয়), *ইজারাহ* (ভাড়া)। এছাড়া আধুনিক কালে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া ফিউচারস ও অপশনস ক্রয়-বিক্রয়কেও বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল বলে গণ্য করা হয়। এসব বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে কিভাবে সুদ উদ্ভূত হয় সে বিষয়ে আলোচনা নিচে পেশ করা হলো ঃ

বাই-মোয়াজ্জল/বাই-মুরাবাহা ও রিবা ঃ শরয়ী দিক থেকে দাম নির্ধারণের বেলায় *বাই-মোয়াজ্জল-এ* ক্রয় মূল্য ও মুনাফা আলাদা করে উল্লেখ করা জরুরী নয়; কিন্তু *বাই-মুরাবাহায়* ক্রয় মূল্য ও মুনাফা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করার শর্ত রয়েছে। এছাড়া এদের মধ্যে পদ্ধতিগত আর কোন পার্থক্য নেই। সেজন্য এ দুটি এক সাথে আলোচনা করা হচ্ছে।

বাই-মোয়াজ্জল ও *বাই-মুরাবাহা* ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে *কাউন্টার ভ্যালু* নির্ধারণের বিধান প্রযোজ্য। *বাই-মোয়াজ্জল* ও *বাই-মুরাবাহা* পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতার কাছে সরবরাহ করা হয়; কিন্তু নির্ধারিত দাম বা খরচ + মুনাফা হস্তান্তর ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত বা বাকি রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রীত পণ্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা থাকে না, সে মালিক হয় নির্ধারিত দামের যা ক্রেতার কাছে পাওনা থাকে। আর নির্ধারিত দামের ওপর ক্রেতার মালিকানা থাকে না, সে মালিক হয় ক্রীত পণ্যের যা সে

[২৩] কামালি, মোহাম্মদ হাশিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩১-১৪৪।

www.icsbook.info

তাৎক্ষণিক বুঝে নেয়। যেহেতু বিক্রীত পণ্যের ওপর বিক্রেতার মালিকানা নেই, সেহেতু এই পণ্য আবার বিক্রি করা বা এর দাম বৃদ্ধি করার কোন অধিকার বিক্রেতার থাকতে পারে না। এতদসত্ত্বেও যদি বিক্রেতা তার পাওনা কাউন্টার ভ্যালুর ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করে তাহলে সেই অতিরিক্ত হয় রিবা।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক ক চালের একজন বিক্রেতা আর খ চালের একজন ক্রেতা। তারা উভয়ে দরকষাকষি ও পারস্পরিক সম্মতিতে প্রতি কেজি ৩০/- টাকা দরে ৪০ কেজি চালের মোট দাম ১,২০০/- টাকা ধার্য করলো; তারা আরও স্থির করলো যে, এক মাসের মধ্যে দাম পরিশোধের শর্তে ক খ-এর কাছে ৪০ কেজি চাল বাকিতে বিক্রি করবে, তবে খ যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে তার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তীতে বর্ধিত মেয়াদের জন্য উক্ত দেনার ওপর বার্ষিক ১৫% সুদ ধার্য হবে এবং খ তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

এখানে পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত ৪০ কেজি চাল হচ্ছে ১,২০০/- টাকার *কাউন্টার ভ্যালু*, আর ১২০০/- টাকা হচ্ছে ৪০ কেজি চালের *কাউন্টার ভ্যালু*। এখানে মূল্যের সমতা ও পারস্পরিক লেনদেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি শর্তই পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং এই চুক্তিটি হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। কিন্তু পরিশোধে ব্যর্থ হলে বার্ষিক ১৫% সুদ ধার্য করার চুক্তিটি হচ্ছে স্বতন্ত্র আর একটি চুক্তি– *রিবা* চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে খ তার দেনার ওপর বছরে ১৫% অতিরিক্ত ক-কে দেবে, আর ক তা নেবে কিন্তু তার কোন বিনিময় বা *কাউন্টার ভ্যালু* দেবে না। সুতরাং এই চুক্তিতে *কাউন্টার ভ্যালুর* সমতা নেই (খ দিচ্ছে ১৫%, ক দিচ্ছে ০%) আর পারস্পরিক লেনদেনের শর্তও পূরণ হয়নি (খ দিচ্ছে, কিন্তু ক কিছুই দিচ্ছে না)। সুতরাং এ চুক্তিটি পরের সম্পদ মাগনা নেওয়ার অবৈধ *রিবা* চুক্তি।

অনুরূপভাবে বলা যায় যে, *মুরাবাহা* চুক্তিও বাকি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। কিন্তু বাকি থাকা খরচ + লাভ তথা দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সময়ের ভিত্তিতে তার ওপর অতিরিক্ত ধার্য করার চুক্তি করা হলে সেই চুক্তি হয় *রিবা* চুক্তি এবং *হারাম*। এই চুক্তি দ্বারা পাওনাদার তার মালিকানায় নেই এমন জিনিস বিক্রি করেছে এবং তার নির্ধারিত পাওনার চেয়ে অন্যায়ভাবে বেশি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং অপরের সম্পদের ওপর অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

বাই-সালাম ও রিবা ঃ *বাই-সালাম* মানে অগ্রিম বিক্রয়। *বাই-সালামে* নির্ধারিত দাম তাৎক্ষণিক নগদ পরিশোধ করা হয়; কিন্তু নির্ধারিত (specified) পণ্য ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের জন্য বাকি রাখা হয়।

বাই-সালামে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু বিনিময় করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক সম্মতিতে যে পরিমাণ পণ্য এবং তার যে দাম নির্ধারণ করে তাই হয় পরস্পর বৈধ *কাউন্টার ভ্যালু*। অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর *কাউন্টার*

www.icsbook.info

ভ্যালুদ্বয়ের মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায়; অর্থাৎ নির্ধারিত পণ্যের মালিক হয় ক্রেতা, আর নির্ধারিত দামের মালিক হয় বিক্রেতা। বিক্রেতা তাৎক্ষণিকভাবে দাম নগদ বুঝে নেয়, কিন্তু পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রেতার জিম্মায় বাকি থাকে। এই পণ্যই হচ্ছে বিক্রেতার দেনা আর ক্রেতার পাওনা। প্রদত্ত দামের ওপর ক্রেতার মালিকানা নেই শুধু তাই নয়, তা বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়াও হয়ে গেছে; সুতরাং দাম আবার হ্রাস করা তথা পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকার ক্রেতার থাকতে পারে না। এতদসত্ত্বেও দেনাদার ও পাওনাদার সম্মত হয়ে যদি দেনা-পাওনার (বাকি পণ্য) ওপর কোন বাড়তি ধার্য করে, তাহলে সেই বাড়তি হবে *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর অতিরিক্ত একতরফা ও মাগনা, সুতরাং *রিবা*।

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, ক একজন ধান বিক্রেতা এবং খ ধানের একজন ক্রেতা। তারা উভয়ে স্থির করল যে, প্রতি কেজি ২০ টাকা দরে ৪০ কেজি ধানের দাম ৮০০/- টাকা। তারা আরও সিদ্ধান্ত করলো যে, খ ৪০ কেজি ধানের *কাউন্টার ভ্যালু* ৮০০/- টাকা তাৎক্ষণিক নগদ ক-কে পরিশোধ করে দেবে; আর ক ক্ষেতের ধান তোলার পর ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে খ-কে ৪০ কেজি ধান সরবরাহ করবে। তবে ক যদি নির্ধারিত তারিখে ধান হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রতি বিলম্বিত দিনের জন্য ১ কেজি ধান বা ২০/- টাকা করে অতিরিক্ত ধার্য করা হবে এবং ক তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। এখানে প্রথম চুক্তিটি অর্থাৎ ৮০০/- টাকার বিনিময়ে ৪০ কেজি ধান অগ্রিম বিক্রয় চুক্তি হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত *বাই-সালাম* চুক্তি। *কাউন্টার ভ্যালুর* সমতা এবং পারস্পরিক লেনদেনের শর্ত পূর্ণ হওয়ায় এই চুক্তিটি সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু প্রতি বিলম্বিত দিনের জন্য ১ কেজি ধান বা ২০ টি টাকা ধার্য করার চুক্তি হচ্ছে ভিন্নতর আর একটি চুক্তি যা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর (প্রথমটির পরই দ্বিতীয়টি হয়) পাওনাদার ক এবং দেনাদার খ এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের পর যতদিন ক ৪০ কেজি ধান পরিশোধ না করবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যহ ১ কেজি ধান বা ২০ টাকা হারে খ-কে দিতে থাকবে; আর খ তা নেবে কোন বিনিময়, *কাউন্টার ভ্যালু* বা দাম না দিয়ে। সুতরাং এই চুক্তি *রিবা* চুক্তি এবং সম্পূর্ণ অবৈধ।

***বাই-ইসতিসনা ও রিবা* ঃ** এক কথায় *বাই-ইসতিসনাকে* বলা হয় আদেশ ক্রয় (order sale)। নির্ধারিত দামে সুনির্দিষ্ট পণ্যের আদেশ গ্রহণ পূর্বক আদিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করে সরবরাহ করা হলে সেই ক্রয়-বিক্রয়কে বলা হয় *বাই-ইসতিসনা* বা আদেশ ক্রয় (order sale)। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, *বাই-মোয়াজ্জল* ও *বাই-মুরাবাহায়* বিক্রীত পণ্য তাৎক্ষণিক নগদ সরবরাহ করা হয়, কিন্তু দাম বাকি থাকে; আর *বাই-সালামে* দাম নগদ পরিশোধ করা হয়, কিন্তু পণ্য বাকি থাকে। *বাই-ইসতিসনায়* আদিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা তৈরী করতে সময় লাগে, সুতরাং পণ্য সরবরাহ বিলম্বিত করতেই হয়; আর

www.icsbook.info

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মত হলে দামও বাকি রাখা যায়। সুতরাং *ইসতিসনায়* পণ্য ও দাম উভয় *কাউন্টার ভ্যালুই* বাকি থাকতে পারে।

বাই-ইসতিসনাতে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতের বিধায় এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে *কাউন্টার ভ্যালু* নিরূপণ ও নির্ধারণ করা বিধেয়। অন্যান্য বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় *কাউন্টার ভ্যালু* নিরূপণ ও নির্ধারণ এবং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর *কাউন্টার ভ্যালুদ্বয়ের* মালিকানা পরস্পর হস্তান্তরিত হয়ে যায়। ফলে বিক্রেতার দেনা হয় আদিষ্ট পণ্য, আর ক্রেতার দেনা হয় নির্ধারিত দাম। বিক্রেতা আদেশমত প্রস্তুত করে পণ্য সরবরাহ করলে ক্রেতা চুক্তির শর্ত মতে দাম পরিশোধে বাধ্য থাকে। সুতরাং বিক্রেতা (প্রস্তুতকারক) তার মালিকানা নেই সেই পণ্যের পরিমাণে কম-বেশি করতে পারে না।

কিন্তু প্রস্তুতকারক (আদেশ গ্রহীতা) নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার নির্ধারিত পাওনা দাম হ্রাস করা বা তার ওপর জরিমানা আরোপ করা যাবে কিনা?

এ ব্যাপারে আধুনিক ফকীহগণ *বাই-ইসতিসনার* আদেশকে কার্যাদেশ হিসেবে বিবেচনা করছেন এবং যথাসময়ে কাজ না করার শাস্তিস্বরূপ (punishment for non performance) জরিমানা আরোপ করা যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন। এই জরিমানা *রিবা* নয় বলে তারা মনে করেন। তবে বিষয়টির ওপর আরও গবেষণা হওয়া দরকার। তাছাড়া, একদিকে আদিষ্ট পণ্য অন্যদিকে অর্থ; একটি অপরটির *কাউন্টার ভ্যালু*। অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করলে এবং এজন্য তার ওপর কোন বৃদ্ধি করা হলে তা হয় *রিবা*; কিন্তু আদিষ্ট পণ্য (অপর *কাউন্টার ভ্যালু*) প্রদানে বিলম্ব করলে তার ওপর ধার্যকৃত জরিমানা *রিবা* নয়। এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অপরপক্ষে চুক্তিতে যদি শর্ত করা হয় যে, ক্রেতা নির্ধারিত সময়ে তার দেনা (নির্ধারিত দাম) পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বিলম্বিত সময় কালের জন্য উক্ত দেনার ওপর নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত আরোপ করা হবে, তাহলে এই শর্তটি হচ্ছে *রিবা* চুক্তি যাতে বিনিময়হীন অতিরিক্ত একতরফাভাবে লেনদেন করার কথা স্থির করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক, ক সেগুন কাঠের একটি ডাইনিং টেবিল আর সাথে ৮টি চেয়ার বানিয়ে নিতে চায়। সে কাঠ মিস্ত্রী খ-এর কাছে তার প্রস্তাব পেশ করলো। উভয়ে সম্মত হয়ে টেবিল-চেয়ারের মোট দাম (মজুরীসহ) নির্ধারণ করলো ৫০,০০০/- টাকা। খ এক মাসের মধ্যে তা তৈরী করে দিতে রাজী হলো। আর ক সরবরাহ নেয়ার এক মাসের মধ্যে দাম পরিশোধ করবে বলে স্থির করা হলো। অতঃপর উভয়ে সম্মত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করলো। তারা পরস্পর এই শর্ত করলো যে, টেবিল-চেয়ার বুঝে নেয়ার এক মাসের মধ্যে ক্রেতা পুরো দাম পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বিলম্বিত সময়-কালের জন্য তাকে শতকরা বার্ষিক ১৫/- টাকা হারে অতিরিক্ত দিতে হবে।

এখানে প্রথম চুক্তিটি হচ্ছে *ইসতিসনা* ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এক্ষেত্রে বিক্রেতা খ-এর দেনা হলো টেবিল-চেয়ার যা সে এক মাসের মধ্যে প্রস্তুত করে দিবে এবং ক্রেতা ক এর দেনা

www.icsbook.info

হলো নির্ধারিত দাম ৫০,০০০/- টাকা। যদি খ নির্ধারিত এক মাসের মধ্যে আদেশ অনুসারে প্রস্তুতকৃত টেবিল সরবরাহ করে এবং ক সরবরাহ গ্রহণের পর থেকে এক মাসের মধ্যে দাম পরিশোধ করে তাহলে তাদের পরস্পরের দেনা-পাওনা চুকে যাবে এবং লেনদেন সমাপ্ত হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তিটি হচ্ছে দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে কৃত *রিবা* চুক্তি। ক্রেতা যদি সরবরাহ নেয়ার এক মাসের মধ্যে তার দেনা শোধে ব্যর্থ হয় তাহলে বিলম্বিত সময়ের জন্য মূল্যের ওপর শতকরা বার্ষিক ১৫ টাকা হারে প্রদত্ত সাকুল্য অতিরিক্ত হবে বিনিময়হীন আর এজন্য *রিবা*।

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে (সরফ) রিবা

ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রা, যেমন বাংলাদেশী টাকার বিনিময়ে আমেরিকার ডলার, সৌদী রিয়েলের বিনিময়ে যুক্তরাজ্যের পাউন্ড স্টারলিং ইত্যাদি বাকি ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ ও *গারার* থাকার আশঙ্কা করেই সম্মানিত ফক্বীহগণ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নগদে নগদে (on the spot) করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে ক্রয়-বিক্রয় আলোচনায় আধুনিক গবেষক হাশিম কামালির অভিমত তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, *রিবা* ও *গারার*মুক্ত হলে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রার বাকি ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুদ্রা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে কিভাবে *রিবা* হয় সে বিষয়টি জানা থাকা দরকার।

ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন জাতের হলে সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এদের বিনিময় রেশিও বা *কাউন্টার ভ্যালু* নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর কোন একটি *কাউন্টার ভ্যালু* প্রদান নির্ধারিত মেয়াদের জন্য স্থগিত রাখা হলে তা হবে বাকি ক্রয়-বিক্রয় যা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মত হয়ে স্থগিতকৃত *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর বিলম্বিত সময়ের ভিত্তিতে যদি অতিরিক্ত ধার্য ও লেনদেন করে তাহলে সেই অতিরিক্ত হবে একতরফা ও বিনিময়হীন লেনদেন; সুতরাং *রিবা* যা হারাম।

ইজারাহ ও রিবা ঃ ইজারাহ মূলতঃ দুই প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে মানুষ (human beings) ও পশুর (animals) শ্রম বা ব্যবহার বিক্রি করা; শরয়ী পরিভাষায় একে বলা হয় *ইজারাহ আল জিম্মাহ*; আর এক প্রকার হচ্ছে *নন-ফানজিবল* পণ্য বা সম্পদ-সম্পত্তির সেবা (service) বা ইউসাফ্রাক্ট (usufruct) বিক্রি করা; শরীয়তের ভাষায় একে বলা হয় *ইজারাহ আল-আইন*; ইংরেজীতে 'leasing' ও বাংলায় 'ভাড়া' হচ্ছে এর প্রতিশব্দ। কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত মজুরী বা বেতনের বিনিময়ে শ্রমিক ভাড়া করা, অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, মামলার জন্য উকিল, শিক্ষার জন্য শিক্ষক ইত্যাদি ভাড়া করা অথবা বিশেষ কোন কাজের জন্য কোন পশু ভাড়া করা হচ্ছে *ইজারা আল-জিম্মাহর* উদাহরণ। আর জমি, গাড়ী, বাড়ী, মেশিন,

www.icsbook.info

যন্ত্রপাতি, পোশাক ইত্যাদি ভাড়া করা হচ্ছে *ইজারাহ আল-আইন*। বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ইত্যাদি সার্ভিস বিক্রি করা হচ্ছে *ইজারাহ আল-আইনের* অন্তর্ভুক্ত।

মোট কথা, ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে কোন মানুষ, পশু বা সম্পদ সুনির্দিষ্ট কাজে ব্যবহারের জন্য কাউকে প্রদান করা হলে তাকে বলা হয় *ইজারাহ*। এখানে ভাড়া ও ব্যবহার হচ্ছে একে অপরের *কাউন্টার ভ্যালু*। কিন্তু যথাসময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং বিলম্বিত সময়ের জন্য ভাড়ার ওপর কোন অতিরিক্ত ধার্য করা হলে সেই অতিরিক্ত হয় *কাউন্টার ভ্যালু*হীন অতিরিক্ত বা *রিবা*।

উদাহরণস্বরূপ, বাড়ীর মালিক ক এবং ভাড়াটিয়া খ পারস্পরিক সম্মতিতে মাসিক ২০,০০০/- টাকা ভাড়া ধার্য করে প্রতি পরবর্তী মাসের ১ তারিখে ভাড়া পরিশোধের শর্তে বাড়ীতে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ক খ-এর কাছে তার বাড়ী ভাড়া দিল। তারা আরও শর্ত করলো যে, ভাড়া কার্যকর হওয়ার দিন থেকে প্রত্যেক মাসের ১ তারিখে পূর্ববর্তী মাসের ভাড়া পরিশোধ না করলে বিলম্বিত প্রতি দিনের জন্য খ ভাড়ার ওপর ১% অতিরিক্ত পরিশোধে বাধ্য থাকবে। এখানে প্রথম চুক্তিটি হচ্ছে পরস্পর *কাউন্টার ভ্যালুর* বিনিময় তথা *ইজারাহ* বা বাড়ীর সেবা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এই চুক্তিটি বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তিটি হচ্ছে *রিবা* চুক্তি বা ভাড়াটিয়া খ-এর সম্পদ বিনামূল্যে হস্তগত করার অবৈধ চুক্তি।

অনুরূপভাবে পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল বা ইন্টারনেটের ব্যবহার হচ্ছে *ইজারাহ* চুক্তি। কিন্তু ভাড়া বিলম্বে পরিশোধের কারণে মূল্যের ওপরে আবার জরিমানা, সুদ ইত্যাদি নামে কোন অতিরিক্ত ধার্য ও আদায় করা হলে সেই অতিরিক্ত লেনদেন হবে *কাউন্টার ভ্যালু*হীন বাড়তি বা *রিবা*।

***ফিউচার্স, অপশনস* ক্রয়-বিক্রয় ও রিবা ঃ** *ফিউচার্স* ও *অপশনস* ক্রয়-বিক্রয় সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন। বর্তমানে ফিউচার্স ও অপশনস্ ব্যাপকভাবে লেনদেন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর অনেক ধরন চালু করা হয়েছে। *ফিউচার্স* ও *অপশনস* কাকে বলে, এর *মোডাস অপারেন্ডি* (Modus Operandi) কি এবং এতে রিবা কিভাবে উদ্ভূত হয়, এসব বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা

আল-কুরআনের পরিভাষায় নগদ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে '*তেজারাতান হাজিরাতান*'; অর্থাৎ উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়; ইংরেজীতে একে বলা হয় spot exchange বা cash transaction. এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি এবং পণ্য লেনদেনের মাঝে কোন সময় থাকে না। তাছাড়া কাউন্টার ভ্যালু নেওয়া ও দেওয়ার মাঝেও সময় থাকে অনুপস্থিত।

www.icsbook.info

এক্ষেত্রে কোন বিলম্ব না করে ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের নিজ নিজ পণ্য সেবা বা অর্থ পরস্পর হস্তান্তর করে। এক কথায় এখানে চুক্তি ও উভয় পক্ষের পারস্পরিক হস্তান্তরের কাজ একই বৈঠকে সম্পন্ন করে ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত করা হয়। এজন্য এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় লিখে নেওয়া বা এর দলীল দস্তাবেজ তৈরী করার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় লিখে নেওয়ার দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়েছেন। (আল-কুরআনঃ ২:২৮২) নগদ ক্রয়-বিক্রয় দুই রকম হতে পারে ঃ সমজাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয় এবং অসম জাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়।

সমজাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে *রিবা ঃ* প্রথমত, এক জাতের পণ্য, সেবা ও অর্থ নগদ বিনিময়ে এদের মানগত সমতার বিধি লংঘন করা হলে এদের মূল্যে অবশ্যই পার্থক্য সৃষ্টি হবে। মনে করা যাক, একজন ক্রেতা ২৪ ক্যারেটের ১ তোলা সোনা বিক্রেতাকে দিল; আর বিক্রেতা ২০ ক্যারেটের ১ তোলা সোনা ক্রেতাকে তাৎক্ষণিক হস্তান্তর করল। এখানে পরিমাণে (ওজন) সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও মানগত পার্থক্যের দরুন উভয় সোনার দাম সমান নয়। ফলে উভয় সোনার দামের ব্যবধানটাই হচ্ছে *রিবা*। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একই জাতের দুটি পণ্যের পরস্পর সরাসরি বিনিময় হয় বলে এদের দামের পার্থক্য জানা যায় না। সেজন্য এখানে *রিবা* কি পরিমাণ তা বলাও সম্ভব নয়। আর একারণেই উভয় পণ্যের মানগত পার্থক্য উল্লেখযোগ্য হলে, সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এদের সরাসরি বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন এবং ভিন্নতর কোন পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে খারাপ পণ্য (খেজুর) বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ পণ্য বা অর্থ দ্বারা উন্নত মানের পণ্য (খেজুর) ক্রয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, একই জাতের দুটি পণ্যের মধ্যে বিদ্যমান মানগত পার্থক্যকে বিবেচনায় নিয়ে এদের বিনিময় রেশিওতে কম-বেশি করা হলেও এতে *রিবা* হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। যেমন দুই সা' খারাপ খেজুরের বদলে ১ সা' উন্নত মানের খেজুরের সরাসরি বিনিময়ে উভয় খেজুরের দাম সমান হয়েছে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সুতরাং সম্মানিত ফক্বীহগণ সকলেই এই বর্ধিত ১ সা' খারাপ খেজুরকে *রিবা* বলেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে, "এতো *রিবার* মতই, এতো *রিবাই*।"

তৃতীয়ত, একজাতের দুটি পণ্যের মান এক রকম হওয়া সত্ত্বেও যদি এদের পরিমাণে কম-বেশি করা হয় যেমন, ১ কেজি লেংড়া আমের বিনিময়ে ১.৫০ কেজি লেংড়া আমের ক্রয়-বিক্রয় হলে ১ কেজি আমের দাম হবে ১ কেজি আম। এটাই পরস্পরের *কাউন্টার ভ্যালু*। এদের পারস্পরিক বিনিময় হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। অতঃপর এক পক্ষ তার প্রদত্ত *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপরে .৫০ কেজি বেশি দিয়েছে; এর কোন বিনিময় বা *কাউন্টার ভ্যালু* সে পায় নাই। অপরপক্ষে গ্রহীতা তার প্রদত্ত ১ কেজি আমের বিনিময়ে প্রাপ্য *কাউন্টার ভ্যালুর* ওপর .৫০ কেজি আম বেশি নিয়েছে যার কোন *কাউন্টার ভ্যালু* সে দেয় নাই; এটি রিবা চুক্তি। এখানেও দুটো চুক্তি কার্যকর রয়েছে।

www.icsbook.info

অসমজাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে *রিবা* ঃ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলেছেন, অসমজাতের পণ্য, অর্থ বা সেবা নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে রিবা হয় না; কারণ এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কোন দামে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে সুন্নাহর দৃষ্টিতে সুদ শিরোনামে প্রতারণা, সুপারিশ, ঈজাব, নাজিশ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ধৃত হাদীস কয়টি থেকে জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু নগদ ক্রয়-বিক্রয়েও রিবা উদ্ভূত হতে পারে। নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রতারণা ঃ কেউ যদি প্রতারণা করে দাম বেশি নেয়, তাহলে সেই বর্ধিত অংশটুকু তার জন্য রিবা। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক একজন ক্রেতা একটি জিনিসের দাম বললো ১০০/- টাকা এবং জানিয়ে দিল এর বেশি সে দেবে না। এ অবস্থায় বিক্রেতা মিথ্যা কথা বললো যে তার কেনা দাম আছে ১০৫/- টাকা; অতএব ক্রেতা যদি আর ৫/- টাকা দেয়, তাহলে অন্তত আসল দামে জিনিসটি তাকে দিতে পারে। ক্রেতা অগত্যা ১০৫/- টাকা দিয়ে জিনিসটি ক্রয় করলো। উদাহরণে এটা স্পষ্ট যে, ১০০/- টাকা হচ্ছে জিনিসটির দাম; অতঃপর বর্ধিত ৫/- হচ্ছে মিথ্যা কথার দাম। বিক্রেতার জন্য এই ৫/- টাকা হচ্ছে রিবা।

অনুরূপভাবে বাজার দর সম্পর্কে ধারণা নেই এমন কোন লোকের কাছ থেকে কোন পণ্য ক্রয়কালে তার অজ্ঞতার সুযোগে যদি দাম কম দিয়ে তাকে ঠকানো হয় তা হলে প্রদত্ত সেই দামে বাজার দর অনুসারে যে পরিমাণ পণ্য হয় তার ওপরে পণ্যের বর্ধিতাংশ হবে কাউন্টার ভ্যালুর ওপর বিনিময়হীন বৃদ্ধি বা রিবা।

একইভাবে নাজাশ করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়াও এক ধরনের প্রতারণা। নাজিশ ক্রয় করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম করে যাতে প্রকৃত ক্রেতা উক্ত প্রস্তাবিত দামের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এভাবে নাজিশ কর্তৃক মিথ্যা দরদামের মাধ্যমে বর্ধিত দামটুকু হয় প্রকৃত দামের ওপর বিনিময়হীন বৃদ্ধি; সুতরাং রিবা।

সুপারিশ ঃ সুপারিশের বিনিময়ে উপহার/উপঢৌকন গ্রহণ করলে সেই উপহার/ উপঢৌকন হয় বিনিময়হীন। আর বিনিময়হীন হলেই তা হয় রিবা।

ঈজাব ঃ পাকার পূর্বে ফল বিক্রি করা হলে, অপরিপক্বতার দরুন সে ফল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর যদি তা হয় তাহলে ফলের বিনিময়ে গৃহীত দাম বিনিময়হীন রিবায় পর্যবসিত হবে।

প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারণকালে ধোকা, প্রতারণা, জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে কোন পক্ষের প্রকৃত দামে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হলে দামের ওপর বর্ধিত অংশ হয় রিবা।

www.icsbook.info

উপরে বিভিন্ন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সাথে কিভাবে *রিবা* চুক্তি করা হয় এবং তার ফলে কিভাবে রিবা উদ্ভূত হয় তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয়-বিক্রয়ে কোন একটি কাউন্টার ভ্যালুর ওপর অতিরিক্ত ধার্য করা হলে এবং এই অতিরিক্তের বিনিময় বা কাউন্টার ভ্যালু দেওয়া না হলে সেই বিনিময়হীন অতিরিক্ত হচ্ছে *রিবা* বা সুদ।

এক নজরে ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের তুলনা

ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদ সম্পর্কে আলোচনার পর এখানে এগুলোর মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনা পেশ করা হলো ঃ

ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, মুনাফা ও সুদের সংক্ষিপ্ত তুলনা

বিষয়	ক্রয়-বিক্রয়	ভাড়া	মুনাফা	সুদ
১) উৎস	ক্রয়-বিক্রয়ের উৎস বৈধ চুক্তি।	ভাড়ার উৎস বৈধ চুক্তি।	মুনাফার উৎস উৎপাদন।	সুদের উৎস অবৈধ চুক্তি।
২) প্রয়োগ ক্ষেত্র	সকল বৈধ পণ্য, মুদ্রা ও সেবা।	সকল নন-ফান্‌জিবল পণ্য, মানুষ ও পশুর সেবা	সকল বৈধ উৎপাদন কাজ তথা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের উৎপাদন।	সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়েই সুদের চুক্তি করা যায়।
৩) ধরন	সমান সমান মূল্যের বিনিময়।	সমান সমান মূল্যের বিনিময়।	ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারিত কাউন্টার ভ্যালুর অন্তর্ভুক্ত।	ক্রয়-বিক্রয়ে একদিকের কাউন্টার ভ্যালুর ওপর ধার্য করা হয়।
৪) মূল্য বা বিনিময়	বিনিময় দিয়ে পণ্য বা মুদ্রা নেওয়া হয় তথা বিনিময় আছে।	বিনিময় দিয়ে সেবা নেওয়া হয় তথা বিনিময় আছে।	বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত বা সংযোজিত উপযোগ হচ্ছে মুনাফার কাউন্টার ভ্যালু।	বিনিময় না দিয়ে নেওয়া হয়; কাউন্টার ভ্যালু বা বিনিময় নেই।

৫) লেনদেন	লেনদেন পারস্পরিক।	লেনদেন পারস্পরিক।	লেনদেন পারস্পরিক।	একতরফা দেওয়া ও একতরফা নেওয়া হয়।
৬) নির্ধারণ	কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারিত হওয়া আবশ্যকীয়।	কাউন্টার ভ্যালু নির্ধারিত হওয়া আবশ্যকীয়।	নির্ধারিত কাউন্টার ভ্যালুতে লাভ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে; মুনাফা অনিশ্চিত।	পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত।
৭) ঝুঁকি	ঝুঁকিপূর্ণ।	ঝুঁকিপূর্ণ।	ঝুঁকিপূর্ণ।	ঝুঁকি নেই।
৮) পরিণতি	পূর্ণ ইনসাফ বহাল থাকে; ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ ঠকে না, কেউ জিতে না।	পূর্ণ ইনসাফ বহাল থাকে; ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ ঠকে না, কেউ জিতে না।	পূর্ণ ইনসাফ বহাল থাকে; ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ ঠকে না, কেউ জিতে না।	বেইনসাফী কায়েম হয়। এক পক্ষের ক্ষতির বিনিময়ে অপর পক্ষ লাভবান হয়।
৯) গুরুত্ব	মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।	মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।	জীবিকার উৎস, অর্থনীতির চালিকাশক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।	মানব সমাজের জন্য অকল্যাণ ও ধ্বংসের বাহন।
১০) বৈধতা	বৈধ বা হালাল।	বৈধ বা হালাল।	বৈধ বা হালাল।	অবৈধ বা হারাম।

তুলনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময় দিয়ে নেওয়া হয় এজন্য ক্রয়-বিক্রয় হালাল; মুনাফা বিনিময় মূল্যের অংশ– মুনাফার বিনিময় আছে এজন্য মুনাফা হালাল। সুদ বিনিময় না দিয়ে নেওয়া হয় এজন্য সুদ হারাম।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় খণ্ড

সুদের কুফল

www.icsbook.info

www.icsbook.info

ভূমিকা

সুদের কুফল আলোচনার পূর্বে সুদী কারবারের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করলে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা সহজ হবে। নিচে প্রাচীন ও আধুনিক কালের সুদী কারবারের স্বরূপ আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন কালের সুদী কারবার

সুদী কারবারের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আমাদের একটু পেছনে গিয়ে স্বর্ণমান ব্যবস্থা থেকে আলোচনা করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, দূর অতীতের এক সময়ে স্বর্ণ অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সে সময়ে সাধারণ মানুষ স্বর্ণ সঞ্চয় করলে নিরাপত্তার জন্য তা এলাকার ধনী স্বর্ণকারদের (Goldsmith) কাছে গচ্ছিত রাখত এবং এ মর্মে স্বর্ণকারদের নিকট থেকে রসিদ লিখে নিত। স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের স্বর্ণ হেফাযত করত, হিসাব সংরক্ষণ করত এবং কেউ তার স্বর্ণ ফেরত নিতে এলে তাকে তার স্বর্ণ যথাযথভাবে ফেরত দিত। প্রথমদিকে স্বর্ণকারগণ তাদের এসব কাজের জন্য স্বর্ণ আমানতকারীদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিত। কালক্রমে স্বর্ণকারদের দেওয়া রসিদগুলো ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ফলে স্বর্ণকারদের কাছ থেকে কাঁচা সোনা তুলে নেওয়ার জন্য জমাকারীরা খুব একটা আসতো না। স্বর্ণকারগণ দেখলো যে, তাদের কাছে গচ্ছিত স্বর্ণের বিরাট অংশ সারা বছর তাদের সিন্দুকেই পড়ে থাকে এবং শতকরা মাত্র ১০-১৫ ভাগ লোক কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাদের সোনা তুলে নিতে আসে। স্বর্ণকারগণ এই অবস্থাকে নিজেদের জন্য এক বিরাট সুযোগ মনে করল। তারা গচ্ছিত সোনার মাত্র ১০-১৫ ভাগ রেখে বাকি ৮৫-৯০ ভাগ সুদের বিনিময়ে ধার দিয়ে সুদ অর্জন করতে লাগল। এভাবে তারা স্বর্ণ সংরক্ষণের বিনিময়ে একদিকে স্বর্ণের মালিকদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক আদায় করত, অপরদিকে মালিকদের সোনা নিজেরা ধার দিয়ে সুদ উসূল করত।

স্বর্ণকারগণ এটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের অর্থলিপ্সা ও চালবাজি আরও অনেক দূর গড়িয়ে গেল। তারা দেখলো যে, তাদের ধার দেওয়া স্বর্ণগুলো ঋণগ্রহণকারীরাও সকলেই তুলে নেয় না; বরং তাদের কাছেই গচ্ছিত রেখে রসিদ নিয়ে যায়। তারা এটাও দেখলো যে, স্বর্ণের প্রকৃত মালিককে দেওয়া রসিদের ন্যায় ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া রসিদগুলোও বাজারে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের সব কাজ করে যাচ্ছে। মালিক এবং ঋণগ্রহণকারিগণ সাধারণতঃ শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের বেশি সোনা ফেরত নিতে আসে না। ফলে ধার দেওয়া স্বর্ণেরও শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ তাদের সিন্দুকেই পড়ে থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে তারা যখন স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, স্বর্ণ ধার দিলে স্বর্ণ

www.icsbook.info

দিতে হয় না। কেবল রসিদ দিলেই চলে, তখন তারা একই সোনাকে বারবার ধার দিয়ে ঋণগ্রহীতাদের সোনা গচ্ছিত আছে বলে রসিদ দিতে এবং তার ওপর সুদ নিতে লাগল। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, কোন এক ব্যক্তি স্বর্ণকারের কাছে ১০ তোলা স্বর্ণ জমা করল এবং এ মর্মে একটা রসিদ নিল। এই রসিদটি প্রকৃত স্বর্ণ জমার রসিদ। এখন স্বর্ণকার যেহেতু অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, স্বর্ণের প্রকৃত মালিক উক্ত দশ তোলা স্বর্ণের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে কেবল ১ তোলা অর্থাৎ ১০% সোনা তুলে নিতে পারে; বাকি ৯ তোলা অর্থাৎ ৯০% তার কাছে সারা বছর পড়ে থাকবে। অতএব, স্বর্ণকার এ ৯ তোলা স্বর্ণ ধার দিল। এ স্বর্ণের প্রথম ঋণগ্রহীতা উক্ত ৯ তোলা স্বর্ণ তুলে নিল না, নিল একটা রসিদ, আর স্বর্ণ স্বর্ণকারের কাছেই থাকল। স্বর্ণকার সুদ পাবার লোভে এ ৯ তোলা স্বর্ণ আবারও ধার দিল এবং ঋণগ্রহীতাকে আর একটা রসিদ লিখে দিল। এভাবে স্বর্ণকার উক্ত ৯ তোলা স্বর্ণের কমপক্ষে দশটা রসিদ তৈরী করে দশজনকে (৯×১০=৯০ তোলা) ধার দিল এবং এর বিনিময়ে সুদ আদায় করল। স্বর্ণের প্রকৃত মালিকরা স্বর্ণকারদের চালাকি বুঝতে পেরে যাতে তাদের স্বর্ণ তুলে না নেয়, সেজন্য মালিকদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়ার পরিবর্তে স্বর্ণকারগণ এবার তাদের সুদ দিতে শুরু করল। এভাবেই স্বর্ণকাররা সম্পূর্ণ ভুয়া মুদ্রার আকারে শতকরা ৯০ ভাগ জাল মুদ্রা তৈরী করত এবং তার মালিক সেজে প্রভূত পরিমাণে সুদ অর্জন করত।

নিঃসন্দেহে এ ব্যবসা ছিল একটা বিরাট প্রতারণা ও জালিয়াতি। কিন্তু দেশের রাজা, মন্ত্রী, আমীর-উমারা সবাই এ পুঁজিপতিদের ঋণের জালে আটকা পড়েছিল। এমনকি, যুদ্ধ এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংকট মুকাবিলার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারও তাদের কাছ থেকে বড় বড় ঋণ নিয়েছিল। এমতাবস্থায় এ ধনীদের জালিয়াতি ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মত সাহস-শক্তি কারও ছিল না। এভাবেই একটা বিরাট প্রতারণা ও জালিয়াতি কারবার আইনের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে, এমনকি, আইন একে বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছে।[১] এ হলো পুরাতন যুগের স্বর্ণকার ও ধনিক গোষ্ঠীর সুদী কারবারের স্বরূপ। হালে এসব স্বর্ণকার ও ধনিক গোষ্ঠীর স্থান পুঁজিপতি শ্রেণী ও ব্যাংকারগণ দখল করে নিয়েছে। আর এদের সুযোগ্য হাতের স্পর্শে সুদের অস্ত্র সকল যুগের চেয়ে অধিকতর ধ্বংসকর ক্ষমতা লাভ করেছে।[২]

আধুনিক ব্যাংকের সুদী কারবার

আধুনিক ব্যাংক-ব্যবসার স্বরূপ আলোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে কিভাবে ব্যাংকগুলো দেশের প্রায় সকল পুঁজি কুক্ষিগত করে নেয় এবং কিভাবে এরা গোটা অর্থনীতির ওপর প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে।

---

১. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃঃ ৭৪-৭৫।
২. উপরোক্ত, পৃঃ ৭২।

www.icsbook.info

উপরে স্বর্ণকার ও ধনীদের সুদী কারবারের যে রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তা ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বিক্ষিপ্ত। অর্থনৈতিক কায়-কারবার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এ সুদী কারবারগুলো বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয় এবং দূর-দূরান্তরে এগুলোর শাখা-প্রশাখা কায়েম করা হয়। ক্রমে আরও বড় প্রতিষ্ঠান এবং আরও ব্যাপক পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পর্যায়ে পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রের অন্যান্য শাখার ন্যায় অর্থ-ব্যবসাতেও যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে বড় বড় কোম্পানী গঠন করল। এরই নাম হলো ব্যাংক।

ব্যাংক দু'ধরনের পুঁজি খাটিয়ে থাকে: এক, অংশীদারদের পুঁজি; আর দুই, আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ। ব্যাংক প্রথমে অংশীদারদের পরিশোধিত স্বল্প পরিমাণ মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। অতঃপর আমানতকারীদের কাছ থেকে কম সুদের হারে এবং বিনাসুদে আমানত গ্রহণ করে এবং এই সাকল্য অর্থ অধিক সুদে লগ্নি করে বিপুল পরিমাণ সুদ অর্জন করে থাকে।

ব্যাংক সাধারণতঃ তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে: মেয়াদী আমানত (Fixed Deposit), সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposit) এবং চলতি আমানত (Current Deposit)।

মেয়াদী আমানত কমপক্ষে তিন মাস বা তদূর্ধ সময়ের জন্য রাখা হয়। আমানতকারীগণ মেয়াদ শেষ হবার আগে মেয়াদী আমানতের অর্থ তুলে নিতে পারে না। ব্যাংক মেয়াদী আমানতের ওপর সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন হারে সুদ দেয়। মেয়াদ যত দীর্ঘ হয় সুদের হার তত বেশি হয় এবং সময় যত কম হয় সুদের হারও তত কম হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মেয়াদী আমানতের ওপর শতকরা ৯.০০ টাকা থেকে ১৩.০০ টাকা হারে সুদ দিয়ে এ ধরনের আমানতকারীদের আকৃষ্ট করা হয়। আমানতকারীগণ প্রধানতঃ নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়ার লোভেই মেয়াদী হিসাবে অর্থ জমা করে।

সঞ্চয়ী আমানত হতে সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার বা দু'বার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ উঠানো যায়। এই পরিমাণের বেশি অর্থ উঠাতে হলে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিতে হয়। এরূপ আমানতের ওপর সাধারণতঃ শতকরা ৫ থেকে ৯ ভাগ সুদ দেওয়া হয়। আমানতকারীগণ সাধারণতঃ নিরাপত্তা এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের হিসাব খুলে থাকে।

চলতি আমানত থেকে আমানতকারীগণ যে কোন সময়ে যে কোন পরিমাণ অর্থ তুলে নিতে পারে। ব্যাংক সাধারণতঃ এরূপ আমানতের ওপর কোন সুদ দেয় না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক এরূপ আমানতকারীদের কাছ থেকে হিসাব সংরক্ষণের পারিশ্রমিক আদায় করে। নিরাপত্তা এবং লেনদেনের সুবিধার্থেই আমানতকারীগণ চলতি হিসাব খুলে থাকে।

এভাবে ব্যাংক এর মোট পুঁজির শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ অর্থ আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। অবশিষ্ট ৫-১০ ভাগ পুঁজি আসে শেয়ার মূলধন থেকে। ব্যাংক জনগণের

www.icsbook.info

আমানতের ওপর যে সুদ দেয় মোট আমানতের ওপর তার গড় হার ৫% থেকে ৭% এর বেশি হয় না। অথচ ব্যাংক এই সাকুল্য অর্থ ১৫% থেকে ২০% সুদে খাটিয়ে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

১৯৮৬ সালে (ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর) পরিশোধিত মূলধন ছিল ৮,০০,০০,০০০.০০ (আট কোটি) টাকা। এ বছর উক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ২৭১,১৯,০০,০০০.০০ (দুইশত একাত্তর কোটি উনিশ লক্ষ) টাকা। এছাড়া, অন্যান্য কোম্পানী থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৬,০০,৩০,০০০.০০ (ছত্রিশ কোটি ত্রিশ হাজার) টাকা। অর্থাৎ মূলধন, আমানত ও ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৩১৫,১৯,৩০,০০০.০০ (তিনশত পনের কোটি উনিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা। শতকরা হিসাবে পরিশোধিত মূলধনের হার দাঁড়াচ্ছে মোট পুঁজির ২.৫৩%; আর মোট পুঁজির ৯৭.৪৭% হচ্ছে আমানত ও ঋণ। এ বছর ব্যাংক আমানতকারী ও ঋণদাতাদের সুদ দিয়েছে ২১,২০,৫৬,০০০.০০ (একুশ কোটি বিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা। মোট আমানত অর্থাৎ ৩০৭ কোটি টাকার ওপর গড়ে সুদের হার দাঁড়ায় ৬.৯০%। অতঃপর ব্যাংক করপূর্ব নীট মুনাফা দেখিয়েছে ৯,৫০,১৬,০০০.০০ টাকা।[৩] মোট পরিশোধিত মূলধনের ওপর মুনাফার হার দাঁড়ায় ১১৮.৭৭%।

আধুনিক ব্যাংকের ঋণদান পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন স্বর্ণকারদের ন্যায় এরাও গচ্ছিত আমানতের নয় গুণ অর্থ ঋণ দিয়ে তার ওপর সুদ অর্জন করে থাকে। অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় 'বহুগুণ ঋণ সৃষ্টি' বা Multiple Credit Creation।

প্রাচীন স্বর্ণকারদের ন্যায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছে যে, যারা ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে, তারা সকলেই এক সাথে তাদের অর্থ তুলে নেয় না; বরং কেবল ১০% লোক তাদের অর্থ তুলে নিতে আসে, আর বাকি ৯০% অর্থ সর্বদা ব্যাংকের তহবিলেই থাকে। ফলে ব্যাংকগুলো তাদের কাছে গচ্ছিত আমানতের ১০% নগদ অর্থ হাতে রেখে বাকি ৯০% অর্থ সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

মনে করা যাক, 'ক' একটি ব্যাংক। আরও মনে করা যাক যে, কোন একজন আমানতকারী 'ক' ব্যাংকে ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা আমানত রাখল। 'ক' ব্যাংক এই আমানতের ১০% বা ১০০.০০ টাকা নগদ হাতে রেখে বাকি ৯০% বা ৯০০.০০ টাকা সুদের ভিত্তিতে লগ্নি করবে। এ ক্ষেত্রে 'ক' ব্যাংকের দেনা-পাওনার হিসাব দাঁড়াবে নিম্নরূপ ঃ

---

৩. ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৮৬।

www.icsbook.info

দেনা		পাওনা	
আমানত	১,০০০.০০	সংরক্ষিত নগদ	১০০.০০
		ঋণ	৯০০.০০
মোট	১,০০০.০০	মোট	১,০০০.০০

প্রত্যেক ব্যাংকই এককভাবে এর কাছে গচ্ছিত আমানতের ৯০% অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থা সার্বিকভাবে বা সকল ব্যাংক সম্মিলিতভাবে যখন ঋণ দেয়, তখন প্রত্যেকটি ঋণই নতুন আমানতের সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের ঋণ-সৃষ্ট আমানতের ৯০% অর্থ আবারও ঋণ দেওয়া হয়। এই ঋণও আবার আমানত সৃষ্টি করে এবং আবারও এর ৯০% ঋণ দেওয়া হয়। এভাবে ঋণ-আমানত-ঋণ-আমানতের এধারা চলতে থাকে মূল আমানত দশগুণ না হওয়া পর্যন্ত।

বিষয়টি সহজ করার জন্য বলা যায় যে, কোন ঋণগ্রহীতা যখন কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়, তখন উক্ত ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে হাতে হাতে নগদ অর্থ দেয় না; বরং ঋণগ্রহীতার নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলে এবং ঋণের অর্থ উক্ত হিসাবে জমা লিখে রাখে। অথবা অন্য কোন ব্যাংকে উক্ত ঋণগ্রহীতার হিসাব থেকে থাকলে সে হিসাবে উক্ত ঋণের অর্থ জমা করে দেয়। এভাবে ঋণগ্রহীতার ঋণের এই অর্থ ঋণদানকারী ব্যাংক অথবা অন্য কোন ব্যাংকে নতুন আমানতরূপে জমা হয়; আর ব্যাংক নতুন জমা পাওয়ায় এই জমার ৯০% আবার ঋণ দেয়। এভাবে যতবার ঋণ দেওয়া হয়, ততবারই নতুন আমানত সৃষ্টি হয় এবং আবার নতুন ঋণ দেওয়া সম্ভব হয়। নিম্নের উদাহরণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে ঃ

ধরা যাক, কোন একজন জমাকারী 'ক' ব্যাংকে ১০০০.০০ টাকা জমা রাখল। আরও ধরা যাক যে, 'ক' ব্যাংক এই আমানত থেকে ১০০.০০ টাকা নগদ হাতে রেখে বাকি ৯০০.০০ টাকা ঋণ দিল এবং ঋণগ্রহীতা এই ৯০০.০০ টাকা 'খ' ব্যাংকে জমা রাখল। এখন 'খ' ব্যাংক এই জমার ১০% অর্থাৎ ৯০.০০ টাকা নগদ রেখে বাকি ৮১০.০০ টাকা ঋণ দেবে; পরবর্তী ঋণগ্রহীতা এই ৮১০.০০ টাকা, আবার ধরা যাক, 'গ' ব্যাংকে জমা রাখল, 'গ' ব্যাংক এর ৯০% অর্থাৎ ৭২৯.০০ টাকার নতুন ঋণ দেবে। এই ঋণ আবার কোন ব্যাংকে জমা হবে এবং এর ৯০% আবার ঋণ দেয়া হবে। এভাবে সর্বশেষ ঋণ যখন এত ক্ষুদ্র হবে যে, তা থেকে আর নতুন ঋণ সৃষ্টি সম্ভব নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণ ও আমানত বর্ধিত হতে থাকবে। এতে গোটা ব্যাংক ব্যবস্থায় উক্ত ১০০০.০০ টাকার মূল আমানত থেকে সৃষ্ট সর্বমোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯০০+৮১০+৭২৯.... = ৯০০০.০০ টাকা এবং গোটা ব্যাংক ব্যবস্থার সর্বশেষ অবস্থা হবে নিম্নরূপ ঃ

www.icsbook.info

দেনা		পাওনা	
আমানত (মূল)	১,০০০.০০	সংরক্ষিত নগদ (মূল আমানত থেকে)	১০০.০০
আমানত (সৃষ্ট)	৯,০০০.০০	সংরক্ষিত নগদ (সৃষ্ট আমানত থেকে)	৯০০.০০
		ঋণ (মূল আমানত থেকে)	৯০০.০০
		ঋণ (সৃষ্ট আমানত থেকে)	৮,১০০.০০
মোট	১০,০০০.০০	মোট	১০,০০০.০০

দেখা যাচ্ছে যে, যে আমানতের অর্থ ব্যাংকের কাছে কেবল খাতা-কলমে আছে, বাস্তবে নেই, তাকেও আমানত গণ্য করে ব্যাংকগুলো প্রকৃত অর্থের চেয়ে বহুগুণ বেশি ঋণ দেয় এবং তার ওপর সুদ অর্জন করে, যেমন স্বর্ণকারগণ করত। এভাবেই ব্যাংকব্যবস্থা শূন্যের ওপর ঋণের বুদবুদ সৃষ্টি করে এবং প্রকারান্তরে ঋণগ্রহীতা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মাধ্যমে ভোক্তা জনগণের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সুদ আদায় করে নেয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বকালে প্রচলিত মহাজনী সুদ দুনিয়ার সর্বত্রই নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়েছে; একে ভাল বলার দুঃসাহস এখন আর কেউ করে না। কিন্তু আধুনিককালে মহাজনেরা একত্রিত হয়ে গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে যাকে বলা হয় ব্যাংক। এখন বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতিরই উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না, কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না তাদের সকলের টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয় এবং প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। এতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জাতির অলস সঞ্চয়সমূহের উৎপাদনশীল ব্যবহার সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় "এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।" চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের সামনে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, চরিত্র বিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেওয়ার ফলে এসব অপরাধের ব্যাপকতা যেমন পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে, সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতিও তেমনি একদিকে সুদের বেইনসাফীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে, অপরদিকে সুদের কুফল ও ধ্বংসও ব্যাপক ও মারাত্মক রূপ নিয়েছে।

সুদী কারবারের প্রাচীন ও আধুনিক স্বরূপ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আধুনিক কালে সুদী কারবারের প্রকৃতিগত স্বভাবে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। তবে একালে জনগণের অর্থ কুক্ষিগত করায় ব্যাংকগুলোর ক্ষমতা প্রাচীনকালের স্বর্ণকার ও পুঁজিপতিদের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লামা সাইয়েদ

www.icsbook.info

আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) লিখেছেন, 'পুঁজিপতিদের সংগঠন কায়েম হবার পর প্রথম যুগের একক ও বিক্ষিপ্ত মহাজনদের তুলনায় বর্তমান একীভূত ও সংগঠিত পুঁজিপতিদের মর্যাদা, প্রভাব ও আস্থা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। আজকের দিনে এক একটি ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা জমা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী পুঁজিপতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। তারা কেবল নিজেদের দেশে নয়, বরং সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর চরম স্বার্থান্ধতাসহকারে কর্তৃত্ব করে থাকে। অতঃপর এ শক্তির জোরে তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। তারা ইচ্ছামত যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ইচ্ছামত দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধায়, আবার ইচ্ছামত যে কোন সময় সন্ধি স্থাপন করায়। নিজেদের অর্থলিপ্সার দৃষ্টিতে যে জিনিসকে বাঞ্ছনীয় মনে করে তার প্রচলন বাড়ায় ও বিকাশ সাধন করে। আবার যেটিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে তার বিকাশ লাভের সকল পথই বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মচর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেশের ও জাতির সমুদয় অর্থ তাদের ভৃত্যে পরিণত হয়েছে।"[৪]

তিনি আরও লিখেছেন, "এ মহা বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চস্বরে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে ঃ "একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে ধনের এ বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।"[৫]

সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদুর প্রসারী। সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মবিশারদগণ সুদের অশুভ ফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনায় দেখা যায় যে, সুদের অনিষ্ট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এর ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক আঘাত হানে। সুদের কুফলগুলো নিম্নলিখিত চারটি শিরোনামে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে :

- নৈতিক ও সামাজিক কুফল;
- অর্থনৈতিক কুফল;
- রাজনৈতিক কুফল ও
- আন্তর্জাতিক কুফল।

---

[৪] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৮২।

[৫] ইবিদ, পৃঃ ৮২।

www.icsbook.info

প্রথম অধ্যায়

সুদের নৈতিক ও সামাজিক কুফল

অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদের যে সব বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করেছেন সেগুলো নিম্নরূপে পেশ করা যেতে পারে ঃ

১. সুদ লোভ ও কৃপণতা সৃষ্টি করে

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) লিখেছেন, "সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র মানসিক কর্মকাণ্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে।"[১] মধ্যযুগের সংস্কার আন্দোলনের নেতা লুথার এবং ঝিংগল মানুষের দুর্বলতার অজুহাত দেখিয়েই সুদকে সমর্থন করেছেন।[২] এ সম্পর্কে ব্যাকন তাঁর বক্তব্যে প্রকৃত সত্য কথাটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "যেহেতু প্রয়োজনের তাকিদেই মানুষ অর্থ ধার দিতে ও নিতে বাধ্য এবং যেহেতু মানুষের হৃদয় এত শক্ত যে, কোন বিনিময় ছাড়া মানুষ ধার দেয় না, সেহেতু সুদের অনুমতি দেওয়া উচিত।"[৩] সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পাবার লোভ মানুষের বিচার-বিবেচনা, আচার-আচরণ, আবেগ-অনুভূতি, এমনকি, বিবেককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা সুদ খায়, তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্য জরুরী ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ী নিজের আপদকালে সুদ দিতে ব্যর্থ হয় বলে দেউলিয়া হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়।

এক কথায় সুদী সমাজে সুদই যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। যারা সুদ দিতে সক্ষম তাদের জন্য মহাজন এবং মহাজনদের দ্বারা গঠিত ব্যাংকগুলো ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু যারা সুদ দিতে অক্ষম তাদের পক্ষে ঋণ

---

[১] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৫৫।

[২] ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, *ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট*, পৃঃ ৮।

[৩] ব্যাকন, *ডিসকোর্স অন ইউসারী* ।

www.icsbook.info

পাওয়া তো দূরের কথা, মৌখিক সহানুভূতিটুকুও দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের (Lender) মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।"[৪] আফজালুর রহমান বলেছেন, "It inclucates habit of miserliness, selfishness, cruelty, love of money, greed for accumulation of wealth etc. among individuals. It spreads class-struggle and class-hatred among people and checks the growth of ideals of mutual help and co-operation."[৫] "এটা (সুদ) মানুষের মধ্যে কৃপণতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, অর্থগধ্নুতা, সম্পদের মোহ ইত্যাদি ঘৃণ্য অভ্যাস গড়ে তোলে; সমাজে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দেয় এবং পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ন্যায় মহৎ গুণাবলীর বিকাশ ও উৎকর্ষকে বাধাগ্রস্ত করে।"

২. সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। ঋণগ্রহীতারা দিনরাত পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করে তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্য দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ঋণের দায়ে তাদের ভিটেমাটি এমনকি, স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্যন্ত মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। এতে সমাজে সাধারণভাবে সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ-আপদ ও সংকটকে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তাদের অমানবিক আচরণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুদখোরদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধু ভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে।

শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'- এ অঙ্কিত 'শাইলক'-এর চরিত্রে মধ্যযুগ এবং সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকালে সুদখোর মহাজনদের রক্তশোষক চেহারা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি মহাজনদের বিরুদ্ধে সমাজে সৃষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ এ সময়ে সাধারণ মানুষ সুদখোর মহাজনদের রক্তশোষক পিশাচ হিসেবে গণ্য করত। এরা বাহ্যতঃ সামাজিক ও শিল্পখাতে কিছু পুঁজি সরবরাহ করত এবং পরে এর সর্বশেষ জীবনীশক্তিটুকু নিঃশেষে শোষণ করে নিত। এই যুগে মহাজনদের নিষ্ঠুর খপ্পরে পড়ুক আর নাই পড়ুক, সকল লোকই এদের ভয় ও ঘৃণা করত। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী বলেছেনঃ "The money-lender continued to be feared and detested by all people in or out of their clutches."[৬]

---

৪. ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৪৮।
৫. আফজালুর রহমান, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১২৭।
৬. ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১২৬।

www.icsbook.info

আধুনিক কালে মহাজনদের স্থান ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান দখল করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও শ্রমজীবী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর মহাজনী সুদের শোষণ বিশ্বের ধনী-দরিদ্র সব দেশেই কম-বেশি বর্তমান রয়েছে। এমনকি, বৃটেন, আমেরিকা ও জার্মানীর মত দেশে এখনও মানুষ মহাজনদের খপ্পর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এদিকে সুদী ব্যাংকের বিরুদ্ধেও ইতোমধ্যেই ঘৃণা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে এবং এসব ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করার দাবী করা হচ্ছে।

এ দাবী ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করছে এবং বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ এর পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করছেন। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে কোন কোন দেশে কিছু কিছু পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে।

এছাড়া, বিগত ৩/৪ দশক থেকে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে; ক্রমশঃ পাশ্চাত্য দেশেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহেও সুদ ও সুদখোর পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ রয়েছে। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের বিলোপ সাধন করা হয়েছিল, যদিও পরে সে সিদ্ধান্ত তারা বহাল রাখতে পারেনি।

উল্লিখিত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুদ সমাজে সুদখোর মহাজন, পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। পুঁজিপতিদের স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থলিপ্সার ফলে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এমন এমন রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ বেছে নেয় যার ফলে পুঁজিপতিদের মান-সম্মান ও জীবনের সাথে সাথে তাদের সুদী সম্পদও ধ্বংস হয় ব্যাপকভাবে।

৩. সুদ নৈতিক অবক্ষয় সাধন করে

সুদী সমাজে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনের কর্মচারিগণ সর্বদা মহাজনদের চাপের মুখে থাকে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনটুকু মহাজনকে দিয়ে দেওয়ার পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা ক্রমে তাদের নৈতিক চরিত্রের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদেরকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়।

এছাড়া অর্থের অভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দিতে পারে না। ফলে এসব ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষার অভাবে অমানুষ এবং কুমানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। এতে সমাজে অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

তদুপরি সুদী সমাজে সাধারণভাবে বিনিয়োগকারীগণ পুঁজির সুদ পরিশোধ করার পর লাভ পাবার আশায় কেবল ঐসব খাতে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়, যেখানে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। উক্ত বিনিয়োগের দ্বারা সমাজের কতটুকু ভাল বা মন্দ হবে এ বিবেচনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে মাদকদ্রব্য, জুয়া, অশ্লীল ও চরিত্র

www.icsbook.info

ধ্বংসকারী ছায়াছবি, পর্নো পত্রিকা, নারী ব্যবসা ইত্যাদি নৈতিকতা বিধ্বংসী খাতে অর্থ বিনিয়োগ বেশি হয়; আর এর স্বাভাবিক পরিণতিতে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। এমনকি, কখনও কখনও স্বাভাবিক নৈতিকতাবোধটুকুও লোপ পায় বা এর বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়।

৪. সুদ একটি নিদারুণ জুলুম

এটি হচ্ছে সুদের সামাজিক কুফলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুতঃ সুদী ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানের পূর্বেই সুদের হার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অতঃপর নির্ধারিত সময় শেষে ঋণগৃহীতাকে অবশ্যই উক্ত সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার লাভ-লোকসানের বিষয় আদৌ বিবেচনা করা হয় না। ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ খাটিয়ে বিপুল লাভ করলেও সে ঋণদাতাকে পূর্বনির্ধারিত সুদই কেবল পরিশোধ করে; তার অতিরিক্ত কিছু সে দেয় না। এতে ঋণদাতাকে ঠকানো হয়। আবার ঋণের অর্থ খাটিয়ে ঋণগ্রহীতার বিপুল লোকসান হলে, এমনকি, তার পুঁজি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলে অথবা অন্য কোন কাজে সাকল্য অর্থ ব্যয় করে ফেললেও তার নিকট থেকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুদ অবশ্যই আদায় করা হয়। ঋণগ্রহীতার পক্ষে আসল অর্থ যোগাড় করাই যেখানে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়, সেখানে আবার এই সুদের অর্থ প্রদানে তাকে বাধ্য করা একটি নিষ্ঠুর জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। একপক্ষের মূলধনের সাকল্য ক্ষতি সত্ত্বেও অন্যপক্ষের নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয়ের এ ব্যবস্থার পেছনে কোন যুক্তি নেই। কোন কোন ঋণদাতা অবশ্য এ দাবী করে থাকে যে, সে যে অর্থ ধার দিয়েছে, তা নিজে খাটালে তার লাভ হতো। ঋণগ্রহীতাকে ধার দেওয়ার ফলে ঋণদাতা তার সেই সম্ভাব্য লাভ থেকে বঞ্চিত হলো। সুতরাং ঋণগ্রহীতাকে ঋণদাতার সে ক্ষতি পূরণ করা উচিত। তাই সে সুদ দাবী করতে পারে।

কিন্তু এখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ঋণদাতা নিজে অর্থ খাটালে লাভ পেত— এ কথাটাই সত্য নয়। আসলে সে লাভ পেতেও পারে অথবা তার লোকসানও হতে পারে। যদি তার লোকসান হয়, তাহলে এ লোকসানের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে; বরং এক্ষেত্রে তার শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করার জন্যও সে কিছুই পাবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, এই অর্থ অন্য কেউ খাটিয়ে লোকসান দিলে, তার কোন অংশই ঋণদাতা বহন করতে রাজি হয় না; বরং পূর্বনির্ধারিত সুদসহ সাকল্য আসল আদায় করে ছাড়ে। অথচ অর্থ ঋণ দেওয়ার পর সে এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা-ভাবনা, শ্রম ও সময় কিছুই ব্যয় করেনি। তবু তার মুনাফা হলো নিশ্চিত। অপরদিকে যে ঋণগ্রহীতা তার শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করল, সে তার শ্রম ও সময় হারাবার সাথে সাথে যে মুনাফা হয়নি তাও পরিশোধ করতে বাধ্য হবে, একে আর যাই হোক, মানবিক ইনসাফ বলা যেতে পারে না।

www.icsbook.info

৫. সুদ ঋণের ভারে জর্জরিত করে

সুদী সমাজে সুদ ছাড়া ঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জরুরী প্রয়োজন, বিপদ-আপদ ও দুর্বিপাকের চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কার্ল মার্কস যথার্থই বলেছেন, "The borrower, has no occasion to borrow as a producer. When he does any borrowing of money he does it for securing personal necessities."[৭] "ঋণগ্রহীতাগণ কখনও উৎপাদনকারী হিসেবে ঋণগ্রহণ করার সুযোগ পায় না; তারা যখনই ঋণ নেয়, তখনই ব্যক্তিগত অভাব পূরণের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়।" এই অবস্থায় ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় না; বরং এ অবস্থা সুদখোরদের মুষ্টিকে আরও শক্ত করে। স্বল্প সময়েই সুদে-আসলে ঋণের বোঝা বিরাট হয়ে যায় এবং তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অনেক ঋণগ্রহীতা তাদের শেষ সম্বল ভিটেমাটিটুকু দিয়েও ঋণের বোঝা থেকে রেহাই পায় না। কখনও কখনও বংশানুক্রমে ঋণের বোঝা চলতে থাকে। স্বল্প আয়ের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সামান্য পয়সা রোজগার করে, তার প্রায় সবটাই চলে যায় মহাজনদের সিন্দুকে। অতঃপর দু'বেলা পেটপুরে আহার করার মত অর্থও তাদের থাকে না। তারা অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়।

৬. সুদ জীবনীশক্তির ক্ষয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস করে

ঋণের ভারে জর্জরিত বিরাট এক জনগোষ্ঠী সর্বদাই ঋণদাতাদের চাপের মুখে নিদারুণ পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের জীবনীশক্তি ঘুণে খাওয়ার ন্যায় ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে। তাদের কর্ম-ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাদের নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এবং জাতীয় উৎপাদনকে নিম্নমুখী করে দেয়।

[৭] কার্ল মার্ক্স, *দি ক্যাপিটাল*।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

আজকের যুগে দুনিয়াব্যাপী প্রচলিত সুদ মাঝে মাঝেই বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড আঘাত হেনে অর্থনীতিকে বিকল ও লণ্ড-ভণ্ড করে দিচ্ছে। সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন থেকে শুরু করে বিনিয়োগ, উৎপাদন, বাজার-বিনিময়-বরাদ্দ, বণ্টন ও ভোগ তথা অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক, ভয়াবহ ও মারাত্মক। নিচে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও স্থিতিশীলতার ওপর সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হচ্ছে।

ক) উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব

উৎপাদন করতে হলে প্রয়োজন বিনিয়োগ, বিনিয়োগ করতে হলে দরকার মূলধন; আর মূলধন আসে সঞ্চয় থেকে। সুতরাং উৎপাদনের ওপর সুদের প্রভাব আলোচনা করতে হলে প্রথমে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন এবং পরে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ওপর সুদের প্রভাব আলোচনা করা দরকার।

১. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের ওপর

i) সুদ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনকে পিছিয়ে রাখে

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন, সুদের হার বেশি হলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন বেশি হয়; অপরদিকে সুদের হার কমলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কম হয়। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথের এ কথা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ "he has been proved a false prophet."

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিগত দুই-আড়াই শতক ধরে সুদের হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে সঞ্চয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে আমেরিকায় মাত্র ১% সুদের হারে সঞ্চয় এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উচ্চতর সুদের হার থাকাকালে তা কখনও সম্ভব হয়নি।[১]

অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন যে, অনেক মানুষ সঞ্চয় করে, কিন্তু সেই সঞ্চিত অর্থ তারা সুদে খাটায় না। আবার সমাজে এমন লোক আছে যারা সুদে অর্থ খাটায় কিন্তু সে অর্থ তারা পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে যার সাথে সুদের হারের সম্পর্ক নেই। এছাড়া, আধুনিক সমাজে পুঁজির এক বিরাট অংশ আসে ধনীদের সঞ্চয় থেকে, যা তাদের আর্থিক প্রাচুর্যের ফল; এর ওপর সুদের কোন প্রভাব নেই। তদুপরি

---

[১] ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩৭।

www.icsbook.info

করপোরেশন, ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে। কিন্তু এসব সঞ্চয়ের পরিমাণ সুদের হারের প্রভাবে নিরূপিত হয় না। সর্বোপরি মানুষ অধিক সুদ পাবার জন্য সঞ্চয় করে না; বরং তারা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের চিন্তায়, অজানা বিপদ-আপদ মুকাবিলার জন্য, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি কারণে। সুদ না থাকলেও এসব কারণে মানুষ সঞ্চয় করবেই। অর্থনীতিবিদ প্যারেটো তাই বলেছেন, "সঞ্চয় সুদের হারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না; বরং সুদের হারকে যদি শূন্যেও নামিয়ে আনা হয়, তাহলেও সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।[২]

নিওক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ জে এম. কীনস প্রমাণ পেয়েছেন সুদের হারের ওপর নয়, বরং সঞ্চয় নির্ভর করে আয়ের ওপর। আয় বাড়লে মানুষ সঞ্চয় বেশি করে; আর আয় কমলে সঞ্চয় কম করে। কীনস দেখিয়েছেন যে, কোন সমাজে কোন নির্দিষ্ট আয়ের প্রেক্ষিতে (আয় স্থির রেখে) সঞ্চয়কে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যদি সুদের হার বাড়ানো হয়, তাহলে তা সঞ্চয়কে বাড়তে তো দেয়ই না, বরং নানাভাবে সঞ্চয়কে আরও কমিয়ে দেয়।

প্রথমতঃ সুদের হার বেড়েছে, এজন্য বেশি সুদ পাওয়ার লোভে কেউ যদি পূর্বের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করে, তাহলে তাকে ভোগের জন্য পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। ফলে পূর্বে বিক্রেতাগণ যে পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করত এখন আর সে পরিমাণ বিক্রি হবে না; বরং উক্ত বর্ধিত সঞ্চয়ের মূল্যের সমপরিমাণ সামগ্রী অবিক্রীত থেকে যাবে। সুতরাং বিক্রেতাদের আয় এবং সঞ্চয়ও সমপরিমাণে কমে যাবে। একজনে সঞ্চয় বৃদ্ধি করলে তা অন্য কারও আয় ও সঞ্চয় সমপরিমাণে কমিয়ে দেবে। সুতরাং মোট আয়ের পরিমাণ স্থির থাকা অবস্থায় সুদের হার বাড়ালে কারও কারও ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়লেও সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়বে না।

তাছাড়া আয় স্থির থাকা অবস্থায় সুদের হার বৃদ্ধি করার দরুন দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাবে। ফলে আগের সমান পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে হলে লোকদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। অথবা তাদেরকে পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতে হবে। যেহেতু লোকদের আয় বাড়েনি সেহেতু ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হলে তা সঞ্চয় থেকে আনতে হবে এবং সঞ্চয় সমপরিমাণে কমে যাবে। আর যদি পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কোন কোন বিক্রেতার বিক্রয় পূর্বের চেয়ে কমে যাবে। ফলে তাদের আয় কম হবে এবং সঞ্চয়ও কমে যাবে। সুতরাং আয় অপরিবর্তিত রেখে সুদের হার বাড়লে আসলে সঞ্চয় পূর্বের অবস্থাতেও থাকবে না, বরং তার চেয়ে কমে যাবে।

---

[২] গাইড এন্ড রিস্ট, *এ হিস্টোরী অব ইকোনমিক ডকট্রিনস*, পৃঃ ৭৩২।

www.icsbook.info

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা সহজ হবে। ধরা যাক, কোন একটি সমাজে সকল মানুষের মোট আয় ১০০/- টাকা। আরও মনে করা যাক যে, এই সমাজের সকল ব্যক্তি মিলে ২০.০০ টাকা সঞ্চয় করে এবং ৮০.০০ টাকা ভোগের জন্য ব্যয় করে। আর এখানে প্রচলিত বাজার সুদের হার ৫%। এই অবস্থায় মনে করা যাক, আয় স্থির রেখে সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে ১০% হলো; এতে কতিপয় লোক প্রলুব্ধ হয়ে বর্ধিত হারে সুদ পাবার আশায় তাদের পূর্বেকার সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। ধরা যাক বর্ধিত এই সঞ্চয় ৫.০০ টাকা। যেহেতু সমাজের মোট আয় বাড়েনি এবং যেহেতু সঞ্চয় ২০/- টাকা থেকে ২৫/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে, সেহেতু সমাজে ভোগ্য ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৭৫/- টাকায় দাঁড়াবে। সমাজে পণ্যসামগ্রী বিক্রেতাদের ৫/- টাকার পণ্য অবিক্রীত থেকে যাবে। অর্থাৎ তাদের আয় ৫/- টাকা কমে যাবে; ফলে তাদের সঞ্চয়ও সমপরিমাণে হ্রাস পাবে। এভাবে মোট সঞ্চয় আবার ২০/- টাকাতেই নেমে আসবে। কিন্তু ঘটনা এই পর্যন্তই সীমিত থাকবে তা নয়; বরং সঞ্চয় আসলে কমে যাবে।

কারণ, সুদের হার ৫% বাড়ার ফলে দ্রব্যমূল্য ৫% বৃদ্ধি পাবে, কারণ সুদ উৎপাদন খরচ হিসেবে দামের সাথে যুক্ত হয়। ফলে পূর্বে ৮০/- টাকায় যে পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী কেনা যেত এখন সেই পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে ৫% টাকা বেশি অর্থাৎ মোট ৮৪/- টাকা লাগবে। ভোক্তারা যদি পূর্বের সমপরিমাণ ভোগ্য পণ্য ক্রয় করে, তাহলে সঞ্চয় ৪/- টাকা কমে ১৬ টাকায় দাঁড়াবে। আর ভোক্তাগণ যদি তাদের সঞ্চয় পূর্বের সমান স্থির রেখে চার টাকার ভোগ্য পণ্য ক্রয় কমিয়ে দেয়, তাহলে পণ্য বিক্রেতাদের আয় চার টাকা হ্রাস পাবে, যা তাদের সঞ্চয় ৪/- কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ মোট সঞ্চয় ১৬/- টাকায় নেমে আসবে।

বিনিয়োগের দিক থেকে দেখলেও একই ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। বিনিয়োগকারীগণ কম সুদের হারে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করত সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই পরিমাণ বিনিয়োগ করবে না। কারণ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতাকে বর্ধিত সুদের হারের সমান রাখতে হলে বিনিয়োগ না কমিয়ে উপায় নেই। (পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।) দেখা যাচ্ছে, সুদের হার বৃদ্ধি করা হলে তা বিনিয়োগকে কমিয়ে দেয়; এতে উৎপাদন ও আয় হ্রাস পায় এবং সঞ্চয়ও কমে যায়।

প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আয় স্থির রেখে সুদের হার বাড়ানো হলে তার প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়; ফলে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় পূর্বের চেয়ে কমে যায়। এ প্রসঙ্গে কীনস লিখেছেন, "প্রকৃত সঞ্চয়ের ওপর সুদের হারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাধারণভাবে যা মনে করা হয় সুদের হার সঞ্চয়কে সেদিকে পরিচালিত করে না, বরং তার বিপরীত দিকেই সঞ্চয়কে নিয়ে যায়। উচ্চতর সুদের হার প্রকৃত সঞ্চয়কে অবশ্যই কমিয়ে দেয়। কারণ, মোট সঞ্চয় নিয়ন্ত্রিত হয় মোট বিনিয়োগের দ্বারা; সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পায়; সুতরাং সুদ বৃদ্ধি পেলে তা অবশ্যই আয়কে কমিয়ে দেয়। এতে বিনিয়োগ যতটা কমে সঞ্চয় ততটাই হ্রাস পায়। যেহেতু আয় কমে যায় সেহেতু

www.icsbook.info

একথা অবশ্যই সত্য যে, সুদের হার বাড়লে ভোগের হারও কমে যায়। কিন্তু এর ফলে সঞ্চয়ের জন্য বেশি অর্থ থেকে যায়, ব্যাপার আসলে তা নয়; বরং সঞ্চয় ও ভোগ্য ব্যয় উভয়টাই কমে যায়।"[৩]

জার্মান অর্থনীতিবিদ সিলভিও গ্যাসেলের সুদ তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে কীনস লিখেছেন, "সুদের হার প্রকৃত মূলধন গঠনের ওপর সীমারেখা টেনে দেয়।[৪] তিনি আবার বলেছেন, "আর্থিক সুদের হার প্রকৃত পুঁজি গঠনে (Growth of real capital) বাধা সৃষ্টি করে।"[৫] কীনস দেখিয়েছেন যে, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন সুদের হারের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং সঞ্চয় নির্ভর করে বিনিয়োগ হারের ওপর, আর বিনিয়োগ নির্ভর করে ভোগের ওপর (কার্যকর চাহিদার ওপর)। অপরদিকে ভোগ (কার্যকর চাহিদা) আবার নির্ভর করে আয়ের ওপর, যা আবার বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সহজ কথায়, বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বেশি হয়, মুনাফাও বেড়ে যায় এবং সঞ্চয় ও মূলধনও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিনিয়োগ কম হলে উৎপাদন কমে যায়, মুনাফা ও আয় হ্রাস পায় এবং সঞ্চয় ও মূলধন গঠন কম হয়। সুতরাং বিনিয়োগ যত বেশি হয় মূলধন তত বৃদ্ধি পায়। আর বিনিয়োগ পূর্ণ (full employment) হলে মূলধন গঠনও হয় সর্বাধিক।

কিন্তু বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে উৎপাদিত পণ্যের অব্যাহত কার্যকর চাহিদা (effective demand) থাকা অপরিহার্য। আর পণ্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা থাকতে হলে ক্রেতা তথা ভোক্তাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ বা ক্রয়-ক্ষমতা থাকতে হবে।

---

৩. জে, এম, কীনস, পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১১০-১১১| "The influence of changes in the rate of interest on the amount actually saved is of paramount importance, but is in the opposite direction to that usually supposed. For even if the attraction of the larger future income to be earned from a higher rate of interest has the effect of diminishing the prosperity to consume, nevertheless we can be certain that a rise in the rate of interest will have the effect of reducing the amount actually saved. For aggregate saving is governed by aggregate investment; a rise in the rate of interest.... will diminish investment; hence a rise in the rate of interest must have the effect of reducing incomes to a level at which saving is decreased in the same measure as investment. Since incomes will decrease, ... it is indeed true that, when the rate of interest rises, the rate of consumption will decrease. But this does not mean that there will be a wider margin for saving. On the contrary, saving and spending will both decrease."

৪. জে. এম. কীনস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৫ ঃ "that it is the rate of interest which sets a limit to the rate of growth of real capital."

৫. উপরোক্ত, পৃঃ ৩৫৭ ঃ "that the growth of real capital is held back by the money-rate of interest, and that if this brake were removed the growth of real capital would be, in the modern world, so rapid that a zero money-rate of interest would probably be justified, not indeed forthwith, but within a comparatively short period of time. Thus the prime necessity is to reduce the money-rate of interest."

www.icsbook.info

এক্ষেত্রে দেশের কতিপয় লোকের হাতে বিপুল অর্থ-সম্পদ থাকলে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হবে না। তাই সম্পদ দেশের সকল লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে; যত বেশি লোকের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা থাকবে পণ্য-সামগ্রীর কার্যকর চাহিদাও তত বেশি হবে। অপরপক্ষে ক্রয়-ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা যত কম হবে চাহিদাও তত কম হবে। এক কথায় অভাব সকল লোকেরই আছে, আর এ অভাব পূরণ করার মত ক্রয়-ক্ষমতাও সকলেরই থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য দরকার সকল লোকের পরিমিত আয়ের ব্যবস্থা ও পূর্ণ কর্মসংস্থান।

পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে সকল কর্মক্ষম লোক উপযুক্ত কাজ এবং আয় পায়; তাদের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়। অপরদিকে বিনিয়োগকারীদের উৎপাদিত সকল পণ্য-সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায়। তারা উৎসাহিত হয় এবং আরও অধিক বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে আবার বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, নতুন কর্মসংস্থান ও ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি হয়, চাহিদা সম্প্রসারিত হয় এবং বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পায় যা আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। এভাবে ধাপে ধাপে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়; সমাজ উন্নত থেকে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সুদ চালু থাকলে তা দ্রব্যমূল্যের সাথে যুক্ত হয়ে ভোক্তা জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা শোষণ করে এনে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়। ভোক্তাদের ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পায় যা চাহিদাকে সংকুচিত করে দেয় এবং বিনিয়োগ হ্রাস করতে বাধ্য করে। যেহেতু বিনিয়োগ হ্রাস পায় সেহেতু জনগণের আয় ও সঞ্চয় কমে যায়।

কীনস লিখেছেন, "সুতরাং আসল কথা হলো মোট সঞ্চয় ও মোট ব্যয়ের হার সতর্কতা, দূরদৃষ্টি, হিসাব-নিকাশ, উন্নতি, স্বাধীনতা, উদ্যোগ, গৌরব বা লোভের ওপর নির্ভর করে না; এক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যেরও কোন ভূমিকা নেই। বস্তুতঃ পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার বিচারে সুদ বিনিয়োগের জন্য কতটা অনুকূল তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। সুদের হারকে যদি অব্যাহতভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে রাখা সম্ভব হয়, তাহলে পুণ্য আবার এর কর্তৃত্ব বহাল করবে। মূলধন গঠনের হার ভোগ প্রবণতার দুর্বলতার ওপর নির্ভরশীল হবে।"[৬]

আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, কার্যকর সঞ্চয়ের পরিমাণ অবশ্যই বিনিয়োগের আয়তন দ্বারা নিরূপিত হয়; আর বিনিয়োগের আয়তন সম্প্রসারিত হয় নিম্ন সুদের দ্বারা।" তাই কীনস সুদের হার কমিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, "সুতরাং

---

৬. উপরোক্ত, পৃঃ ১১১-১১২ : "Thus, after all, the actual rates of aggregate saving and spending do not depend on Precaution, Foresight, Calculation, Improvement, Independence, Enterprise, Pride or Avarice. Virtue and Vice Play no part. It all depends on how far the rate of interest is favourable to investment, after taking account of the marginal efficiency of capital. No, this is an overstatement. If the rate of interest were so governed as to maintain continuous full employment, virtue would resume her sway: the rate of capital accumulation would depend on the weakness of the propensity to consume."

www.icsbook.info

এটাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ। এ সুযোগে আমরা পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার তালিকায় যেখানে পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর অবস্থিত সুদের হার সে পর্যায়ে কমিয়ে আনতে পারি।"[৭]

কীনসের পরে এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকায় অর্থ ও ঋণ বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। কমিশন এর রিপোর্টে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভোক্তার ব্যয় নির্ধারণে অন্যান্য কারণের তুলনায় সুদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।[৮]

বৃটেনে আর্থিক পদ্ধতি স্টাডি করার জন্য নিয়োজিত র‍্যাডক্লীফ কমিটি এর রিপোর্টে বলেন যে, অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে সুদের হার বাড়লেও তা ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি করে না।[৯]

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক কারবারে নিয়োজিত পুঁজির এক বিরাট অংশ ব্যবসায়িগণ নিজেরাই যোগান দিয়ে থাকেন। কারবারে যে লাভ হয়, তার অধিকাংশই ব্যবসায় পুনঃবিনিয়োগ করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আমেরিকায় কারবারে অর্জিত মুনাফার ৭০% সঞ্চিত ও পুনঃবিনিয়োজিত হয়। অপরদিকে ব্যক্তিগত আয় থেকে সঞ্চয়ের হার হচ্ছে আয়ের মাত্র ৫%। অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।[১০]

এছাড়া, কোম্পানীগুলো তাদের কল-কব্জার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য অবচয় বাবদ যে অর্থ প্রতিবছর কেটে রাখে তাকেও পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। আমেরিকায় কারবার প্রতিষ্ঠানসমূহের চার ভাগের তিন ভাগ পুঁজি তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আসে।[১১] ইংল্যান্ডেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। র‍্যাডক্লীফ কমিটি তার রিপোর্টে আরও উল্লেখ করেছেন, শিল্প সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োজিত মূলধনের প্রধান এবং বৃহৎ উৎস হচ্ছে এ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত মুনাফা এবং এর চেয়েও বৃহত্তর উৎস হচ্ছে কল-কব্জার ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ সংরক্ষিত অবচয় তহবিল।[১২] বস্তুতঃ পুঁজি গঠনে কর্পোরেশনসমূহের সঞ্চয়ের

---

৭. উপরোক্ত, পৃঃ ৩৭৫ ঃ "But we have shown that the extent of effective saving is necessarily determined by the scale of investment and that the scale of investment is promoted by a low rate of interest..... Thus it is to our best advantage to reduce the rate of interest to the point relatively to the schedule of the marginal efficiency of capital at which there is full employment."

৮. কমিশন অন মানি এন্ড ক্রেডিট (সি এম সি), *ইম্প্যাক্টস অব মনেটারী পলিসি*, প্রেন্টিস হল, ১৯৬৪, পৃঃ ৪১।

৯. *র‍্যাডক্লীফ কমিটি রিপোর্ট* : হার মেজেস্ট্রিজ স্টেশনারী অফিস, লন্ডন, ১৯৫৯।

১০. এন, ক্যালডোর, *ক্যাপিটাল একুমুলেশন এন্ড ইকোনমিক গ্রোথ ইন দি থিওরী অব ক্যাপিটাল*, এডিটেড বাই ডি, সি, হ্যাগু, ম্যাকমিলান, লন্ডন, ১৯৫৫, পৃঃ ১৯৭।

১১. সি এম সি, পূর্বোল্লেখিত পৃঃ ৬৫৫।

১২. র‍্যাডক্লীফ কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ৮০।

www.icsbook.info

ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০-এই তিন বছরে অবণ্টিত মুনাফা এবং অবচয় বাবদ সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ছিল প্রদত্ত ডিভিডেন্ড এর পাঁচ গুণ।[১৩] ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ-আর্থিক কারবার প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনসমূহের মোট মূলধন ব্যয় ছিল $২৯৯.১ বিলিয়ন ডলার। এই ব্যয়ের মধ্যে $২৫৯.৫ বিলিয়ন ডলার বা ৮৭% এসেছিল এসব কারবারের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে (অবণ্টিত মুনাফা, অবচয় এবং অন্যান্য); $১১.৪ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছিল নতুন শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে এবং বাকি মাত্র $২৮.২ বিলিয়ন ডলার ছিল ঋণ।[১৪]

উল্লেখ্য যে, এসব কারবারের সঞ্চয়ী মূলধনের ওপর সুদের কোন প্রভাব নেই।[১৫] আর একথাও ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, সুদ বিলোপ করা হলে এসব কারবার সঞ্চয় করা বন্ধ করে দেবে। ড. এম. উমর চাপরা তাই বলেছেন যে, সুদ বিলোপ করা হলে এসব কারবারে সঞ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে-এরূপ ধারণা কেবল তখনই সমর্থন করা যায়, যখন কেউ সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারবে যে, যাবতীয় অবিনিয়োজিত সঞ্চয় চুরি হয়ে গেছে এবং একক মালিকানাধীন, অংশীদারী এবং যৌথ মূলধনী কারবার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাকুল্য বিনিয়োগেই লোকসান হয়েছে। এরূপ হওয়া কেবল সুদূর পরাহতই নয়, অসম্ভবও।[১৬]

ড. এম. উমর চাপরা দেখিয়েছেন যে, সুদ বিলোপ করা হলে পুঁজি গঠন হ্রাস পাবে–একথা সত্য নয়; বরং উচ্চহারে হোক, আর নিম্নহারে হোক, সুদ বহাল থাকলেই পুঁজি গঠন বাধাপ্রাপ্ত হবে। তিনি বলেছেন যে, সুদের হার পূর্বনির্ধারিত হলেও তা প্রায়ই ব্যাপকভাবে উঠা-নামা করে এবং মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতিকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে সম্পদ বণ্টন ও বরাদ্দে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অবিচার বয়ে আনে, যার সর্বশেষ পরিণতি স্বরূপ পুঁজি গঠনের গতি মন্থর ও শ্লথ হয়ে আসে। তিনি দেখিয়েছেন, সুদ+লাভ = মোট আয়। সুতরাং সুদের হার বেশি হলে সুদ দেওয়ার পর উদ্যোক্তার লাভ কম থাকে বা তাকে লোকসান বহন করতে হয়। অন্যদিকে সুদের হার কম হলে, সঞ্চয়কারীদের অংশ কমে যায় এবং উদ্যোক্তারা বেশি লাভ পায়। এ উভয় অবস্থাই পুঁজি গঠনের পক্ষে অনুপযোগী।[১৭]

বস্তুতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উচ্চ সুদের হার মূলধন গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ ছিল মূলধন থেকে প্রাপ্ত করপূর্ব

---

১৩. *ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন*, জুন ১৯৮১, টেবল ১.৪৯।

১৪. ফেডারেল রিজার্ভ, *ফ্লো অব ফান্ডস IV-৮০*, ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, পৃঃ ৯।

১৫. সিএমসি, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৬৭৩-৬৭৪।

১৬. চাপরা, এম, উমর: *টুওয়ার্ডস এ জাস্ট মনিটারী সিস্টেম*, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫, ইউ, কে, পৃঃ ১১৪।

১৭. উপরোক্ত, পৃঃ ১১৫।

www.icsbook.info

আয়ের এক-তৃতীয়াংশ। ষাটের দশকের তুলনায় এই অংশ ছিল তিনগুণ এবং পঞ্চাশের দশকের তুলনায় ছয়গুণ।[১৮] উচ্চ সুদ দেওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেশনগুলোর লাভের অংক কমে যায় এবং তাদের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং মোট অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকি-বহনকারী মূলধনের (equity) অনুপাতও কমে আসে। যুক্তরাষ্ট্রে অ-আর্থিক কর্পোরেশনগুলোর মোট অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল শেয়ার মূলধন; কিন্তু ১৯৭৮ সালে তা কমে অর্ধেক হয়ে যায়।[১৯] কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটেছে তা নয়; বরং বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম জার্মানীতেও মোট পুঁজির ক্ষেত্রে শেয়ার মূলধনের অংশ ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে।[২০] পুঁজি গঠনের এই নিম্নগতির কারণ হচ্ছে উচ্চ হারের সুদ।[২১]

যুক্তরাষ্ট্রে মূলধন গঠনের এই নিম্নহার একটি দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে, যা প্রকারান্তরে ঋণের ওপর ধার্যকৃত ক্রমবর্ধমান ব্যয় মিটাতে উদ্যোক্তাদের অক্ষম করে তুলেছে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ মুনাফা হ্রাস পেয়েছে এবং মূলধন গঠন আবারও কমে গিয়েছে।[২২]

ড. চাপরা বলেন, এ ব্যাপারে নিম্ন সুদের হারও কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। উচ্চ সুদের হার যেমন উদ্যোক্তাদের দণ্ডিত করে, নিম্ন সুদের হার তেমনি বিভিন্ন প্রকার সুদী বিনিয়োগ পত্রে বিনিয়োগকারী সঞ্চয়ীদের ক্ষতি সাধন করে। বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারীকে নাম মাত্র সুদ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এদের বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে সমাজে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়ে যায়। তাছাড়া নিম্ন সুদের হার সাধারণ মানুষ ও সরকারকে অনুৎপাদনশীল ভোগ্য ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করে, যা মুদ্রাস্ফীতির চাপকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় ঋণ ফেরত দেওয়ার কালে সঞ্চয়ের অনুপাত কমে যায় এবং মূলধনে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। তদুপরি, এটা অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেয় এবং পণ্য-সামগ্রী ও শেয়ার-বাজারে ফটকা প্রবণতার জন্ম দেয়। এরপরও নিম্ন সুদের হার প্রকট শ্রম বিমুখ (Excessively labour saving) বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়ে বেকার সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। সুতরাং পুঁজির মূল্যের বিকৃতি সাধনের (distorting) মাধ্যমে নিম্ন সুদের হার ভোগকে বাড়িয়ে দেয়, সঞ্চয়ের হারকে নিম্নগামী করে, বিনিয়োগের মান হ্রাস করে এবং মূলধনের ঘাটতি সৃষ্টি করে।[২৩]

---

১৮. হারম্যান আই, লাইবলিং: *ইউ, এস, কোরপোরেট প্রফিটেবিলিটি এন্ড ক্যাপিটাল ফরমেশনঃ আর রেইটস অব রিটার্ন সাফিসিয়েন্ট?* নিউইয়র্কঃ পারগামন পলিসি স্টাডিজ, ১৯৮০, পৃঃ ৭৮।

১৯. ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট, *৫২তম বার্ষিক রিপোর্ট*, এপ্রিল ১, ১৯৮১-,মার্চ ৩১, ১৯৮২, পৃঃ ৩।

২০. লাইবলিং, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৪-৫, টেবল ১৩, পৃঃ ১৩৫।

২১. উপরোক্ত, পৃঃ ৭০ এবং ৫।

২২. উপরোক্ত, পৃঃ ৮২।

২৩. চাপরা, এম, উমর: পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

২. বিনিয়োগের ওপর

i) সুদ বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

অর্থনীতিবিদগণ সুদের হারের সাথে বিনিয়োগের বিপরীতধর্মী সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লর্ড কীনসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর "জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি" গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে যায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কম থাকলে মানুষ বেশি ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে মানুষ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়। নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে এ অবস্থা দেখানো হচ্ছে ঃ

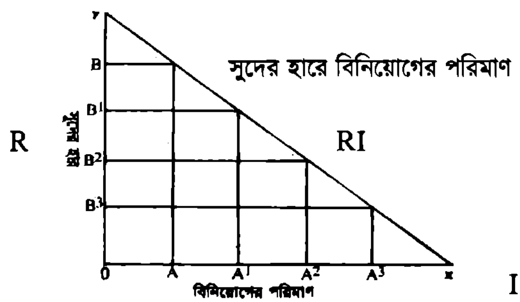

OY রেখায় সুদের হার এবং OX রেখায় বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে সুদের হার যখন সর্বোচ্চ, অর্থাৎ OB, তখন হয় মাত্র OA পরিমাণ। সুদের হার যখন কমে OB^1 হয়, তখন বিনিয়োগ বেড়ে হয় OA^1 পরিমাণ। সুদের হার যখন আরও কমে OB^2 হয়, তখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় OA^2 পরিমাণ। এভাবে সুদের হার আরও কমে যখন OB^3 হয়, তখন বিনিয়োগ হয় OA^3 পরিমাণ, সুদের হার যখন 0 (শূন্য) হয়, তখন বিনিয়োগ হয় পূর্ণ।

লর্ড কীনস দেখিয়েছেন যে, সুদের হার শূন্য হলেই কেবল পূর্ণ বিনিয়োগ হয় এবং দেশের বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। অন্যথায় সুদের হার যত বাড়ে বিনিয়োগ তত কমে যায় এবং বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদও তত বেশি অব্যবহৃত থাকতে বাধ্য হয়। এজন্যই লর্ড কীনস শূন্য সুদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুদের হার যাতে শূন্য হয় সেজন্য তিনি সরকারকে তার আইনী ক্ষমতা (coercive power) প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।[২৪]

২৪. জে, এম, কীনসঃ পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩৫১।

www.icsbook.info

সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বেশি হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কীনস পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার সাথে সুদের হারের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, সেখানেই ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং বিনিয়োগকারীগণ ভারসাম্য বিন্দু পর্যন্তই বিনিয়োগ করে, তার অধিক বিনিয়োগ করে না।[২৫]

সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা

সুদের হার	বিনিয়োগের একক (প্রতিটি ১০০/- টাকা)	পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা বা আয় (টাকায়)	সম্ভাব্য লাভ সুদ প্রদানের পর (টাকায়)	মোট লাভ
২০%	১ম	৪৫.০০	২৫.০০	২৫.০০
২০%	২য়	৩৮.০০	১৮.০০	৪৩.০০
২০%	৩য়	৩০.০০	১০.০০	৫৩.০০
২০%	৪র্থ	২০.০০	০	৫৩.০০
২০%	৫ম	৮.০০	(-) ১২.০০	৪১.০০
২০%	৬ষ্ঠ	.০০	(-) ২০.০০	২১.০০
২০%	৭ম	(-) ৮.০০	(-) ২৮.০০	-৭.০০

বাজারে সুদের হার ২০% ধরে নিয়ে ওপরের ছকটি দেখানো হয়েছে। ছকে দেখা যাচ্ছে যে, একজন উৎপাদনকারী ২০% সুদের হারে ব্যাংক থেকে ১০০.০০ টাকার এক একক পুঁজি ধার নিয়ে বিনিয়োগ করে। সে এই একক থেকে ৪৫.০০ টাকার সমান প্রান্তিক দক্ষতা বা আয় পায়। এতে ব্যাংকের ২০.০০ টাকা সুদ পরিশোধ করার পর তার অতিরিক্ত আয় বা লাভ থাকে ২৫.০০ টাকা। আরও এক একক পুঁজি বিনিয়োগ করলে তার আরও ২৫.০০ টাকা লাভ থাকবে আশা করে সে ১০০.০০ টাকার ২য় একক পুঁজি

---

[২৫] উপরোক্ত।

www.icsbook.info

ধার নিয়ে বিনিয়োগ করল। দেখা যাচ্ছে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return) অনুসারে ২য় একক থেকে তার লাভ হলো ১৮.০০ টাকা। অনুরূপ লাভ পাবার আশায় সে ৩য় একক (আরও ১০০.০০ টাকা) ধার নিয়ে বিনিয়োগ করল। কিন্তু ৩য় এককের প্রান্তিক দক্ষতা কমে গেল এবং সেই একক থেকে সে পেল মাত্র ৩০.০০ টাকা। এতেও সুদ পরিশোধ করার পর তার লাভ থাকল ১০.০০ টাকা। সুতরাং আরও ১০.০০ টাকা পাবার আশায় সে ৪র্থ একক (আরও ১০০.০০) ধার নিয়ে বিনিয়োগ করল। দেখা গেল, এবার সে পেল ২০.০০ টাকা। এই এককের সুদ পরিশোধ করার পর তার লাভ কিছুই থাকল না। অতঃপর সে ৫ম একক বিনিয়োগ করে পায় মাত্র ৮.০০ টাকা। এতে এই এককের সুদ পরিশোধের জন্য তাকে পূর্বের লাভ থেকে ১২.০০ টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। ফলে তার মোট লাভ কমে যায়। সুতরাং ৫ম একক সে বিনিয়োগ করবে না। সে ৪র্থ একক অর্থাৎ যেখানে সুদের হার এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা সমান সে পর্যন্তই বিনিয়োগ সীমিত রাখবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাজার-সুদের হার যদি ৮% বা তার চেয়ে কম হয়, তাহলে সে ৫ম একক বিনিয়োগ করবে। এমনকি, সুদের হার যদি শূন্য হয়, তাহলে সে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে। কারণ এ ক্ষেত্রে তাকে সুদ দিতে হবে না এবং প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হলেও তাকে লোকসান দিতে হবে না বা তার মোট মুনাফা কমে যাবে না। অপরদিকে সুদের হার যদি ৩০% হয়, তাহলে উক্ত বিনিয়োগকারী ৩য় এককের পরে আর বিনিয়োগ করবে না। এভাবে সুদের হার আরও বেশি হলে সে বিনিয়োগ আরও কম করতে বাধ্য হবে।

উপরের উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যখন সুদের হারে সমান হয়, অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সে পর্যন্তই সীমিত থাকে। সুতরাং সুদ থাকলে সে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ সুদহীন অর্থনীতির তুলনায় অবশ্যই কম থাকে; সুদের হার শূন্য হলেই কেবল বিনিয়োগ সর্বাধিক হতে পারে। অপরপক্ষে সুদের হার যত বেশি হবে, বিনিয়োগ তত কম হবে। বস্তুতঃ সুদী অর্থনীতিতে কখনও বিনিয়োগ সর্বাধিক হয় না।

ii) সুদ বিনিয়োগকে অনুৎপাদনশীল ফটকা খাতে ঠেলে দেয়

সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কম হবার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে, সুদ পুঁজিকে অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগের দিকে ঠেলে দেয়। সুদী ব্যবস্থায় সঞ্চয়কারীগণ তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখে অতঃপর ব্যাংক এই অর্থ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। ব্যাংক নির্ধারিত, ঝুঁকিমুক্ত ও নিশ্চিত আয় পাবার আশায় জনগণের গচ্ছিত আমানতের এক বিরাট অংশ সরকারী সিকিউরিটি ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙ্গানো, ফটকামূলক কারবার ইত্যাদি নানাবিধ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। এতে পুঁজির সুদের হার বেড়ে

www.icsbook.info

যায়; সঞ্চয়কারিগণ উৎসাহ বোধ করে এবং অধিকহারে সুদ পাবার লোভে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করে। ব্যাংকের আমানত বেড়ে যায়। ব্যাংক অনুৎপাদনশীল খাতে আরও অর্থ বিনিয়োগ করে। পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরও হ্রাস পায়। বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ আবার কমে যায়; বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়; দ্রব্যমূল্য আরও একদফা বেড়ে যায়।

সুদ না থাকলে নির্ধারিত, নিরাপদ ও নিশ্চিত আয় পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। সঞ্চয়কারিগণ নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা ব্যাংক বা অন্য কোন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অংশীদারী ভিত্তিতে তাদের সঞ্চিত অর্থ শিল্প, বাণিজ্য এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। ব্যাংক ও অন্যান্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের নিজস্ব পুঁজি ও জনগণের গচ্ছিত অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না করে উৎপাদনশীল খাতে খাটাতে বাধ্য হবে। এভাবে সুদী অর্থনীতিতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত হয়, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে সেই সাকুল্য অর্থ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হবে এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিবে। কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং জনগণের আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা বেড়ে যাবে। পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও বিক্রি বেশি হবে। উৎপাদনকারীদের মুনাফার অংক বড় হবে। উৎপাদন কাজে নবতর উৎসাহ দেখা দেবে। বস্তুতঃ সুদ না থাকলে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি বেশি হতো এবং মানুষ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ও সুখী বিশ্ব দেখতে পেত।[২৬]

iii) সুদ পুঁজিকে অলস রাখতে প্রলুব্ধ করে

সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হওয়ার এটি আর একটি কারণ। সুদখোর পুঁজিপতি ও ঋণদাতাগণ মনে করে যে, কোন নির্দিষ্ট সুদের হারে ঋণ দেওয়া হলে মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে না এবং ইতোমধ্যে সুদের হার বেড়ে গেলে, সেই ঋণের ওপর অতিরিক্ত হারে সুদও পাওয়া যাবে না। ফলে এ সময়ে তাদের ঠকতে হবে। কারণ ঐ অর্থ হাতে থাকলে তারা তা বর্ধিত সুদের হারে ধার দিয়ে বেশি আয় করতে পারত। এ কারণে ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে সুদের হার বেড়ে গেলে সে সুযোগে অধিক সুদ পাবার লোভে পুঁজিপতিগণ তাদের পুঁজির একটা বিরাট অংশ, কখনও কখনও বৃহত্তর অংশ, অলসভাবে ধরে রাখে। ফলে অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব আরও বেড়ে যায়; বিনিয়োগ আরও কম হয় এবং উৎপাদনও কমে যায়। শ্রমিক ও অন্যান্য উপকরণ বেকার থাকে আর জনগণের চাহিদা থাকে অপূর্ণ। কৃত্রিম অভাব দেখা দেয়। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বেড়ে যায়। অর্থনৈতিক উন্নতির গতি আরও শ্লথ হয়ে আসে।

---

[২৬] আফজালুর রহমানঃ পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১০৬-১০৭।

www.icsbook.info

সুদ না থাকলে পুঁজিপতিগণ মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। আর যখন যেখানে মুনাফা থাকবে তাতেই বিনিয়োগ করবে এবং পুঁজি অলস ধরে রাখলে মোট মুনাফার অংক কমে যাবার আশংকায় পূর্ণ বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন বেড়ে যাবে।

iv) সুদ ঝুঁকিবহুল বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

প্রত্যেক অর্থনীতিতেই এমন কিছু কায়-কারবার থাকে যেগুলোতে বিপুল পরিমাণের পুঁজি দরকার হয়। তাছাড়া, অন্যান্য কারবারের তুলনায় এগুলোতে ঝুঁকিও থাকে বেশি। অত্যধিক ব্যয়সংকুল হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব শিল্প-কারখানা কায়েম করা সম্ভব নয়। তদুপরি সুদী ব্যবস্থায় এসব কারবারের ঝুঁকি গ্রহণ করতে এগিয়ে আসাও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। দেশের সরকারও সুদী ঋণের মাধ্যমে এ ধরনের কারবারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহবোধ করে না।

এসব বড় বড় শিল্প-কারখানায় যে বিপুল অর্থের দরকার হয় তা সুদের ভিত্তিতে ধার নেওয়া হলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ সুদের বোঝা বহন করতে হয়। তাছাড়া, শিল্প স্থাপনের কাজ শুরুর দিন হতে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা পর্যন্ত 'গেসটেশন পিরিয়ড' অর্থাৎ অবকাশ সময় লাগে প্রায় ২ থেকে ৫ বছর। এর মধ্যে সুদের বোঝা বেড়ে এমন আকার ধারণ করে যে, উৎপাদন লাভজনক হলেও সুদের এ বোঝা বহন করা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হয় না। তদুপরি এসব কারবারে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকায় যে কোন সময়ে বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। আর এরূপ লোকসান হলে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা আর কখনও পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এসব কারণে উদ্যোক্তাগণ ব্যক্তিগতভাবে যেমন এসব ঝুঁকিবহুল উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায় না, তেমনি সরকারীভাবে এরূপ বিরাট ঝুঁকি গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে সুদী ব্যবস্থায় ঝুঁকিবহুল কায়-কারবার ও শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ হয় না বললেই চলে।

সুদ রহিত করা হলে, গোটা আর্থিক ব্যবস্থা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং ঝুঁকিবহুল কায়-কারবারে বিনিয়োগের পথে সুদরূপী বাধা আর থাকবে না। সুদমুক্ত অর্থনীতিতে সরকার প্রকল্পের লাভ-লোকসানে অংশীদারীর ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে ঝুঁকিবহুল প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে। যদি লোকসান হয়, তাহলে উদ্যোক্তা বা সরকারকে একা তা বহন করতে হবে না; বরং পুঁজিদাতা প্রতিষ্ঠানও এর আনুপাতিক অংশ বহন করবে। এভাবে বিনিয়োগকারী ও সরকারের জন্য এসব কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা সহজতর হবে। অপরদিকে ঝুঁকি কাটিয়ে যদি প্রকল্পে মুনাফা হয়, তাহলে তাও পুঁজিদাতা প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও সরকার চুক্তির শর্ত অনুসারে ভাগ করে নেবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেখানে ঝুঁকি বেশি সেখানে লাভও বেশি। ফলে অধিক মুনাফা পেয়ে উদ্যোক্তা, সরকার ও পুঁজিদাতা সকলেই লাভবান হবে। মোট কথা, সুদী

www.icsbook.info

ব্যবস্থায় ঝুঁকিবহুল কারবারে বিনিয়োগ কম হয়; কিন্তু সুদমুক্ত ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরাও ঝুঁকি বহন করবে বিধায় উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে, সরকার উৎসাহ লাভ করবে এবং এসব খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।

v) সুদ পুঁজির দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দে বাধা সৃষ্টি করে

ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা উভয় দিক থেকে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ঋণদাতার দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সুদী ব্যবস্থায় ঋণদাতাগণ কারবারের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও লাভজনীনতা অপেক্ষা সুদসহ আসল ফেরত পাবার নিশ্চয়তার ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রধানতঃ এর ভিত্তিতেই ঋণ বরাদ্দ করে থাকে। ঋণদাতা জানে যে, ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করে ঋণগ্রহীতা উচ্চহারে লাভ করলেও ঋণদাতা নির্ধারিত সুদের বেশি পাবে না। আবার ঋণগ্রহীতার লাভ যদি খুব কম হয়, অথবা যদি লোকসান হয়, তাহলেও ঋণদাতার নির্ধারিত সুদ কমে যাওয়ার কোন আশংকা নেই। ঋণের সুদ সর্বাবস্থাতেই নির্ধারিত। এমতাবস্থায় কারবারের লাভ-লোকসানের প্রতি ঋণদাতার আগ্রহ কম থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঋণের সুদ ও আসল ফেরত পাবার নিশ্চয়তা থাকা ঋণদাতার জন্য অবশ্যই জরুরী। কারবারে লাভ-লোকসান যাই হোক, সকল অবস্থাতেই যাতে ঋণদাতা সুদ-আসল ফেরত পেতে পারে সেজন্য তারা সেইসব ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেয় যাদের ঋণ ফেরত দেওয়ার মত যথেষ্ট সম্পদ আছে। একথা ঠিক যে, ঋণদাতাগণ প্রকৃত প্রকল্প বা কারবারের সুস্থতা এবং লাভজনীনতাও বিশ্লেষণ করে। তবে ঋণ বরাদ্দের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এর স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে তারা ঋণগ্রহীতার ঋণবহনযোগ্যতা (Credit Worthiness) বিচার করে থাকে। এ কারণে প্রকল্প বা কারবারের সুস্থতা ও লাভজনীনতা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট সম্পদ ঋণগ্রহীতার নিকট না থাকার কারণে ঋণ মঞ্জুর করা হয় না। আবার ঋণগ্রহীতা যথেষ্ট বন্ধক ইত্যাদি দিতে পারলে ভবিষ্যত সন্দেহমুক্ত নয় এমন কারবারের জন্যও ঋণ মঞ্জুর করতে ঋণদাতাগণ দ্বিধা করে না। অর্থনৈতিক বিচারে ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কম দক্ষ এবং কম উৎপাদনশীল প্রকল্প অপেক্ষা অধিক দক্ষ ও বেশি উৎপাদনশীল প্রকল্প বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু সুদী ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা নয়, ঋণবহনযোগ্যতাই ঋণ বরাদ্দের মানদণ্ড হয়ে উঠে। এর ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে দু'ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়:

প্রথমত, ঋণ ফেরত দানের মত যথেষ্ট সম্পদ বা ঋণবহনযোগ্যতা থাকলে কম উৎপাদনশীল ও কম লাভজনক প্রকল্পও ঋণ পায়; অপরদিকে ঋণবহনযোগ্যতা কম হওয়ার কারণে বেশি লাভজনক প্রকল্পের অধিকারী ঋণ পায় না। এতে সার্বিকভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অর্থনীতি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ঋণবহনযোগ্যতা বা ঋণের মর্টগেজ ও সিকিউরিটি প্রদানের মত সম্পদ যাদের যত বেশি আছে, তারা তত বেশি ঋণ পায়। একে বলা যায়, 'তেলা মাথায় তেল

www.icsbook.info

দেওয়া'। কারবার যত বৃহৎ হয়, ঋণ তত বেশি নেওয়ার সুযোগ পায় এবং কারবার আরও বড় হতে হতে আয়তন মিতব্যয়িতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অপরদিকে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলো বড় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার পরিচয় দিতে পারা সত্ত্বেও ঋণের অভাবে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়। এভাবেই সুদ ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে খতম করে দিয়ে বড়দের আরও বড় হবার সুযোগ করে দেয়।

ঋণের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহারের প্রশ্নটি ঋণগ্রহীতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। ঋণগ্রহীতার পক্ষে যতটা সম্ভব ঋণের অর্থ বেশি দক্ষতা ও অধিক লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে প্রয়াস পাওয়াই স্বাভাবিক। এজন্য অনেক সময় উদ্ভাবনশীলতা, নতুনত্ব ও উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার হয়। আর এতে ঝুঁকি দেখা দেয়। পরীক্ষাকালে ব্যর্থতা আসতে পারে এবং উৎপাদন আশানুরূপ নাও হতে পারে। কিন্তু এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকিতে পুঁজিপতিগণ অংশ নেয় না; বরং তারা নির্ধারিত চুক্তিতে সুদসহ আসল অবশ্যই ফেরত চায়। উৎপাদনকারী, বিশেষ করে, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে পুঁজির ক্ষতি হলে তা পূরণ করার মত কোন সংরক্ষিত তহবিল এদের থাকে না। এভাবে নির্ধারিত সুদের হারের ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উদ্ভাবন ও নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় লাভ থেকে সমাজ বঞ্চিত থেকে যায়। অর্থাৎ সুদমুক্ত সমাজে উদ্ভাবনশীলতা ও নবতর প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজকে যত দ্রুততার সাথে সামনে এগিয়ে নিতে পারে, সুদী সমাজে ততটা সম্ভব হয় না।

অর্থনীতিতে সুদ না থাকলে, ঋণদাতাগণ মুনাফার অংশের ভিত্তিতে পুঁজি যোগান দিবে। ফলে ছোট, বড় ও মাঝারি সকল কারবার একই শর্তে ঋণ পাবে; তা হলো মুনাফার অংশ। অতঃপর যে কারবারে মুনাফার হার যত বেশি হবে, সে কারবারের পুঁজি সংগ্রহের যোগ্যতা তত অধিক হবে। এতে একদিকে তুলনামূলকভাবে অধিক উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহ পুঁজি পাওয়ার ফলে সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন হবে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে যাদের সম্পদ আছে কেবল তারাই ঋণ পাবে, আর যাদের সম্পদ নেই তারা ঋণ থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকবে এমন অবস্থাও সৃষ্টি হবে না; বরং ছোট প্রকল্প যদি সত্যিই বেশি লাভজনক হয়, তবে এর ঋণ পাবার পথে আর কোন বাধা থাকবে না। অন্যদিকে বড় কারবার যদি কম লাভজনক হয়, তাহলে কেবল বড়ত্বের কারণেই তা অধিক ঋণ পেয়ে আরও বড় হবার সুযোগ পাবে না। এভাবে প্রকল্পের লাভজনীনতা নিজেই সমাজের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ও উৎপাদন নিশ্চিত করবে এবং বৈষম্য হ্রাস করবে।

তাছাড়া, পুঁজিপতিগণ কারবারের লাভ-ক্ষতিতে আগ্রহী হতে বাধ্য হবে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার সুফল পাবার আশায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি বহনে এগিয়ে আসবে। ফলে নতুনত্ব প্রয়োগের দিক থেকেও ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং

www.icsbook.info

অর্থনীতি দ্রুততার সাথে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও নবতর প্রযুক্তি প্রয়োগে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

এভাবে পুঁজির সর্বাধিক দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ, সর্বাধিক উৎপাদন ও নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে যদি সুদ না থাকে এবং মুনাফার ভিত্তিতে পুঁজি বরাদ্দের ব্যবস্থা চালু হয়।

vi) সুদ কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়

বস্তুতঃ সুদের হার এমন এক বস্তু যা ব্যবসায়ীকে সর্বদাই সুদের হারের উর্ধে মুনাফা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাকতে বাধ্য করে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করতে হলে কারবারী বা উৎপাদনকারীকে প্রথমেই বিবেচনা করে দেখতে হয়, তার এ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার হার কত হবে এবং অর্জিত মুনাফা থেকে সুদ পরিশোধ করার পর কোন মুনাফা তার থাকবে কি না; যদি থাকে তাহলে সেই মুনাফায় তার পোষাবে কিনা ইত্যাদি। আর একথা সকলেরই জানা আছে যে, সব ধরনের উৎপাদন কাজ এবং সকল প্রকার ব্যবসায়ে একই হারে মুনাফা অর্জন করা যায় না; বরং বাস্তবে দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসায় লাভের হার এত বেশি যে, উক্ত মুনাফা থেকে সুদ পরিশোধ করার পরও উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণ মোটা অংকের লাভ পেতে পারে। কিন্তু কোন কোন কারবারে লাভ এত কম হয় যে, এ থেকে সুদ পরিশোধ করাও সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন কারবারে এই পরিমাণ লাভ পাওয়া যায় যা থেকে কোন রকমে সুদ পরিশোধ করা যায় বটে, কিন্তু তারপর বিনিয়োগকারী আর কিছুই পায় না। এই বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন যে, সাধারণভাবে বিলাসসামগ্রী এবং সমাজের জন্য অকল্যাণকর পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবসায় মুনাফার হার বেশি হয়। অপরদিকে সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং কল্যাণকর দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার কম থাকে।[২৭] তাছাড়া অর্থনীতিতে এমন কিছু কাজও আঞ্জাম দিতে হয় যাতে প্রভূত সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়; কিন্তু অর্থের সাহায্যে এর মুনাফা নিরূপণ করা সম্ভব নয় অথবা তা কাম্য নয়।

এমতাবস্থায় সমাজে সুদ চালু থাকলে বিনিয়োগকারীগণ স্বাভাবিকভাবে সেই সব খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে, যেখানে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশি। অপরদিকে যেসব খাতে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে কম, সেসব খাতে কেউ পুঁজি বিনিয়োগ করবে না। এমনকি, দেশের সরকারের পক্ষেও প্রচলিত সুদের হারকে উপেক্ষা করে, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি সাধারণ জনকল্যাণমূলক খাতে অর্থ বিনিয়োগ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। ফলে সুদী সমাজে স্বাভাবিকভাবে জনকল্যাণমূলক এবং জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় খাতসমূহ উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়;

---

[২৭] জে, এম, কীনস, পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৭৭ ঃ "There is no clear evidence from experience that the investment policy which is socially advantageous coincides with that which is most profitable."

www.icsbook.info

অন্যদিকে সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী এবং নৈতিকতা পরিপন্থী খাতে পুঁজি প্রবাহিত হয়। একদিকে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার অভাবে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, অন্যদিকে বিলাসসামগ্রীসহ নৈতিকতা পরিপন্থী বহু পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়ে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিস্তার ঘটিয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সুদী অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগের প্রকৃত মানদণ্ড হচ্ছে পুঁজিপতি ও বিনিয়োগকারীর লাভ এবং স্বার্থ; সমাজের লাভ ও স্বার্থ সেখানে চরমভাবে উপেক্ষিত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে। মনে করা যাক, বাজারে প্রচলিত সুদের হার শতকরা ৬.০০ টাকা। এখন ধরা যাক, কোন পুঁজিপতির সামনে কয়েকটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং একটি জাঁকালো সিনেমা হল নির্মাণ, এ দুটি পৃথক প্রকল্প পেশ করা হলো। আরও ধরা যাক যে, প্রথম প্রকল্প হতে শতকরা ৬ ভাগের কম মুনাফা পাওয়ার আশা আছে; আর দ্বিতীয় প্রকল্প থেকে শতকরা ৬ ভাগের অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিনিয়োগকারী কোন প্রকার দ্বিধা না করেই দ্বিতীয় প্রকল্পটিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করবে এবং প্রথম প্রকল্পের দিকে একবারও ফিরে তাকাবে না। ব্যাপার এখানেই শেষ হবে না; বরং উক্ত বিনিয়োগকারী সর্বদাই চেষ্টা করবে সুদের হার শতকরা ৬ ভাগ অপেক্ষা বেশি হারে মুনাফা অর্জন করতে এবং এজন্য সে নৈতিকতাবিরোধী পন্থা অবলম্বন করতে হলেও তাতে কুণ্ঠিত হবে না। নৈতিকতাসম্পন্ন এবং কল্যাণকর চিত্র প্রদর্শন করে যদি শতকরা ৬ ভাগের বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে অবশ্যই সে নৈতিকতাবিরোধী ও অশ্লীল চিত্র প্রদর্শন করতে শুরু করবে এবং এজন্য এমনভাবে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকবে যাতে হাজার হাজার মানুষ প্রেক্ষাগৃহের দিকে ছুটে আসবে। এই হচ্ছে সুদের কৃতিত্ব।

সুদ না থাকলে উক্ত দু'টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথমটিতেও পুঁজি প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা থাকবে; এমনকি, নৈতিকতাসম্পন্ন বিনিয়োগকারীগণ কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয়টিতে অর্থ বিনিয়োগে রাজি হবে না। তাছাড়া শতকরা ৬ ভাগের বেশি মুনাফা অর্জন করার জন্য অনৈতিক পন্থার আশ্রয়ও সে নেবে না। কেননা এক্ষেত্রে অর্জিত মুনাফা থেকে ৬% সুদ পরিশোধ করার প্রশ্ন থাকবে না এবং ৬% মুনাফাকে বিনিয়োগকারী তার জন্যে যথেষ্ট মনে করবে।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, সুদ না থাকলে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হবে। বিনিয়োগকারীগণ যে মুনাফা অর্জন করবে, তারই অংশ পুঁজিপতিকে দেবে। ফলে উদ্যোক্তা সুদের হারের অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করতে বাধ্য হবে না এবং কেবল স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পেলেই বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। ফলে সুদী ব্যবস্থায় যেসব খাত বঞ্চিত ও অবহেলিত থাকে, সেসব খাতে বিনিয়োগে তেমন কোন বাধা থাকবে না। অর্থনীতির উন্নয়ন ভারসাম্যপূর্ণ হবে। নৈতিকতা পরিপন্থী খাতে পুঁজি প্রবাহিত হওয়ার আশংকাও তেমন থাকবে না।

www.icsbook.info

vii) সুদ দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হ্রাস করে

সুদী অর্থনীতিতে ব্যাংকার ও পুঁজিপতিগণ ফটকাবাজারীর জন্য পুঁজির একটা বিরাট অংশ নগদ ধরে রাখে। এছাড়া ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে সুদের হার বেড়ে গেলে বেশি সুদে অধিক পুঁজি খাটিয়ে যাতে উচ্চহারে সুদ অর্জন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেও তারা পুঁজিকে নগদ হাতে রেখে দেয় অথবা স্বল্প মেয়াদী ঋণে পুঁজি খাটায়। ফলে সুদী অর্থনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য পুঁজির অভাব দেখা দেয়। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ না পাওয়ার ফলে উৎপাদনকারী শিল্পপতিগণও স্বল্পোদ্যমের পরিচয় দিতে বাধ্য হয় এবং স্থায়ী কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কিছু করার পরিবর্তে কেবল চালু কাজটি চালিয়ে যাওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। স্বল্প মেয়াদী ঋণের দ্বারা অত্যাধুনিক মেশিন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য তারা পুরোনো মেশিন ও যন্ত্রাদির সাহায্যে বেশি সময় ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যতক্ষণ তাদের পণ্যের বাজার থাকে ততক্ষণ তারা এভাবেই উৎপাদন চালিয়ে যায়। এইরূপে তারা ঋণ ও সুদ পরিশোধ এবং নিজেদের জন্য মুনাফা অর্জন করতে থাকে। অতঃপর বাজারে যখনই পণ্যের চাহিদা কমে যায়, তখনই তারা পণ্য উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং উৎপাদন হ্রাস করে দেয়। বাজারে পণ্যের দাম কমে গেলে দেউলিয়া হয়ে যাবে, এই ভয়েই তারা এরূপ ব্যবস্থা নেয়। এভাবে অর্থনীতিতে চরম সংকট দেখা দেয়।

অতঃপর সুদী অর্থনীতিতে বৃহৎ শিল্প-কারখানা ও কারবারের জন্য দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে যে স্বল্প পরিমাণ ঋণ পাওয়া যায়, নির্ধারিত সুদের কারণে তাও আবার বড় রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সাধারণতঃ দশ, বিশ বা ত্রিশ বছরের জন্য নেওয়া হয়। আর ঋণ প্রদান ও গ্রহণের সময়েই সমগ্র মেয়াদের জন্য বার্ষিক সুদের হার নির্ধারণ করা হয়। সুদের এ হার নির্ধারণকালে পরবর্তী দশ, বিশ বা ত্রিশ বছরে দ্রব্যমূল্যের উঠা-নামা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, ঋণগ্রহীতার মুনাফায় কি পরিমাণ কম-বেশি হবে অথবা আদৌ তার কোন মুনাফা হবে কিনা এসব বিষয়ে কারোই কোন জ্ঞান থাকে না। ফলে এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সুদের হার নির্ধারণ করারও কোন প্রশ্ন উঠে না। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতই এরূপ সুদী ঋণের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। অতঃপর ভাগ্য যদি ভাল হয় এবং যদি ঋণগ্রহীতার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ও দাম বহাল থাকে, তাহলে নিয়মিতভাবে আসল ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটলে ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া হতে হয়, অথবা দেউলিয়াত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে অবৈধ কাজ-কর্ম করতে বাধ্য হয়। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, কোন একজন উৎপাদনকারী ১৯৭০ সালে শতকরা বার্ষিক ৬ ভাগ সুদের হারে ২০ বছরের জন্য একটি বড় অংকের ঋণ গ্রহণ করল এবং এর দ্বারা বড় ধরনের কোন উৎপাদন কাজ শুরু করল। এখন ঋণগ্রহীতাকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে এই আসল

www.icsbook.info

অর্থের কিস্তিসহ সুদ পরিশোধ করে যেতে হবে। কিন্তু এই দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে যদি কোন কারণে দ্রব্যমূল্য কমে যায় অথবা উৎপাদন ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, তাহলে নিয়মিত কিস্তি ও সুদ পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব হবে না, অথবা তাকে দেউলিয়াত্ব বরণ করে নিতে হবে অথবা অন্য কোন অবৈধ কাজ-কারবারের মাধ্যমে তাকে টিকে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

যদি সুদের প্রচলন না থাকে, তাহলে প্রথমতঃ ফটকাবাজারীর উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে বেশি হারে সুদ পাওয়ার আশায় ব্যাংকার ও ঋণদাতা কর্তৃক নগদ পুঁজি ধরে রাখার আর কোন কারণ থাকবে না। সুদহীন অর্থনীতিতে ঋণ সাধারণতঃ লাভ-ক্ষতির অংশীদারীর ভিত্তিতে দেওয়া হবে এবং সে অবস্থায় বিনিয়োগ ও উৎপাদনকারীগণ বেশি হারে মুনাফা অর্জন করলে পুঁজিপতিগণও বেশি লাভ পাবে; আর উৎপাদনকারীদের লাভ কম হলে, পুঁজিপতিদের অংশেও কম লাভ আসবে। সুতরাং এক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য ঋণযোগ্য তহবিলের অভাব সেরূপ হবে না, যেরূপ সুদী অর্থনীতিতে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ সুদমুক্ত অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণগ্রহীতাকে সকল অবস্থাতেই নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে না; বরং কারবারে বেশি লাভ হলে সে ঋণদাতাকে বেশি মুনাফা দেবে, কম লাভ হলে কম দেবে এবং লাভ না হলে বা লোকসান হলে তারও আনুপাতিক অংশ ঋণদাতার ওপর চাপাতে পারবে। ফলে সুদী ব্যবস্থায় নির্ধারিত সুদের বোঝা বহন করতে গিয়ে এসব ঋণগ্রহীতার যেভাবে দেউলিয়াত্ব বরণ করতে হয়, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে তার আশংকা একবারেই থাকবে না বলা যায়।

viii) সুদ সঞ্চয়কারীদের মধ্যে অলসতা সৃষ্টি করে

সুদী অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ঝুঁকিতে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়। এই অবস্থা সঞ্চয়কারীদের অলস ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প তথা উৎপাদন কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার হয়, সঞ্চয়কারিগণ তা করতে রাজি হয় না; বরং তারা সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রেখে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই নিরাপদ মনে করে। নির্ধারিত, নিশ্চিত ও নিরাপদ আয়ের পথ পরিহার করে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে যেতে চায় না। এ ব্যাপারে জন লক বলেছেন, "সুদ ব্যবসাকে ধ্বংস করে দেয়। মুনাফার চেয়ে সুদ বেশি সুবিধাজনক। ব্যবসায়ীরা সুদপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার লোভে ব্যবসা পরিহার করে সুদে অর্থ খাটায়।"[২৮] বিষয়টি এভাবে বললে বুঝতে সহজ হবে: মনে করা যাক, কোন একজন লোক কোনক্রমে এক কোটি টাকার মালিক হলো এবং এই এক কোটি টাকা ব্যাংকে জমা রাখল। ব্যাংক যদি এই আমানতের ওপর

[২৮] কীনস, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩৪৪ঃ "Locke quotes from A Letter to a Friend concerning Usury; High interest decays Trade. The advantage from Interest is greater than the Profit from Trade, which makes the rich Merchants give over, and put out their Stock to Interest, and the lesser Merchants Break."

www.icsbook.info

১০% সুদ দেয়, তাহলে উক্ত জমাকারী বছরে মোট ১০,০০,০০০ টাকা সুদ পাবে। সুদের এই আয়ের দ্বারা তার সংসার চলে যাবে এবং সে আর কোন কাজ-কর্ম করবে না। বিনা পরিশ্রম ও ঝুঁকিমুক্ত এই নিশ্চিত আয়কে সে যথেষ্ট মনে করবে।

কিন্তু যে লোক কোটি টাকার মালিক হতে পারে তার নিজস্ব বুদ্ধি, মেধা ও দক্ষতা কম হবার কথা নয়। এক কোটি টাকা ব্যাংকে রেখে নিশ্চিত আয় পাওয়ার ফলে সে আর তার প্রতিভাকে কাজে লাগাল না। এই হচ্ছে সুদের অবদান! সুদের ফলে এভাবেই ব্যাপক সংখ্যক যোগ্য সঞ্চয়কারীর চিন্তা, মেধা, শ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের সুফল থেকে অর্থনীতি বঞ্চিত হয়, বরং ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সুদী পদ্ধতিতে নির্ধারিত, নিশ্চিত, নির্ঝঞ্ঝাট, ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ আয় পাবার লোভ সঞ্চয়কারী ও পুঁজি মালিকদেরকে বিনিয়োগ বিমুখ করে তোলে। তারা বিনিয়োগের ঝামেলা, শ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণ অপেক্ষা নির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে অর্থ খাটাতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে জেমস রবার্টসন তাঁর অতি উন্নত মানের গবেষণা গ্রন্থ Transforming Economic Life : A Millennial Challenge– এ লিখেছেন, "অর্থ বাড়তে হবে (money must grow) এই অনুজ্ঞা পরিবেশগত দিক থেকে (ecologically) ধ্বংসাত্মক। এর ফলে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনের কাজ থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং অর্থ থেকে অর্থ উপার্জনে মগ্ন হয়ে পড়ে।"[২৯]

সুদ না থাকলে সঞ্চয়কারীগণ নিজেরা অথবা অন্য কোন বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে অংশীদারী ভিত্তিতে তাদের সঞ্চয় উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করবে এবং নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতা খাটিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি করার প্রয়াস পাবে। অর্থনীতি এদের মেধা ও শ্রম থেকে উপকৃত হবে এবং তারা নিজেরাও অধিকতর লাভবান হবে। তাছাড়া, সুদবিহীন অর্থনীতিতে সঞ্চয়কারীগণ যখন তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখবে, তখনও তারা সে রকম অলসতা প্রদর্শন করবে না, যে রকম সুদী অর্থনীতিতে করে থাকে। সুদমুক্ত ব্যাংকে অর্থ জমাকারীগণ প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকের লাভ-ক্ষতিতে অংশীদার হবে। যদি ব্যাংকের লোকসান হয় তাহলে আমানতকারীদের আমানত কমে যাবে, এই আশংকায় ব্যাংকের বিনিয়োগ ও কারবার সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া, ইত্যাদি কাজ করতে তারা বাধ্য হবে। ফলে অর্থনীতি এদের অবদান থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

ix) সুদ পুঁজিপতিদের স্বেচ্ছাচারী আচরণে বাধ্য করে

সুদী অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ সর্বদাই অধিক সুদ পাবার লক্ষ্য সামনে রেখে ঋণ দিয়ে থাকে। অর্থনীতির প্রায় গোটা মূলধন পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদের নিয়ন্ত্রণে

---

২৯. James Robertson: *Transforming Economic Life: A Millennial Challenge*, Green Book, Devon 1998; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮।

www.icsbook.info

থাকে। ফলে তারা যখন খুশী ঋণ সংকোচন এবং যখন খুশী সম্প্রসারণ করতে পারে। তারা যখন মনে করে যে, ঋণের পরিমাণ বাড়ালে তারা বেশি ফায়দা পাবে, তখন তারা ঋণ বাড়িয়ে দেয়; আবার যখন ঋণ কমিয়ে দিলে বেশি লাভবান হবে বলে তাদের ধারণা হয়, তখন তারা ঋণ কমিয়ে দেয়। এভাবে যখন ঋণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেই তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে বলে মনে করে, তখন তারা ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তাদের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে অর্থনীতি ও সমাজের কি লাভ বা ক্ষতি হলো সেদিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করে না। অর্থনীতির স্বাভাবিক চাহিদা এবং যথার্থ প্রয়োজনের দিকটি তারা আদৌ বিবেচনা করে না। ফল এই দাঁড়ায় যে, অর্থনীতিতে যখন ঋণের প্রয়োজন কম থাকে, তখন পুঁজিপতিগণ সুদের হার কমিয়ে দেয় এবং বেশি বেশি ঋণ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু ঋণের চাহিদা যখন বেড়ে যায় এবং উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী কাজের জন্য প্রচুর ঋণের প্রয়োজন হয়, তখন পুঁজিপতিগণ তাদের ঋণের পরিমাণ কমিয়ে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ঋণের চাহিদা যত বাড়তে থাকে সুদের হারও তত বেড়ে যায় এবং অবশেষে তা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, অতঃপর এত চড়া সুদের হারে ঋণ নিয়ে কারবারে খাটালে তাতে মুনাফা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ পর্যায়ে এসে পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়, অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহসা ভাটা পড়ে এবং সমগ্র অর্থনীতি মন্দাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ তাদের পূর্বের ঋণ ফেরত পাবার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং ঋণগ্রহীতাদের ওপর চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি ঋণ ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করে, অথচ এ সময়ে ঋণগ্রহীতাদের অবস্থা থাকে সবচেয়ে সংকটময়। প্রকৃতপক্ষে ঋণদাতাদের এ আচরণকে "এমন এক ছাতার মালিকের সাথে তুলনা করা যায়, যে আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে ছাতা ধার দেয়; কিন্তু বর্ষণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ছাতা ফেরত নিয়ে নেয়।" অথবা পুঁজিপতিদের এহেন আচরণকে এমন পানি সেচকারীর সাথে তুলনা করা যায়, যিনি কৃষিক্ষেতে পানির প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে পানি দেওয়ার পরিবর্তে নিজের তৈরী নিয়ম অনুসারে ক্ষেতে পানি দিয়ে থাকেন। আর তার নিয়ম হচ্ছে যে, যখন ক্ষেতে পানির প্রয়োজন থাকে না, তখন সস্তা দামে পানি দিতে সে প্রস্তুত। কিন্তু যখন পানির দরকার হবে, তখন পানির দাম বাড়িয়ে দেবে। এভাবে পানির প্রয়োজন যত বেশি হবে, দামও তত বাড়াতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত পানির দাম এত বাড়িয়ে দেবে যে, সে দামে পানি সেচ করে ফসল ফলানো আদৌ লাভজনক হবে না। পানির এই মালিক কৃষি, তথা খাদ্য উৎপাদনে যে ক্ষতি করে, পুঁজিপতিগণও অতি মাত্রায় সুদের লোভে অর্থনীতির অনুরূপ ক্ষতি সাধন করে থাকে।"[৩০]

---

[৩০] মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৬৩।

www.icsbook.info

৩) উৎপাদনের ওপর

উপরের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয় বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায় এবং সুদের হার শূন্য হলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত আরও যে পরিমাণ বিনিয়োগ হতে পারত, সেখানে তা বেকার থেকে যায়। এছাড়া, সুদী ব্যবস্থায় যথেষ্ট মূলধন গঠিত হয় না, আর যাও বা হয় তারও একটা বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল ও ফটকা খাতে বিনিয়োগ করা হয়, আর একটা অংশকে অলস রাখা হয়, সুদী সমাজে পুঁজির বরাদ্দ দক্ষতাপূর্ণ হয় না, সঞ্চয়কারীদের মধ্যে আলস্য সৃষ্টি হয় এবং কল্যাণকর, ঝুঁকিবহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ হয় খুব কম। এসব কারণে বিনিয়োগ যতটা হওয়ার কথা সুদী অর্থনীতিতে তার চেয়ে অনেক কম হয় এবং উৎপাদনও কম থাকে। এছাড়া উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদ আরও কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিম্নে উৎপাদনের ওপর সুদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলোঃ

i) সুদ দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে বিনিয়োগ-উৎপাদন কমিয়ে দেয়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুদী ব্যবস্থায় সুদ দ্রব্যমূল্যের সাথে যুক্ত হয় এবং সমহারে দ্রব্যমূল্যকে বাড়িয়ে দেয়। নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারেঃ

সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় = মজুরী+খাজনা+সুদ+মুনাফা = দ্রব্যমূল্য।

সুদমুক্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় = মজুরী+খাজনা+মুনাফা=দ্রব্যমূল্য।

মনে করা যাক, কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে সুদমুক্ত অর্থনীতিতে মজুরী বাবদ ১০/টাকা, খাজনা বাবদ ৫/টাকা এবং মুনাফা বাবদ ২/টাকা ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির মোট উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ১০+৫+২ = ১৭.০০ টাকা মাত্র। দ্রব্যটি বাজারে ১৭ টাকায় বিক্রি করা যায়। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে যদি একই অবস্থা বিরাজ করে, তাহলে উক্ত ব্যয়ের সাথে উদ্যোক্তা কর্তৃক ঋণদাতাকে প্রদত্ত সুদ যুক্ত হবে। মনে করা যাক, ২০% হারে ১৫ টাকার সুদ হয় ৩.০০ টাকা। এই সুদ যোগ করে দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় দাঁড়াবে ২০.০০ টাকা। দ্রব্যটি ২০.০০ টাকার কমে বিক্রি করা হলে উদ্যোক্তার লাভ কমে যাবে অথবা তাকে লোকসান দিতে হবে। সুতরাং সুদমুক্ত অর্থনীতিতে যে পণ্যের দাম হচ্ছে ১৭ টাকা, সুদী অর্থনীতিতে তারই দাম দাঁড়াচ্ছে ২০.০০ টাকা। ফলে সুদী অর্থনীতিতে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা কম থাকে এবং বিনিয়োগ উৎপাদন কম হয়।

সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ার আর একটি কারণ হচ্ছে উৎপাদন সর্বাধিক না হওয়া। ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, সুদী অর্থনীতিতে উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছতে পারে না। ফলে এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় এবং দাম বেশি হয়। তাছাড়া উৎপাদন কম হওয়ায় যোগান কম হয় এবং এককপ্রতি গড় দাম বেড়ে যায়। এভাবে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় তা চাহিদা ও উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

www.icsbook.info

সুদ না থাকলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে এবং দ্রব্যমূল্যের সাথে সুদ যোগ হবে না। এককপ্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দামও কম হবে এবং পণ্যের চাহিদা ও বিক্রয় বেশি হবে। উৎপাদনকারীর মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। তারা উৎসাহিত হবে এবং আরও অধিক বিনিয়োগ উৎপাদনে এগিয়ে আসবে। দ্রব্যের যোগান বাড়বে এবং দাম আরও কমে আসবে।

ii) সুদ জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস করে বিনিয়োগ-উৎপাদন কমিয়ে দেয়

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পণ্য-মূল্যের আকারে ভোক্তা জনসাধারণের কাছ থেকে সুদ তুলে এনে গুটি কয়েক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত করা হয়। এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রতিদিন, প্রতিটি পণ্য ক্রয়ে সুদ দিতে দিতে গরীব ও মধ্যবিত্ত ভোক্তা জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। অবস্থা এমন হয় যে, শার্টের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে শার্ট ক্রয় করে পিঠ আবৃত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, বিনিয়োগ কমে যায় এবং উৎপাদন স্থবির হয়ে পড়ে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কাজ হারায় ও বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। চাহিদা, বিনিয়োগ ও উৎপাদন আর এক দফা হ্রাস পায়। এভাবেই সুদী অর্থনীতিতে ধাপে ধাপে বিনিয়োগ-উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে।

সুদ না থাকলে দ্রব্যমূল্যকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়ার মত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হবে না, অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কমে যাবে এবং পুঁজিকে অলসভাবে ধরে রাখার প্রবণতা থাকবে না। ফলে সুদী অর্থনীতিতে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ে, সুদহীন অর্থনীতিতে সেভাবে বাড়বে না, জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাও কমে যাবে না। তারা তাদের আয় দ্বারা সুদী অর্থনীতির তুলনায় বেশি পণ্য-সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে অধিক পরিমাণ চাহিদা পূরণ করতে পারবে। বিনিয়োগ-উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

iii) সুদ উৎপাদিত সম্পদ ধ্বংস করতে বাধ্য করে

সুদী অর্থনীতিতে মন্দা এক অনিবার্য অবস্থা। তাছাড়া মন্দা একবার এসেই শেষ হয় না, বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। আর মন্দার সময়ে ক্রেতার অভাবে একদিকে বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী অবিক্রীত অবস্থায় গুদামজাত হয়; অন্যদিকে ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। এই অবস্থাতেও উৎপাদনকারীগণ কেবল বাজার নষ্ট হওয়া এবং ভবিষ্যতের মুনাফার ক্ষতি হবার আশংকায় তাদের গুদামজাত পণ্য কম দামে বাজারে ছাড়তে রাজি হয় না। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের আচরণ এতটা অমানবিক হয় যে, তাদের উৎপাদিত পণ্য গুদামে পচে নষ্ট হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়, কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই তারা অভাবী ও প্রয়োজনশীল মানুষের কাছে সামান্য কম দামে তা বিক্রি করে না অথবা বিনামূল্যে দান করে না। বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা একবার দু'বার নয়, বহুবার ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ, কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো:

www.icsbook.info

প্রথম যে ঘটনাটির উল্লেখ করা হচ্ছে তা ঘটেছিল ১৯১৪ সালে ব্রাজিলে। গানথার তার Inside Latin America বইটিতে ঘটনাটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যা যুগপৎ হাসি ও বেদনার উদ্রেক করে। ১৯১৪ সালে ব্রাজিলে ব্যাপক পরিমাণ উৎপাদিত কফি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমে ঠিক করা হয় এগুলো পুঁতে ফেলা হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, প্রতিবস্তার ওজন ১৩২ পাউন্ড করে মোট চার মিলিয়ন বস্তার জন্য যে পরিমাণ স্থান খুঁড়তে হয় তার আয়তন হয় সমগ্র রোড আইল্যান্ডের সমান। তাছাড়া কফির মধ্যে সার জাতীয় পদার্থ নেই বলে তা পচে মাটিকেই নষ্ট করে দেবে। বিশেষজ্ঞরা আতংকগ্রস্ত হয়ে মাথা ঘামালেন। অবশেষে স্থির হলো মাটিতে পুঁতার পরিবর্তে কফিগুলো পানিতে ফেলে দেয়া হবে। হাজার হাজার বস্তা ভর্তি করে সমুদ্রে ফেলা হলো। এতে মাইলের পর মাইল সমুদ্র তীর নষ্ট হলো, বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদও ধ্বংস হলো। ফলে মাটি বা পানি কোনটার দ্বারাই সমস্যার সমাধান হলো না। শেষ পর্যন্ত স্থির করা হলো কফি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, কফির মধ্যে জলীয় অংশ থাকার ফলে কৃত্রিম জ্বালানি মিশিয়ে না দিলে তা পুড়বে না। সুতরাং কেরোসীন আমদানী করা দরকার হলো। হিসাবে দেখা গেল এভাবে এক বস্তা কফি পোড়ানোর জন্য আধা পাউন্ড অর্থ খরচ হয়। তার ওপর জাহাজ ভাড়া, গুদাম ভাড়া, শ্রমিক ব্যয় এবং বিনষ্টকৃত কফির মূল্যতো আছেই। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলকে এর চার মিলিয়ন বস্তা অতিরিক্ত শস্য ধ্বংস করার জন্য প্রতিবছর খরচ করতে হয় ২০,০০,০০০ (বিশ লাখ) পাউন্ড।[৩১]

দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন শেখ মাহমুদ আহমদ। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার বেকার শ্রমিকরা ক্যালিফোর্নিয়ার ফলের বাগানে কাজ করতে যায়। শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মজুরীর পরিমাণ কমে গিয়ে জীবন ধারণ (Subsistence level) মান স্তরে নেমে আসে। এরপরও নতুন শ্রমিকদের বেশ কিছু সংখ্যক বেকার থেকে যায়। এসব লোক অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থেকে মৃত্যুর শিকার হয়। তখনও বাগানে ফলের উৎপাদন ছিল প্রচুর। মালিকদের হিসাব মতে উৎপাদিত ফলের একটা অংশ নষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন হলো। চেরী ও স্ট্রবেরী ফল গাছে গাছে পচতে লাগল। হাজার হাজার লোক সামান্য মজুরীর বিনিময়ে সেগুলো আহরণ করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মালিকরা তাতে রাজি হলো না।[৩২]

এরপর এলো কমলা লেবুর পালা। কমলা আহরিত হবার পর মালিকরা হিসাব করে দেখল, এসব কমলা বাজারে ছাড়া হলে কমলার দাম পড়ে যাবে। সুতরাং উৎপাদিত কমলার এক বিরাট অংশ নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত হলো। সুস্বাদু কমলাগুলো সোনার

---

৩১. ডব্লিউ, সি, মিচেল: *হোয়াট ভেবলেন থট*, পৃ-XIIV; উদ্ধৃত করেছেন, শেখ মাহমুদ আহমদ, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, পৃঃ ১৩।

৩২. শেখ মাহমুদ আহমদ: পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১৪।

www.icsbook.info

পাহাড়ের মত এক স্থানে জড়ো করা হলো এবং এর ওপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হলো। অথচ এ সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় অসংখ্য শিশু পুষ্টিহীনতায় ধুঁকছিল। কমলা পুড়িয়ে দেয়া হলো; কিন্তু এসব শিশুকে সস্তায় কমলা খাবার সুযোগ দেয়া হলো না।[৩৩]

বিগত মন্দার সময়েও ধাপে ধাপে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিনষ্ট করা হয়েছে। ১৯৩৪ সালে এক মিলিয়ন কমলা লিভারপুল বন্দরের কাছে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাজারে কমলালেবুর সরবরাহ কমিয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। অথচ এ সময়ে লিভারপুলের গরীব বাচ্চাদের জন্য কমলালেবু ছিল এক দুর্লভ বস্তু।[৩৪]

বাজার পড়ে যাবার ভয়ে সম্পদের এই বিনাশ সাধনকে অর্থনীতির ভাষায় ডাম্পিং বা খালাস প্রথা বলা হয়েছে। এ কাজ যে নিতান্তই অমানবিক, তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়; কিন্তু যারা এ কাজ করে তারা চাহিদা ও যোগানের সমস্যার কারণেই করতে বাধ্য হয়। জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা থাকে না বলে চাহিদা পড়ে যায়, আর কারবারী সমাজ চাহিদার স্বল্পতা দেখে উৎপাদন সংকুচিত করে বা উৎপাদিত সম্পদের ধ্বংস সাধন করে।

এ সমস্যার একমাত্র সঠিক সমাধান হচ্ছে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং মূল্য হ্রাস করা। তাছাড়া জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়ে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করার মাধ্যমেও সমস্যার সমাধান হতে পারে। সুদের বিলোপ সাধন করা হলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমে আসবে এবং মূল্য হ্রাস পাবে। তাছাড়া সুদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্নমুখী উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে ক্রয়-ক্ষমতা বাড়বে; আর বর্ধিত ক্রয়-ক্ষমতা চাহিদা বাড়াবে। ফলে পণ্য-দ্রব্য পুড়ে ফেলা বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে কম দামে বাজারে বিক্রি করা লাভজনক হবে। অসংখ্য ভুখা-নাঙ্গা মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

এ পর্যন্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষেত্রে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সুদী অর্থনীতিতে সর্বাধিক বিনিয়োগ ও সর্বাধিক উৎপাদন হয় না এবং মূলধন গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। ব্যাংকে গচ্ছিত মূলধনের একটা বিরাট অংশ অনুৎপাদনশীল খাতে খাটানো হয় এবং আর একটা অংশ অলসভাবে নগদ ধরে রাখা হয়। মূলধনের বিনিয়োগ-বরাদ্দও যথার্থ দক্ষতাপূর্ণ হয় না এবং জনকল্যাণমূলক খাতগুলোর জন্য মূলধন যোগান দেওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজির অভাব দেখা দেয় এবং নির্ধারিত সুদের শর্ত থাকার দরুন দীর্ঘ মেয়াদী

---

৩৩. উপরোক্ত, পৃঃ ১৪।

৩৪. আর, পি, দত্তঃ *ফ্যাসিজম এন্ড সোশ্যাল রিভোলিউশন*, পৃঃ ৪৫, উদ্ধৃত করেছেন, শেখ মাহমুদ আহমদ, উপরোক্ত, পৃঃ ১৫।

www.icsbook.info

ঋণগুলো প্রায়ই ঋণগ্রহীতাদের দেউলিয়াত্বের কারণ হয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত সুদের লোভ অর্থনীতিতে প্রতিভাবান লোকদের মেধা ও শ্রম থেকে উপকৃত হবার পথ রুদ্ধ করে দেয়। সর্বোপরি পুঁজিপতিদের স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং উৎপাদিত সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে অর্থনীতিকে চরম সংকটে ঠেলে দেয়।

খ) বণ্টন ক্ষেত্রে সুদের প্রভাব

সুদ সম্পদ ও আয়ের বণ্টন ক্ষেত্রেও মারাত্মক জুলুম ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

১. সুদ নিদারুণ বে-ইনসাফীর জন্ম দেয়

সুদী ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা, ব্যাংকার ও ডিপোজিটর সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বে-ইনসাফী ও জুলুমের শিকার হয়। তবে সকল জুলুমের চূড়ান্ত দায়ভার আসলে সাধারণ জনগণকেই বহন করতে হয়।

সুদ ঋণগ্রহীতাদের ওপর জুলুম চাপিয়ে দেয় ঃ পুঁজিবাদের সুদী বণ্টন ব্যবস্থায় ভূমি এর সেবার বিনিময় হিসেবে নির্ধারিত ভাড়া (rent) পায়; শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে পায় পারিশ্রমিক (wages); কিন্তু পুঁজিপতি কারবারে খাটানোর জন্য যে ঋণ দেয় তার বিনিময়/কাউন্টার ভ্যালু হিসেবে সে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত নিয়ে নেয়। অতঃপর কাউন্টার ভ্যালুর ওপর নির্ধারিত সুদ নেয় কোন বিনিময় ছাড়া, মাগনা, শুধু চুক্তির বলে। আবার চুক্তিতে যদি চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ লেনদেনের শর্ত থাকে, তাহলে ঋণদাতা চক্রবৃদ্ধি হারেই সুদ নেয়। এই সুদ পরিশোধ করার পর উদ্বৃত্ত থাকলে উদ্যোক্তা লাভ পায়, উদ্বৃত্ত না থাকলে সে কিছুই পায় না; আর কারবারে লোকসান হলে সুদ প্রদান ও আসলের ঘাটতি পূরণের সাকুল্য বোঝা ঋণগ্রহীতাকেই বহন করতে হয়। এভাবে যে খাটে, ঝুঁকি নেয়, সময় ব্যয় করে তাকে সাকল্য লোকসানের বোঝাতো বহন করতেই হয়, তার ওপরে সুদের বোঝাও তাকেই টানতে হয়; অপরদিকে যে বিনিময় না দিয়ে মাগনা নেয় তার আয় হয় নির্ধারিত, নিশ্চিত ও নিরাপদ। ঋণগ্রহীতার ওপর এটি একটি অতি বড় জুলুম।

সুদ ঋণদাতা ও ব্যাংকারের ওপর বে-ইনসাফী করে ঃ ঋণগ্রহীতার কারবারে যদি বিপুল পরিমাণ লাভ হয়, তাহলে ঋণদাতা কেবল নির্ধারিত হারে সুদই পায়, আর গোটা লাভ ঋণগ্রহীতা একাই নিয়ে যায়। এতে আবার ব্যাংকার ঋণদাতার ওপর জুলুম করা হয়।

সুদ ডিপোজিটরদের বঞ্চিত করে ঃ সুদী ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা বিনিয়োগকারীদের নিজস্ব পুঁজি থাকে খুবই কম, মোট পুঁজির ১০%, ২০%, বা ৩০%; আর বাকি বেশির ভাগ পুঁজি তারা নেয় ব্যাংক থেকে যার প্রকৃত মালিক হচ্ছে ডিপোজিটরগণ। অন্য কথায় বলা

www.icsbook.info

যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারবারের ৭০% অর্থের মালিক আসলে ডিপোজিটরগণ। আর মাত্র ৩০% এর মালিক হচ্ছে উদ্যোক্তা। অথচ কারবারে অর্জিত বিপুল মুনাফার মাত্র ৫% থেকে ৭% দেওয়া হয় ডিপোজিটরদের অর্থাৎ ৭০% অর্থের মালিককে, আর মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক পায় ৫%-৭%; অবশিষ্ট ৮০-৮৫% নিয়ে যায় উদ্যোক্তাগণ, যারা মাত্র ৩০% অর্থের মালিক। তাছাড়া ডিপোজিটরগণ তাদের ডিপোজিটের ওপর যে হারে সুদ পায়, ভোক্তা হিসেবে দ্রব্য-সামগ্রীর দামের সাথে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ তাদেরকে আবার দিতে হয়। ফলে তাদের নীট আয় দাঁড়ায় আসলে ঋণাত্মক। এব্যাপারে কথা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, যাদের অর্থ, যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে জমা রাখে তারা পায় ঋণাত্মক আয়; আর যারা ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তারা হয় ৮০-৮৫ বা ৯০% মুনাফার ভাগীদার।

সুদ এর চূড়ান্ত বোঝা ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেয় ঃ সর্বোপরি, সুদ এর চূড়ান্ত বোঝা ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দেয়; চূড়ান্তভাবে বর্ধিত দ্রব্যমূল্য আকারে সুদের সাকুল্য বোঝা আসলে ক্রেতা সাধারণের ওপরই নিপতিত হয়।

২. সুদ বেকারত্ব বৃদ্ধি করে

সুদ কেবল বেকার সমস্যা সৃষ্টিই করে না, বেকারত্ব বৃদ্ধিও করে। বেকার সমস্যা সুদী অর্থনীতির একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়, সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ তার চেয়ে কম হয়। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায়। অতঃপর পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে আসা পর্যন্ত যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা যেত, সে পরিমাণ পুঁজি অনিয়োজিত অথবা বেকার থেকে যায়। পুঁজির এই বেকার অংশটুকু বিনিয়োগ করে যে পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব এবং যে পরিমাণ অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার করা যায়, সুদী অর্থনীতিতে তার সবটাই বেকার থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং সুদী অর্থনীতিতে মানবীয় সম্পদের ক্ষেত্রেই শুধু বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তা নয়, বরং সেই সাথে অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারও সম্ভব হয় না। পূর্বে উল্লেখিত ছকে দেখানো হয়েছে যে, সুদের হার ২০% হলে উদ্যোক্তা ৪র্থ একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে। আর সুদ না থাকলে সে ৬ষ্ঠ একক পর্যন্ত বিনিয়োগ করবে। সুতরাং সুদের হার ২০% হলে এই দুই একক পুঁজি এবং তার সাথে নিয়োগযোগ্য শ্রমিক ও বস্তুগত সম্পদ বেকার ও অব্যবহৃত থাকতে বাধ্য হবে।

এছাড়া সুদী অর্থনীতিতে ফটকাবাজারীর উদ্দেশ্যে অলস ধরে রাখা ও অনুৎপাদনশীল খাতে ঠেলে দেয়ায় পুঁজির একটা বিরাট অংশ উৎপাদনশীল খাতে প্রবাহিত হয় না বলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও সম্পদ বেকার থাকতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি পুঁজিপতিদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ ও মন্দার ফলে ধাপে ধাপে বিনিয়োগ হ্রাস করে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে বেকার সমস্যাকে প্রকটতর করে তোলা হয়।

www.icsbook.info

উপরের আলোচনায় প্রধানতঃ সংকটকালে সৃষ্ট বেকার সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, মন্দার সময় সুদী অর্থনীতির দোষ-ত্রুটিগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং সমস্যা জটিলতর হয়। আসলে সুদী অর্থনীতিতে এসব দোষ সব সময়েই বর্তমান থাকে; এমনকি, চরম ব্যবসায়িক সাফল্যের সময়েও বেকারত্ব বর্তমান থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১৯২৭ সালের কথা উল্লেখ করা যায়। এটি ছিল বাণিজ্যিক চরম সাফল্যের বছর। পুঁজিবাদী দেশগুলো ছিল সন্তুষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে সময়ে উৎপাদনক্ষম সম্পদ পুরোপুরি বিনিয়োগ করা যায়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের কথা বাদ দিলেও খোদ পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশসমূহে লাখ লাখ শ্রমিক এসময়ে বেকার ছিল। একটা অসম্পূর্ণ হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৯২৯ সালে ইটালিতে ৩,০৯,০০০, অস্ট্রেলিয়ায় ২,২৫,০০০, পোল্যান্ডে ১,৭০,০০০, ইংল্যান্ডে ১২,০৪,০০০ এবং জার্মানীতে ২,৮৪,০০০ লোক বেকার ছিল।[৩৫] বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক ধনশালী দেশ আমেরিকার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, সেখানে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ লোক বেকার রয়েছে এবং দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে।"[৩৬]

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতীত অন্য সময় সুদী অর্থনীতি বেকার সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ অসমর্থ; এমনকি উৎপাদনশীল সম্পদকেও পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না। সবচেয়ে প্রাচুর্যের সময়েও প্রকৃত বেকার এবং কিছু মূলধন অব্যবহৃত অবস্থায় থেকেই যায়। এ ব্যাপারে কীনস তার জেনারেল থিওরীতে বলিষ্ঠভাবে লিখেছেন যে, সুদের হারের উপস্থিতিতে যুদ্ধকাল ছাড়া পূর্ণ কর্মসংস্থানের উপযোগী তেজীভাব আর কখনও দেখা দিয়েছে বলে আমার সন্দেহ হয়।[৩৭] কীনস বলেছেন, সুদের হার কমলে অর্থনীতির যেসব খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হবে উচ্চ সুদের হার থাকাকালে সেখানে বিনিয়োগ লাভজনক হয় না।[৩৮]

প্রকৃতপক্ষে সুদ বিলোপ করা হলে বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে। কোটি কোটি লোকের কর্মসংস্থান সম্ভবপর হবে। এই সব মানুষের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা আসবে; উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হবে। উৎপাদনকারীদের পণ্যের বিক্রয় বেড়ে যাবে, মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হবে। সুতরাং সুদের হার হ্রাস পাওয়া মানেই সমৃদ্ধির পথে এক ধাপ অগ্রগতি।

---

৩৫. শেখ মাহমুদ আহমদ, উপরোক্ত, পৃঃ ১২।

৩৬. আফজালুর রহমান, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১১৫।

৩৭. জে, এম, কীনস, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩২২ ঃ "Except during the war, I doubt if we have any recent experience of a boom so strong that it led to full employment."

৩৮. ঐ, পৃঃ ১৯৩ ঃ "A lower rate of interest stimulates an expansion of capital investment in fields which at higher rates would be unprofitable."

www.icsbook.info

৩. সুদ মজুরী হ্রাস করে

সুদী অর্থনীতিতে শ্রমিকের মজুরী সর্বদাই পিছিয়ে থাকে। সুদের ফলে একদিকে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি বেকার থাকে, অন্যদিকে যারা কাজ পায় তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। একেতো বিনিয়োগ কম হওয়ার দরুন শ্রমের চাহিদা কম থাকে, তার ওপর আবার বেকারত্বের ব্যাপ্তির কারণে শ্রমের সরবরাহ থাকে অনেক বেশি। চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্যের দরুন শ্রমের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তাছাড়া সুদের বোঝা বহন করার পর উদ্যোক্তাদের পক্ষে আবার মজুরী বাড়ানো সম্ভব হয় না। সুদের কারণে দ্রব্যের উৎপাদন খরচ ও দাম বেড়ে যায়। এরপর আবার মজুরী বেশি দিতে হলে উৎপাদন আর লাভজনক থাকে না বলেই উৎপাদনকারিগণ মজুরী বৃদ্ধি করতে পারে না। তদুপরি কম মজুরীতে যখন প্রচুর শ্রম পাওয়া যায়, তখন তারা বেশি মজুরী দেবেই বা কেন!

সুদী অর্থনীতিতে একদিকে দ্রব্যসামগ্রীর বর্ধিত মূল্যের চাপ, অন্যদিকে কম মজুরী শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে। শ্রমিকগণ জীবন বাঁচানোর তাকিদেই বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে দর-কষাকষি করতে বাধ্য হয়, যা প্রায় সময়ই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায় এবং উৎপাদন ব্যাহত করে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কর্মবিরতি, ধর্মঘট, ইত্যাদি নানাবিধ চাপ সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অপরদিকে মালিক পক্ষ থেকেও বন্ধ ঘোষণা, লক আউট ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এসব পদক্ষেপ উৎপাদনের পরিবেশ নষ্ট করে এবং উৎপাদনকে দারুণভাবে ব্যাহত করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বেশি তথা পূর্ণ বিনিয়োগ হবে। বেকার সমস্যার প্রকটতা থাকবে না। ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়বে, আর এজন্য মজুরীও বেশি হবে। সুদ না থাকায় উদ্যোক্তাগণ সুদ পরিশোধ করার পর মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করবে না; বরং প্রচলিত সুদের হারের সমান বা তার চেয়ে কম মুনাফা পেলেও তারা উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাবে। এজন্য শ্রমিককে অধিক মজুরী প্রদান করার পরও কারবার লাভজনক থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মজুরী বেশি দিলে তা বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতে ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্টি করবে যা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করবে। এতে উদ্যোক্তাদের বিক্রি ও মুনাফা বাড়বে। ফলে মালিকগণ শ্রমিকদের দাবী- দাওয়া পূরণে সুদী অর্থনীতির ন্যায় একগুঁয়েমি প্রদর্শন করার পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নিয়ে এগিয়ে আসবে। শ্রমিকদের পক্ষেও কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের ন্যায় উৎপাদন ব্যাহতকারী পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে কোন সংগত যুক্তি থাকবে না। শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং অনুকূল পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

www.icsbook.info

৪. সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ হচ্ছে সুদ। সুদ নানা দিক থেকে এই বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধানকে আকাশচুম্বী করে তোলে।

প্রথমত, সুদের পূর্বনির্ধারিত এবং নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা থাকার ফলে ব্যাংকারগণ আমানতের ওপর অতি অল্প হারে সুদ দিয়ে জনগণের বিপুল পরিমাণ অর্থকে নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয় এবং এ অর্থকে কয়েকগুণ বর্ধিত করে ধার দিয়ে তার ওপর সুদ আদায় করে নিজেরা বিপুল সম্পদের মালিক হয়।

উদাহরণ হিসেবে ১৯৭৬ সালে আমেরিকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে শেয়ার হোল্ডারদের সর্বমোট শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৭৩.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ সে সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ১,০৪০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ শেয়ার মূলধনের চৌদ্দ গুণেরও অধিক সম্পদের অধিকারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকের বড় বড় শেয়ারের মালিক, যারা ব্যবসার আসল নিয়ন্ত্রণকারী, তাদের মালিকানায় ছিল মাত্র ১৬.৪ বিলিয়ন ডলার, যা এই বিরাট সম্পদের অতি নগণ্য অংশ মাত্র।[৩৯] সুদী ব্যবস্থা এভাবেই পুঁজিপতিদেরকে জনগণের টাকা খাটিয়ে নিজেদের সম্পদ দ্রুত বাড়ানোর সুযোগ করে দেয় এবং কতিপয় পুঁজিপতির হাতে বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করে থাকে।

সুদী ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে, যারা ধনী, বিত্তবৈভব যাদের বেশি, সিকিউরিটি মর্টগেজ দেওয়ার মত সম্পদ যাদের আছে, তারাই ব্যাংক ঋণের সুবিধা বেশি পায়। অন্যদিকে যাদের মর্টগেজ নেই, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এবং প্রকল্পের মান উন্নততর ও অধিকতর উৎপাদনশীল হলেও তারা ব্যাংক ঋণ পায় না। লেস্টার থুরোর মতে, "যারা যোগ্য বা দক্ষ (smart or meritocratic) তারা নয়, বরং কেবল ভাগ্যবানরাই ঋণ পায়।"[৪০] মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট কোম্পানীও স্বীকার করেছে যে, ব্যাংকিং পদ্ধতি উন্নয়নশীল (maturing) ছোট ছোট কোম্পানী অথবা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের অর্থায়নে ব্যর্থ হয়েছে; এবং যদিও বা তাদের ঋণ দেয়, তাহলেও প্রতিযোগিতামূলক দামে অর্থায়নে আগ্রহী হয় না। কিন্তু বৃহৎ ও সর্বাধিক নগদ অর্থের অধিকারী কোম্পানীকে অর্থ যোগান দেয় অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদের হারে।[৪১] ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক

---

৩৯. চাপরা, এম. উমর: *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, মোঃ শরীফ হুসাইন অনূদিত, ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫।

৪০. থুরো, লেসটার, *জিরো সাম সোসাইটি*, নিউইয়র্ক, ব্যাসিক বুকস, ১৯৮০, পৃ: ১৭৫, উদ্ধৃত, উসমানী, মোহাম্মদ তকি: পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ৭৯।

৪১. মর্গান গ্যারান্টি ট্রাস্ট অব নিউইয়র্ক, *ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস*, জানুয়ারী, ১৯৮৭, পৃ: ৭; উদ্ধৃত উসমানী, মোহাম্মদ তকি, পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯-৮০।

www.icsbook.info

প্রকাশিত তথ্য থেকে ওপরে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। স্টেট ব্যাংকের তথ্যে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে ২,১৮৪,৪১৭ জন জমাকারীর মধ্যে মাত্র ৯,২৬৭ জন জমাকারী (মোট জমাকারীর মাত্র ০.৪২৪৩%) সর্বমোট ৪৩৮.৬৭ বিলিয়ন রূপী ব্যবহার করেছে যা ব্যাংকসমূহ থেকে প্রদত্ত ঋণের ৬৪.৫ শতাংশ।[৪২] এজন্যই ড. চাপরা বলেছেন, "যদিও জনগণের বৃহত্তর অংশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর জমাকৃত অর্থ ব্যাংক আমানতের প্রধান উৎস, তবু এ অর্থের সুবিধা প্রধানত বিত্তশালীরাই ভোগ করে।"[৪৩] সুদী অর্থনীতিতে আসলে তেলা মাথায় তেল দেওয়া হয়। এভাবে বৃহদায়তন কারবারগুলো কম সুদের বোঝা বহন করে আরও বৃহৎ হয়ে উঠে। অপরদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কারবার প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ-বহনযোগ্যতা অপেক্ষাকৃত কম হবার কারণে উচ্চতর সুদের হারে কম পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। ফলে এসব ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়। এভাবে সুদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারবারের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যায়, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বড় হয়ে উঠে এবং ক্রমে এদের হাতেই সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়।

এছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পণ্য-সামগ্রীর মূল্যের সাথে যুক্ত করে অসংখ্য ভোক্তার কাছ থেকে পণ্য-মূল্যের আকারে সুদ তুলে এনে গুটি কয়েক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত করা হয়। এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রতিদিন, প্রতিটি পণ্য ক্রয়ে সুদ দিতে দিতে গরীব ও মধ্যবিত্ত ভোক্তা জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যায়। পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা হ্রাস পায়, বাজার সংকুচিত হয়ে আসে, অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়; শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়; মিল-কারখানা একে একে বন্ধ হয়ে যায়। আয়হীন বেকার শ্রমিকরাও দরিদ্রের মিছিলে শামিল হতে বাধ্য হয়। এছাড়া অনেক উদ্যোক্তাও মন্দার ধকল কুলোতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গরীব-নিঃস্বদের সাথে যোগ দেয়। এ প্রসঙ্গে বিচারপতি তকি উসমানী লিখেছেন, "এ ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে ছোট ছোট বহু ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়েছে।"[৪৪]

এ প্রসঙ্গে মাইকেল রোবোথাম বলেছেন, "অসংখ্য অতীত ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বানিয়ে পথে বসানো হয়, বেশুমার লোককে বাড়ি-ঘর থেকে উৎখাত ও বেদখল করা হয়, কারবারগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষকে

---

৪২. *স্ট্যাটিস্টিক্যাল বুলেটিন অব স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৪৭, এনেক্সার-বি, উদ্ধৃত, উসমানী, মোহাম্মদ তকি, উপরোক্ত, পৃঃ ৮০।

৪৩. চাপরা, এম. উমর: *পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে দাখিলকৃত বক্তব্য*, উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ৮০।

৪৪. উসমানী, মোহাম্মদ তকি: উপরোক্ত, পৃঃ ৮১।

www.icsbook.info

বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় এবং অর্থনীতি মানুষের দুর্দশার স্থবির সাগরে রূপ নেয়।"[৪৫] ফলে সুদ কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ায় না, বেকারত্ব বৃদ্ধি করে, দেউলিয়া বানায় এবং দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ও দরিদ্রের সংখ্যা সম্প্রসারিত করে।

সুদী ব্যবস্থায় ঋণদাতাগণ এমন অনেক ঋণ প্রদান করে যেগুলো থেকে কোন লাভজনক উৎপাদন পাওয়া যায় না, অথবা পাওয়া গেলেও সে লাভের পরিমাণ প্রদত্ত সুদের চেয়ে কম হয়, অথবা এমন কারবারেও ঋণ দেয়া হয়, যেখানে লাভ তো হয়ই না বরং লোকসান হয়ে মূলধনই খোয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে ভোগ্য ঋণ এবং সরকারী ঋণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ খেয়ে নিঃশেষ করা হয়, এর দ্বারা কিছুই উৎপাদন করা হয় না। অথচ ঋণগ্রহীতাকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ঋণদাতার সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়। এভাবে ভোগ্য ঋণগ্রহীতাদের সম্পদ ঋণদাতাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে ঋণ-গ্রহীতার সম্পদ কমিয়ে দেয় এবং ঋণদাতার সম্পদ বাড়িয়ে তোলে।

সরকারী ঋণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সরকার সাধারণতঃ তার গৃহীত ঋণ সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করে। এসব কাজের সামাজিক গুরুত্ব বেশি থাকা সত্ত্বেও এগুলোতে আর্থিক লাভ খুবই কম হয় অথবা হয় না। তাছাড়া অনেক সময় সরকার ঋণের অর্থ অনুৎপাদনশীল বিলাসিতামূলক খাতেও ব্যয় করে থাকে, যেখান থেকে কোন আয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এসব সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে সরকারকে সুদ অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। সরকার সাধারণতঃ জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করার মাধ্যমেই এ সুদ পরিশোধ করে। এভাবে করের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ হস্তান্তরিত হয়ে ব্যাংকার ও পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত হয়। সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে এবং পুঁজিপতিরা আরও ধনী হয়ে উঠে।

এছাড়া যেসব ঋণের ক্ষেত্রে কারবারে লোকসান হয় অথবা সুদের সমান লাভ হয় না, সেসব ঋণগ্রহীতা তাদের পূর্ব সম্পদ থেকে ঋণদাতাদের সুদ পরিশোধ করে। এতে এদের নিজস্ব সম্পদ কমে যায়; কিন্তু তা পুঁজিপতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে তাদের সম্পদ ফাঁপিয়ে তোলে।

সুদী ব্যবস্থা কিভাবে গরীবদের সর্বস্বান্ত করে ধনীদের আরও ধনশালী করে তোলে সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন জেমস রবার্টসন যা পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "সুদের মাধ্যমে এভাবে সম্পদ হস্তান্তর অংশত একারণে হয় যে, ধার দেওয়ার মত অর্থ যাদের বেশি আছে তারা সে অর্থ ধার দিয়ে...... অধিক সুদ অর্জন করে। আর এটা একারণেও হয় যে, যাদের সম্পদ কম তাদেরকে প্রায়শই বেশি ধার করতে হয়। তাছাড়া সুদের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরের এটাও একটা

---

৪৫. মাইকেল রোবোথাম: *The Grip of Death: A Study of Modern Money*, John Carpentar, England 1989, p. 13, উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃ: ৮৭।

www.icsbook.info

প্রক্রিয়া যে, বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনে যে ব্যয় হয়, সুদজনিত ব্যয় হচ্ছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। আর বিত্তশালীদের অর্থায়নেই আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ও সেবার ব্যাপকতর উৎপাদন হয়ে থাকে।"[৪৬] জেমস রবার্টসন অন্যত্র মন্তব্য করেছেন, "অর্থ ও অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব লোকদের নিকট হতে ধনীদের কাছে, দরিদ্র এলাকা থেকে বিত্তশালী এলাকায় এবং দরিদ্র দেশ থেকে ধনশালী দেশে আয় হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নিয়মানুগ (systematic)। দরিদ্রদের থেকে ধনীদের কাছে সম্পদ হস্তান্তরের একটি কারণ হচ্ছে অর্থনীতিতে সুদ প্রদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়া।"[৪৭]

উপরের আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সুদ নানা পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের অর্থ গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত করে দেয় এবং তাদের সম্পদের পাহাড় তৈরী করে। অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষ ক্রমাগতভাবে দরিদ্র হতে হতে অবশেষে নিঃস্ব-সর্বহারাদের কাতারে শামিল হয়। সুদের অবসান ঘটালে এ বৈষম্য সৃষ্টির প্রধান হাতিয়ার অনুপস্থিত হয়ে পড়বে এবং বৈষম্য কমে গিয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে। এ ব্যাপারে প্রথম কথা সুদের অনুপস্থিতিতে ব্যাংকারদের আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কার্যক্রম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সেক্ষেত্রে আমানতকারীগণ ব্যাংকের অংশীদার হিসেবে মুনাফার অংশ পাবে এবং সে অংশ বর্তমান সুদের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

মুনাফায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ঋণদান ব্যবস্থা চালু হলে ঋণগ্রহীতাদের সম্পদের চেয়ে ঋণের মুনাফাজনীনতার ভিত্তিতে ঋণ বরাদ্দ ও মঞ্জুর করা হবে। এতে কেবল ধনীরা ঋণ পাবে এবং আরও ধনী হবার সুযোগ লাভ করবে, অপরদিকে গরীবরা আদৌ ঋণ পাবে না-এমন অবস্থার অবসান ঘটবে। অতঃপর যে কারবার যত বেশি উৎপাদনশীল ও লাভজনক হবে, সে কারবার তত বেশি ঋণ পাবে। এ নীতিতে যোগ্য বিবেচিত হলে দরিদ্রদের কারবারও সমান গুরুত্ব লাভ করবে এবং ঋণ পাবে। এতে ধনীদের একচেটিয়া অধিকার থাকবে না বরং ছোট ও মাঝারি কারবারও সমান অধিকার পেয়ে বড় হবার সুযোগ পাবে।[৪৮]

সুদমুক্ত অর্থনীতিতে ব্যাংক থেকে ভোগ্য ঋণ দানের সুযোগ খুব কমই থাকবে; এজন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে সুদ আকারে ভোগ্য ঋণগ্রহীতাদের সম্পদ পুঁজিপতিদের কাছে চলে যাবে না। সরকারী ঋণের এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে জনগণের ওপর করের বোঝা না চাপিয়ে সরকার ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এতে জনগণের সম্পদ কর আকারে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে।

---

৪৬. James Robertson: *Future Wealth: A New Economics for the 20th Century*, Castle Publications, London, 1990, p. 130-131, উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ৮২।

৪৭. James Robertson: প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১-৫৪;উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ৮৩।

৪৮. চাপরা, এম, উমরঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।•

www.icsbook.info

সুদ না থাকলে পুঁজিপতিদের সম্পদ রাতারাতি ফেঁপে উঠার পথ রুদ্ধ হবে। দ্রব্যমূল্য কমবে, করের বোঝা হ্রাস পাবে এবং উৎপাদনশীল ও লাভজনক কাজে ঋণের সঠিক ব্যবহার হবে; ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকবে না; বিশেষ করে, গরীবদের আরও গরীব হওয়ার পরিবর্তে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এভাবে সুদহীন অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।

৫. সুদ জনগণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রধানতঃ তিনটি কারণে সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় ঃ (১) কোন কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার পর সেখান থেকে আয় আসতে কিছু সময় লাগে; কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারী কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ট্রেজারী বিল বিক্রয় করে অর্থ ধার করতে হয়; (২) সরকারী খাতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্যও সরকারকে ঋণের আশ্রয় নিতে হয় এবং (৩) দুর্যোগ মুকাবিলা বা যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্যও সরকারকে বিপুল ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে।

প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ করা হয়, সেহেতু এরূপ ব্যয় থেকে সরকার কোন আর্থিক মুনাফা পায় না। কিন্তু ট্রেজারী বিলগুলো নির্ধারিত সময় পরে পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে এগুলোর ওপর নির্ধারিত সুদসহ আসল টাকা ফেরত দিতে হয়। এক্ষেত্রে সুদ বাবদ যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়, তা কর রূপে জনসাধারণের নিকট থেকে আদায় করতে হয়। এতে এই সুদের বোঝা কর আকারে জনসাধারণের ওপর গিয়ে পড়ে। যদি প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে এ অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে এর বোঝা সেই সব বিত্তশালী লোকের ওপর গিয়ে পড়ে, যারা ট্রেজারী বিল ক্রয় করে সরকারকে ঋণ দিয়েছিল। এরা সরকারকে ঋণ দিয়ে সুদ অর্জন করে; আবার কর আকারে এ সুদ তাদের পকেট থেকেই দিতে হয়; বরং কর ব্যবস্থাপনার জন্য যে ব্যয় হয়, তার বোঝাও এই শ্রেণীর ওপরই বর্তায়। সুতরাং এই ব্যয়টুকু সামাজিক অপচয় এবং অতিরিক্ত বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। আর যদি পরোক্ষ করের মাধ্যমে সুদ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে সে করের ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও সুদের বোঝা সবটাই সাধারণ মানুষের ওপর গিয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর তা দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারী ঋণের দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী খাতের শিল্প-কারখানা ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান দেওয়া। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় মুনাফা হতেও পারে বা নাও হতে পারে; কিংবা মুনাফা হলেও তা সুদের হারের সমান নাও হতে পারে। মুনাফা যদি সুদের হারের সমান বা বেশি হয়, তাহলে সেই মুনাফা থেকেই সুদ পরিশোধ করা সম্ভব। কিন্তু যদি মুনাফা না হয় অথবা মুনাফা যদি সুদের হার অপেক্ষা কম হয়, তাহলে সুদ পরিশোধ করার জন্য সরকারকে অবশ্যই করের আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হচ্ছে সরকারী শিল্প-কারখানার লোকসানের বোঝা গোটা সমাজের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ঋণদাতার নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা।

www.icsbook.info

সর্বশেষে, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলার জন্য সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে তা প্রায়ই স্থায়ী হয়ে যায় এবং বংশানুক্রমে এর বোঝা বহন করতে হয়। পুরাতন বন্ডগুলো পরিপক্ক হবার পর এর পরিবর্তে নতুন বন্ড দেওয়া হয় এবং এভাবে বছরের পর বছর এ ঋণ চলতে থাকে; সরকার কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর জনসাধারণের নিকট থেকে কর আদায় করে এ ঋণের সুদ পরিশোধ করে যায়। এভাবে সুদের সমান এবং এর সাথে কর ব্যবস্থাপনার জন্য কৃত ব্যয়ের সমপরিমাণ বোঝা কর আকারে জনগণের ওপর বর্তায়। জাতি প্রতি বছর সুদ পরিশোধ করতে থাকে; কিন্তু আসল ঋণ ঋণই থেকে যায়। অবশেষে অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করা ছাড়া এ ঋণ পরিশোধ করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। আর অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টি মানেই মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, যা জনগণের দুর্দশাকে অধিকতর দুঃসহ করে তোলে।

আন্তর্জাতিক ঋণের ক্ষেত্রেও সরকারকে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সুদ ও ঋণ পরিশোধ করতে হয়। প্রকারান্তরে দেশের জনগণ করের বোঝায় নুইয়ে পড়ে। আমাদের দেশে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বছরের বাজেটের দিকে তাকালে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। উক্ত বাজেটে অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধ বাবদ ২৫৮.৭৭ কোটি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ৫০৮.০০ কোটি, মোট ৭৬৬.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বছর জনসাধারণের নিকট থেকে নতুন কর ধার্য করে ৭০৩.৩৩ কোটি টাকা আদায় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[৪৯] সুতরাং এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, উক্ত সুদ প্রদান করতে না হলে এ বছর দেশের বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিপীড়িত মানুষের ওপর এ নতুন করের বোঝা চাপানোর প্রয়োজন হতো না। সুদ এমন এক বোঝা যে, জাতীয় জীবনের চরম দুর্যোগ মুহূর্তেও এ বোঝা বহন না করে কোন উপায় থাকে না।

গ) স্থিতিশীলতার ওপর সুদের বিরূপ প্রভাব

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাজারের স্থিতিশীলতা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু সুদ এক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে, উৎপাদনের পরিবেশ ব্যাহত করে এবং অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। স্থিতিশীলতার ওপর সুদের কুফলগুলো নীচে আলোচনা করা হলো:

১. সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে

বিশ্বে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদগণ প্রধানত সুদকেই দায়ী করেছেন। সুদের কারণেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো 'নাই' থেকে বহুগুণ অর্থ সৃষ্টি করে;

---

[৪৯] *জাতীয় বাজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ*, ১৯৮৯-৯০, সংক্ষিপ্ত বিবরণী, পৃঃ ৪।

www.icsbook.info

আর অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ দেয় যা মুদ্রাস্ফীতিকে ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এছাড়া সরকারের ঋণ-চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্ট অর্থও মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে।

সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো আসল ও সুদ ফেরত পাবার নিশ্চয়তা হিসেবে বলিষ্ঠ সহকারী জামানত গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করে; অতঃপর ঋণের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর তেমন প্রয়োজন বোধ করে না। এই ব্যবস্থা মানুষকে তাদের আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করতে প্ররোচিত করে। মানুষ বাহুল্য ব্যয় ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে। আজকের যুগে ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতি ঋণ প্রাপ্তিকে আরও সহজ করেছে এবং ঋণকে প্রত্যেক ভোক্তার হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক এমন ঋণও বরাদ্দ করে যা অনুৎপাদনশীল খাতে খাটানো হয়। এসব ভোগ্য ও অনুৎপাদনশীল ঋণ বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ায় যার সাথে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির কোন মিল থাকে না।

অনুরূপভাবে সরকারও বাজেট ঘাটতি পূরণ, উচ্চাভিলাষী প্রতিরক্ষা সম্ভার গড়ে তোলা, দুর্যোগ মুকাবিলা এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এমনকি, অনেক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাড়তি নোট ছাপিয়ে এসব ঋণ সরবরাহ করা হয়। এ অবস্থা বাজারে অর্থের পরিমাণ এবং উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী ও সেবার পরিমাণের মধ্যে গুরুতর অসংগতি সৃষ্টি করে যা মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং একে অধিকতর ফাঁপিয়ে তোলে।

সর্বোপরি প্রাচীন গোল্ডস্মিথদের ন্যায় এ যুগের ব্যাংকগুলোরও একটি জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে যাকে বলা হয় বহুগুণ ঋণ সৃষ্টির (Multiple credit creation) ক্ষমতা। আংশিক রিজার্ভ (Fractional reserve) পদ্ধতির অধীনে ব্যাংকগুলোকে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনগণের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গৃহীত ডিপোজিটের দশগুণ বেশি অর্থ ঋণ দিচ্ছে। এভাবে তারা 'নাই' থেকে অর্থ সৃষ্টি করছে। ফলে ঋণের ওপর ঋণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সরকার কর্তৃক প্রকৃত মুদ্রার তুলনায় এই কৃত্রিম অর্থের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নের ছকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৭ সালে বৃটেনে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৫ বিলিয়ন পাউন্ড; এর মধ্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রকৃত ঋণমুক্ত অর্থ ছিল ৮.১ বি. পা. যা মোট অর্থের ১২%। কিন্তু ১৯৯৭ সালে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮০ বি. পা. যার মধ্যে মাত্র ২৫ বি. পা. হচ্ছে প্রকৃত মুদ্রা যা মোট মুদ্রার মাত্র ৩.৬% অর্থাৎ অবশিষ্ট ৯৬.৪% হচ্ছে কৃত্রিম অর্থ।

www.icsbook.info

সাল	সরকারি ভাবে ইস্যুকৃত মোট মুদ্রা ও মোট (এম,ও) স্টারলিংপাউন্ড (বিলিয়নে)	মোট অর্থের পরিমাণ (এম,ও) বিলিয়নে	মোট অর্থ সরবরাহের মধ্যে প্রকৃত ঋণ-মুক্ত অর্থের শতকরা হার
১৯৭৭	৮.১	৬৫	১২%
১৯৭৯	১০.৫	৮৭	১২%
১৯৮১	১২.১	১১৬	১০.৫%
১৯৮৩	১২.৮	১৬১	৭.৯%
১৯৮৫	১৪.১	২০৫	৬.৮%
১৯৮৭	১৫.৫	২৬৯	৫.৮%
১৯৮৯	১৭.২	৩৭২	৪.৬%
১৯৯১	১৮.৬	৪৮৫	৩.৮%
১৯৯৩	২০.০	৫২৫	৩.৮%
১৯৯৫	২২.৪	৫৮৫	৩.৮%
১৯৯৭	২৫.০	৬৮০	৩.৬%

সূত্রঃ *Bank of England, Releases 1995, 1997, quoted by* মাইকেল রোবোথাম; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, উপরোক্ত, পৃঃ ৮৫।

যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করছে। প্যাট্রিক জে. এস. কারম্যাক ও বিল স্টিল বলেছেন, আমরা এমন একটি ঋণনির্ভর অর্থ ব্যবস্থায় (debt money system) কাজ করছি যেখানে আমাদের সমগ্র অর্থই সমপরিমাণ ঋণের সাথে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারী ব্যাংকগুলো নিজেদের স্বার্থে এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তারা অর্থ সৃষ্টি করে তা সুদে ধার দেয়, আর আমরা পাই ঋণ..... । এমনিভাবে আংশিক রিজার্ভ ভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শতকরা ৯০ ভাগের বেশি অর্থ সৃষ্টি করে। সুতরাং শতকরা ৯০ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি তারাই ঘটিয়ে থাকে।[৫০]

তদুপরি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্ট এই ভিত্তিহীন অর্থ আজ 'ফিউচারস' এবং 'অপশনস' রূপে উদ্ভূত অর্থের (derivatives) মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে ফটকা কারবারের বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রারম্ভিককালে অর্থের ওপর দাবীকে (claims over money) অর্থই মনে করা হতো। কিন্তু এখন দাবী হচ্ছে

[৫০] প্যাট্রিক এস, জে, কারম্যাক এন্ড বিল স্টিলঃ *The Money Masters: How International Bankers Gained Control of America*, রয়ালটি প্রডাকশন কোম্পানী, ১৯৯৮, পৃঃ ৭৮, ৭৯, উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৬।

www.icsbook.info

দাবীর ওপর দাবী (claim over claim)। আর একে সে অর্থেই বিবেচনা করা হয়। এক গণনায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বে সর্বমোট ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিমাণ উদ্ভূত অর্থ (derivatives) প্রচলিত আছে। অথচ বিশ্বের ১৮৮টি দেশের মধ্যে সবগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনের (GDP) যোগফল হচ্ছে মাত্র ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত। এই কারবারের ৮০ ভাগেরই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মাত্র দুই ডজন বৃহৎ ব্যাংক ও হেজ তহবিলের (hedge fund) হাতে।[৫১]

ফলে বিশ্বের গোটা অর্থনীতির অবস্থা হচ্ছে একটা বিরাট বেলুনের মত। প্রতিদিন নতুন ও নবতর আর্থিক লেনদেনের দ্বারা এই বেলুন ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে; অথচ প্রকৃত অর্থনীতির সাথে এর কোন সংগতি নেই। এই 'বেলুন' বেলুনের মতই দুর্বল; বাজারের আঘাতে (market shocks) যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে এ বেলুন। বস্তুত নিকট অতীতে এরকম ফেটে যাওয়ার ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে, যার ফলে এশিয়ার ব্যাঙ্কগুলো ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী এই আঘাত এত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে যে, বিশ্ব প্রচার মাধ্যমসমূহ বাজার অর্থনীতি এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে বলে সমস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। এখানে আমরা আবারও জেমস রবার্টসনের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর রচিত অতি উৎকৃষ্ট মানের সৃষ্টি 'ট্রান্সফরমিং ইকোনমিক লাইফ: এ মিলেনিয়াল চ্যালেঞ্জ' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

"বিশ্বে প্রতিদিন বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার হস্তান্তর হয়; এই লেনদেনের কমপক্ষে ৯৫ ভাগই হচ্ছে নিছক আর্থিক লেনদেন; এর সাথে প্রকৃত অর্থনীতিতে সংঘটিত লেনদেনের কোন সংযোগ নেই। মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে উপলব্ধি করছে যে, অর্থ, ব্যাংক ও আর্থিক পদ্ধতির কার্যক্রম হচ্ছে অবাস্তব (unreal), অবোধ্য (incomprehensible), বে-হিসেবী (unaccountable), দায়িত্বহীন (irresponsible), শোষণমূলক (exploitative) এবং নিয়ন্ত্রণহীন (out of control)। কেন পৃথিবীর কোন এক দূর প্রান্তে গৃহীত একটি মাত্র আর্থিক সিদ্ধান্তের ফলে মানুষ বাস্তুহারা হতে বাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে চাকরি খুইয়ে পথে বসতে হচ্ছে? কেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে গরীবদের সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যাচ্ছে, গরীব দেশের সম্পদ বিত্তশালী দেশে গিয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে? কিভাবে এক ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে বসে টোকিওর স্টক এক্সচেঞ্জে জুয়া খেলতে সক্ষম হয় এবং কি করে সে লন্ডনের একটি ব্যাংকের পতন ঘটাতে পারে?..... লন্ডন নগরীতে কারবাররত উদ্ভূত অর্থের ব্যবসায়ী যুবকগণ কেন বছরে এত পরিমাণ বোনাস পায় যা সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি? আমরা কি এমন

---

[৫১] অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ: *ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং: দি চ্যালেঞ্জ অব দি ২১ শতাব্দী*, লেখক কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮।

www.icsbook.info

একটি অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থা চেয়েছিলাম, যা এভাবে কাজ করে? অর্থায়নকারী জর্জ সোরোস পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "লেইসেজ-ফেয়ার পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাজার-মূল্যবোধের সম্প্রসারণ আমাদের মুক্ত (open) ও গণতান্ত্রিক সমাজকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি সাম্যবাদী নয় বরং পুঁজিবাদী হুমকিই মুক্ত সমাজের প্রধান দুশমন।"[৫২] (ক্যাপিটাল ক্রাইমস, আটলান্টিক মানথলি, জানুয়ারি, ১৯৯৭।)

সমগ্র বিশ্ব আজ ওপরে উল্লেখিত যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তা অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করার জন্য সুদী আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রদত্ত লাগামহীন ক্ষমতার যৌক্তিক পরিণতি। এরপরও কি কেউ দাবী করতে পারে যে, সুদের লেনদেনে কোন দোষ নেই! বস্তুত পূর্ববর্তীকালে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রচলিত সুদী ঋণ সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত করত; কিন্তু আজকের বাণিজ্যিক সুদ বিশ্বব্যাপী যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ব্যাপক ও মারাত্মক।

মুদ্রাস্ফীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ড. উমর চাপরা লিখেছেন, "মুদ্রাস্ফীতি মানেই হচ্ছে, হিসাব-নিকাশের সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ একক হিসেবে কাজ করতে মুদ্রার ব্যর্থতা। মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাকে বকেয়া পরিশোধের একটি অসম মানদণ্ড এবং সঞ্চয়ের অনির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত করে। মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে আর্থিক সম্পদের ক্রয়-ক্ষমতার ক্ষয় সাধন করে এবং কিছু লোককে অন্যদের ওপর জুলুম করার সুযোগ করে দেয়। মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা-ব্যবস্থার দক্ষতা ব্যাহত করতে যতটা সক্ষম হয়, সামাজিক কল্যাণ ঠিক ততটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদনশীল কর্ম প্রচেষ্টার পরিবর্তে ফটকা কারবারকে পুরস্কৃত করা এবং আয় বৈষম্যকে তীব্রতর করার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে দেয়।"[৫৩]

এখন দেখা যাক, সুদ না থাকলে মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা কেমন হবে। সুদের অবর্তমানে ব্যাংকার এবং ঋণদাতাগণ প্রকল্পের মুনাফায় অংশ নেওয়ার শর্তে পুঁজি যোগান দেবে। ব্যাংকার এবং উদ্যোক্তা যখন কোন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পাবে, তখনই কেবল অর্থ মঞ্জুর করা হবে। সুতরাং নতুন অর্থ সৃষ্টি করা হলে তা সাধারণত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণও বৃদ্ধি করবে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকবে না।

যদি কোন প্রকল্পে আশানুরূপ লাভ না হয়, অথবা যদি এতে লোকসান হয়, তা হলেও উক্ত পুঁজির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আশংকা থাকবে না। কারণ এক্ষেত্রে ব্যাংককে এর

---

[৫২] James Robertson: *Transforming Economic Life: A Millenial Challenge*; Green Book, Devon, 1998; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৮-৮৯।

[৫৩] চাপরা, এম, ওমর, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৫।

www.icsbook.info

নির্ধারিত সুদসহ আসল ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন থাকবে না; এতে যে লোকসান হবে তা ব্যাংক এবং উদ্যোক্তা তাদের নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করবে।

ভোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত ও লাভ-লোকসান ভিত্তিক ব্যাংকের ভূমিকা থাকবে না বললেই চলে। কারণ, ভোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান নির্ধারণের কোন প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া ভোগ্য ঋণ সুদী হোক, আর সুদমুক্ত হোক, সকল অবস্থাতেই দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ায় কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিতে এর কোন ভূমিকা থাকে না। সুতরাং ভোগ্য ঋণ সর্বদাই মুদ্রাস্ফীতিজনক এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারক। তবে যদি করজাত রাজস্ব আয় (Tax Revenue), যাকাত এবং সরকারের কাছে আসা সঞ্চয় থেকে ভোগ্য ঋণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তা মুদ্রাস্ফীতি উদ্দীপক হয় না। সুতরাং সুদমুক্ত ব্যবস্থায় ব্যাংক থেকে ভোগ্য ঋণ দান করার পরিবর্তে উপরোক্ত বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতীয় ঋণ প্রদান করা হলে মুদ্রাস্ফীতির অশুভ ফল থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

সুদমুক্ত ব্যাংক উৎপাদন খাতে সাধারণভাবে যে পুঁজি যোগান দিবে এর দ্বারা এই খাতের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পূরণ নাও হতে পারে এবং এর পরেও 'ব্রীজ ফাইন্যান্স' এবং অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। প্রশ্ন থেকে যায় যে, স্বাভাবিক অর্থায়নের ওপর আবার এসব স্বল্প মেয়াদী পুঁজি দেওয়া হলে তা কি অর্থ সরবরাহ বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে না? বস্তুত এসব অর্থায়নের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আশংকা নেই। কারণ প্রথমত, এ পুঁজির যোগান এত স্বল্প সময়ের জন্য হবে যে, এতে মুনাফা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। ফলে সাধারণতঃ ব্যাংকগুলো এরূপ অর্থায়ন করতে আগ্রহী হবে না। বিশেষ ব্যবস্থায় আইন প্রয়োগ এবং উৎসাহদানের মাধ্যমে ব্যাংককে এরূপ অর্থায়নে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগ ও আগ্রহ না থাকায় এরূপ অর্থায়নের পরিমাণ হবে খুবই কম। দ্বিতীয়ত, এসব পুঁজি সরাসরি উৎপাদনে ব্যবহৃত না হলেও উৎপাদনের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সুসম্পন্ন করতে অবদান রাখবে। সুতরাং এ পুঁজি মুদ্রাস্ফীতি উদ্দীপক হবে একথা বলা যায় না। তাছাড়া, এরূপ পুঁজির পরিমাণ এত অধিক হবে না যে, আর্থিক কর্তৃপক্ষ তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হবে।

সুদমুক্ত অর্থনীতিতে সরকারকে যে ঋণ দেওয়া হবে তা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে সরকারী ঋণের উৎস ও ব্যবহারের ওপর। জনগণের সঞ্চয় থেকে যদি এ ঋণ নেওয়া হয়, তাহলে তা কিছুতেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে না; কিন্তু যদি ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ এ ঋণের উৎস হয়, তাহলে তা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে পারে। অপরদিকে জনগণের সঞ্চয় থেকে ঋণ নিয়ে তা যদি অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে অর্থ সরবরাহ বাড়বে, কিন্তু দ্রব্য-সামগ্রী বাড়বে না। আবার ব্যাংক ঋণও যদি উৎপাদন কাজে লাগানো হয়, তাহলে অর্থের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে তা পণ্যসামগ্রী বৃদ্ধি করবে। তবে, একদিকে ব্যাংকের ঋণ, অন্যদিকে এর অনুৎপাদনশীল ব্যবহার-এ অবস্থা অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে এবং তা বর্জন না করে উপায় নেই। অপরদিকে জনগণের

www.icsbook.info

সঞ্চয় থেকে গৃহীত সরকারী ঋণ এবং এ ঋণের উৎপাদনশীল ব্যবহার সম্ভব হলে এতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটার আশংকা আদৌ থাকবে না।

২. *সুদ বাণিজ্য-চক্র ও মন্দা সৃষ্টি করে*

সুদ অর্থনীতিতে বারবার তেজীভাব ও মন্দা (Boom and Depression) সৃষ্টির মাধ্যমে এক মারাত্মক অস্থির ও অনিশ্চিত অবস্থার জন্ম দেয়। অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন যে, ঋণ প্রদানযোগ্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই সুদের হার নিরূপিত হয়। কোন দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঋণের চাহিদা কম থাকে। ফলে সুদের হারও কম থাকে। এ সময়ে উৎপাদনকারীগণ কম সুদের হারে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে এবং বেশ মুনাফা পায়। সুদের হার কম থাকার কারণে দ্রব্যমূল্য কম থাকে, দ্রব্যের চাহিদা বেশি থাকে এবং বিক্রয়ও বেশি হয়। উৎপাদনকারিগণ অধিক মুনাফা অর্জনে আশাবাদী হয়ে উঠে এবং এ সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বৃহদাকারের উৎপাদন কাজে হাত দেয়। তারা অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। ঋণের চাহিদা বেড়ে যায়। এ সুযোগে পুঁজিপতি ও ব্যাংক-মালিকগণ তাদের ঋণের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ঋণের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে সুদের হার বাড়তে থাকে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় ও দাম বেড়ে যায়। ক্রমে পণ্যসামগ্রীর দাম এত বৃদ্ধি পায় যে, উক্ত পণ্য ক্রয় করার সাধ্য আর সাধারণ ক্রেতাদের থাকে না। ক্রেতার অভাবে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয় ব্যাপকভাবে কমে যায়। উৎপাদনকারীদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অকস্মাৎ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ক্রেতার অভাবে লক্ষ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য অবিক্রীত অবস্থায় গুদামজাত হতে থাকে। এ সময়ে পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ তাদের পূর্বে দেওয়া ঋণ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। তারা সুদের হার আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ঋণের ব্যাপারে নানাবিধ কড়াকড়ি আরোপ করতে থাকে। এ অবস্থা মূলধন-বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে।

এভাবে সুদের হার বাড়ার ফলে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় আরও বেড়ে যায়। উৎপাদনে মুনাফার সম্ভাবনা লোপ পায়। বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে কমে যায়। উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। অপরদিকে উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতা কমতে থাকে। বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায় এবং অবিক্রীত পণ্যের স্তূপ জমতে থাকে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকে না, সঞ্চয়ের ইচ্ছাও বিলুপ্ত হয়। ফলে পুঁজি গঠন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে এক মারাত্মক মহামন্দায় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অর্থনীতির চরম সংকটকালে ব্যাংকার ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ঋণ নেয়া প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকার ও পুঁজিপতিগণ লোকসানের ভয়ে তাদের ঋণের সুদের হার কমিয়ে ঋণদানে এগিয়ে আসে। সুদের হার হ্রাস পাবার সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য কমে

www.icsbook.info

আসে, পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং বিনিয়োগ লাভজনক হয়। উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ফটকা কারবারীরা আবার ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বেড়ে যায়। অর্থনীতি মন্দা অবস্থা কাটিয়ে আবার তেজী হয়ে উঠে। কিন্তু এ অবস্থায় পুঁজির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকার ও পুঁজিপতিগণ আবার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। অর্থনীতি পুনরায় মন্দা অবস্থার সম্মুখীন হয়। এভাবে অর্থনীতি বারবার তেজী ও মন্দা অবস্থার মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মাইকেল রোবোথাম বলেছেন, "অর্থ সরবরাহের জন্য ঋণের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এমন এক আর্থিক পদ্ধতিতে বন্দী হয়ে পড়েছে যেখানে ঋণ ও অর্থ সরবরাহ উভয়ই দ্রুত সম্প্রসারিত হয়; আর যে ঋণ গ্রহণের জন্য অর্থনীতি বাধ্য হয়েছে সে ঋণের জন্যই অর্থনীতি শাস্তিপ্রাপ্ত তথা দুর্দশায় নিপতিত হয়। অসংখ্য অতীত ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বানিয়ে পথে বসানো হয়, বেশুমার লোককে বাড়িঘর থেকে উৎখাত ও বেদখল করা হয়, কারবারগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষকে বেকারত্বের অভিশাপের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় যতক্ষণ না মুদ্রাস্ফীতি ও অতি গরম অবস্থাকে বিপদজনক বিবেচনা করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঋণকে নিরুৎসাহিত করা হতে থাকে এবং অর্থনীতি মানুষের দুর্দশার স্থবির সাগরে রূপ নেয়। অবশ্য এ অবস্থায় পৌছার সাথে সাথে চাহিদা পড়ে যায়; সুতরাং আমাদেরকে সুদের হার হ্রাস করতে হয় এবং ভোক্তাদের আস্থা ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। সমগ্র অর্থনীতিতে আবার বাণিজ্য চক্র শুরু হয়। এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কিছুই হতে পারে না যে, আর্থিক ব্যবস্থাকে বুঝা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থনীতি চরম ও পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বিচারে গোটা অর্থনীতিকে ফাঁদে বন্দী করা, অতঃপর একে মুগুর পেটা করা ব্যতীত আধুনিক অর্থনীতি আর কিছুই করতে পারে না। কিন্তু এটা এমন এক নীতি যা অন্যায়ের দ্বার খুলে দেয় এবং সেই সাথে নৈতিক বিচ্যুতিকে উদ্বুদ্ধ করে। পরিবর্তনশীল সুদের হারের ভিত্তিতে ঋণের সুদের হার পুনঃনির্ধারণের যে অসীম ক্ষমতা অর্থায়নকারীকে দেওয়া হয়, সেই ক্ষমতাবলে অর্থায়নকারী অতি চতুরতার সাথে ঋণ-চুক্তিতে ইচ্ছামত একতরফাভাবে সুদের হার পুনঃনির্ধারণ করে নেয়।"[৫৪]

অর্থনীতি তেজী ও মন্দার আবর্তে ঘুরপাক খাবার অন্যতম কারণ সুদ। সুদ না থাকলে বা সুদের বিলোপ সাধন করা হলে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে। কম মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারার দরুন ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়বে এবং পণ্যের চাহিদাও বেড়ে যাবে। তাছাড়া সুদ না থাকলে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্য হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ বাড়বে। কর্মসংস্থান বেশি হবে এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ার সাথে সাথে ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ধিত

[৫৪] মাইকেল রোবোথামঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭, ২৮; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮।

www.icsbook.info

ক্রয়-ক্ষমতা অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি করবে। ফলে দ্রব্যসামগ্রী অবিক্রীত থাকার আশংকা তেমন থাকবে না।

৩. সুদ অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়

সুদের হার বাজারে স্থির থাকে না, বরং প্রতিনিয়তই উঠা-নামা করে। অর্থনীতি যখনই একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং পুঁজির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখনই সুদের হার বেড়ে যায়। অপরদিকে পুঁজির চাহিদা কমার সাথে সাথে সুদের হারও কমে যায়। সুদের হারের এই অস্থিরতা গোটা অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান।[৫৫] আমেরিকার অর্থনীতিতে নজীরবিহীন অস্থিরতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে মিলটন ফ্রীডম্যান সুদের হারের অনিশ্চিত উঠা-নামাকেই দায়ী করেছেন।[৫৬] বস্তুতঃ সুদের হারের অনিয়মিত চঞ্চলগতির ফলে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ, শেয়ার ও পণ্যমূল্য এবং মুদ্রা বিনিময় হারে দারুণ অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ফলে গোটা অর্থনীতিতে দেখা দেয় চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

বর্তমান বিশ্বে দু'ধরনের সুদের হার চালু রয়েছেঃ একটি হলো নির্ধারিত হার (Fixed Rate)। ঋণ গ্রহণ-প্রদানকালে এ হার নির্ধারণ করা হয় এবং ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ হার বলবৎ থাকে। ইতোমধ্যে বাজারে সুদের হার বাড়লে বা কমলে উক্ত ঋণের সুদের হারে কোন পরিবর্তন হয় না। সুদের হারের দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বলা হয় পরিবর্তনশীল সুদের হার (Floating Interest Rate). এই ব্যবস্থায় বাজারে সুদের হার বাড়লে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রেও সুদের হার বাড়ানো হয়। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার সুদের হারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

নির্ধারিত সুদের হার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী সুদের হার কিছু কমলে ঋণ নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে যাবে বলে অপেক্ষা করতে থাকে। অপরপক্ষে ঋণদাতাগণ সুদের হার বাড়লে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবে বলে তাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ বাজারে সুদের হার কমলে ঋণদাতাগণ দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসে না। ফলে এই ব্যবস্থায় কেবল স্বল্প মেয়াদী ঋণের লেনদেন ও বিনিয়োগ চলে। দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হয় না। অথচ উৎপাদনশীল সকল বিনিয়োগই দীর্ঘ মেয়াদ দাবী করে। এক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল স্বল্প মেয়াদী, তথা ফটকা কারবারে বিনিয়োগ বেশি হয়।

সুদের হার যদি পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে অর্থনীতির ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় আরও মারাত্মক। বিনিয়োগকারিগণ সুদের হারের ঘনঘন উঠা-নামার কারণে দারুণ অনিশ্চিত অবস্থায় নিপতিত হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় যদি কেউ সাহস করে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগে যায়, তাহলে সুদের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে পূর্বের ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও কারবারের

---

[৫৫] চাপরা, এম, উমর, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১১৭।

[৫৬] মিলটন ফ্রীডম্যান, *দি ইয়ো-ইয়ো ইউ.এস. ইকোনোমি*, নিউজ উইক, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ পৃঃ ৪

www.icsbook.info

ওপর আকস্মিক আঘাত পড়ে, তাদের পূর্বের চেয়ে অধিক হারে সুদ দিতে হয়; এতে কারবার থেকে প্রাপ্ত মোট আয়ে (সুদ+মুনাফা) পুঁজিপতির সুদের অংশ বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তার মুনাফার অংশ হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমে উদ্যোক্তাকে তার আসল থেকে পুঁজিপতির সুদ পরিশোধ করতে হয় এবং এক সময় কারবারে ব্যর্থ ও দেউলিয়া হয়ে পাততাড়ি গুটাতে হয়। বলা বাহুল্য যে, কারবারের এই ব্যর্থতার (Business Failure) মূল কারণ সুদ, উদ্যোক্তার অদক্ষতা বা গাফলতি এর জন্য দায়ী নয়। অথচ পুঁজিপতির সুদ ও আসল তাকেই পরিশোধ করতে হয়। কারবার ব্যর্থ হলে উদ্যোক্তার আর্থিক ক্ষতি হয়, ব্যাপার কেবল এতটুকুই নয়, বরং এর ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন ও বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ক্ষমতাও (Productive Capacity) কমে যায়। এসবের ক্ষতিপূরণ করা সময় সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্যও। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং স্থিতিশীলতার ওপর এসবের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক।[৫৭]

৪. সুদ শেয়ার-বাজারে ফটকাবাজির জন্ম দেয়

সুদের হারের অনিয়মিত ও ঘনঘন উঠা-নামা শেয়ার-বাজারে ফটকা কারবারের (Speculation) জন্ম দেয় এবং ফটকাবাজারীকে উৎসাহিত করে। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির এক বিরাট অংশ ফটকা কারবারে খাটানো হয় এবং প্রকৃত বিনিয়োগকারীরা বঞ্চিত থেকে যায়।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সাধারণতঃ দালাল (Broker) এবং ঠিকাদারদের (Jobber) মাধ্যমে শেয়ার, স্টক, সিকিউরিটি ইত্যাদি বেচাকেনা করতে হয়। এই দালালরা সুকৌশলে শেয়ার-বাজারে ফটকা (Speculation) সৃষ্টি করে।

এম, এস, রিক্স লিখেছেন যে, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারীরা এমন একটি পণ্য বেচাকেনা করে যা তারা ভোগ করতে পারে না বা তাদের কারবারে খাটাতে পারে না। এ পণ্যের ওপর তারা কোন কাজ করে না এবং এর ওপর কোন মূল্য সংযোজনও তারা করে না।[৫৮] বস্তুতঃ ফটকা কারবারীরা অগ্রিম ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে এবং ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রেতা শেয়ারের সরবরাহ দেয় না এবং ক্রেতাও সরবরাহ নেয়ার প্রয়োজনবোধ করে না। এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে দামের পার্থক্যের মাধ্যমেই তারা বিরাট অংকের মুনাফা অর্জন করে নেয়।

শেয়ার কারবারীরা সাধারণতঃ 'শর্ট বিক্রয়' (Short Sale) অথবা 'লং ক্রয়' (Long Buy) করে থাকে। শর্ট বিক্রয়কারীকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় বিয়ার (Bear)। বিয়ার যখন মনে করে যে, কোন শেয়ারের দাম খুব শীঘ্রই কমে যাবে, তখন তার কাছে থাকুক আর নাই থাকুক, সে সেই শেয়ারের বিরাট অংশ বর্তমান দামে বিক্রি করে দেয়।

---

৫৭. চাপরা, এম, উমর: পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ১১৮।

৫৮. এম, এস, রিক্স: *স্টক মার্কেট ইকোনোমিক্স*, পৃঃ ২০৪।

www.icsbook.info

পরবর্তীতে সেই শেয়ারের দাম যখন সত্যি সত্যি কমে যায়, তখন সে কম দামে শেয়ার ক্রয় করে তার ঘাটতি বিক্রয় পূরণ করে। এভাবে পরবর্তী সময়ে কম দামে ক্রয় এবং পূর্বের বেশি দামে বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে সে তার মুনাফা করে নেয়।

লং ক্রেতাকে (Long Buyer) সাধারণতঃ বলা হয় বুল (Bull)। বুল যখন মনে করে যে, কোন শেয়ারের দাম বেড়ে যাবে, তখন সে বর্তমানের কম দামে সেই শেয়ারের বিরাট অংশ কিনে নেয় এবং পরে দাম বাড়লে উক্ত শেয়ার বর্ধিত দামে বিক্রয় করে লাভ করে।

শেয়ার-বাজারে এই ফটকাবাজারীর জন্ম হয় সুদী ঋণ ব্যবস্থা এবং মার্জিনে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের (Purchase and Sale on Margin) সুযোগ থেকে। মার্জিনে ক্রয়ের বেলায় ক্রেতাকে তার ক্রীত শেয়ারের সাকুল্য দাম নগদ পরিশোধ করতে হয় না; বরং দালালের কোন লোকসান হলে, তা যাতে পূরণ করতে পারে সে জন্য শেয়ারের দামের একটা অংশ দালালের কাছে জমা রাখলেই চলে। এই জমা নগদ অর্থেও রাখা যায় অথবা গ্রহণযোগ্য কোন সিকিউরিটি হলেও চলে। ক্রীত শেয়ারের দামের বাকি অংশ দালালের পক্ষ থেকে ক্রেতাকে ধার দেওয়া হয়। দালাল সেই শেয়ারগুলো জামানত রেখে এর দামের সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ হিসেবে নিয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মার্জিনে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার দরুন ক্রেতা অল্প অর্থ জমা দিয়ে বিপুল পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করতে সক্ষম হয়। তেমনি সুদী ব্যবস্থা চালু থাকায় দালালের পক্ষে সুদী ঋণ নিয়ে বিপুল পরিমাণ শেয়ারে খাটানো সম্ভব হয়। সুতরাং একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, মার্জিনে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণের শেয়ার লেনদেন হয়, অথচ এর ফলে মোট শেয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না বা এতে অর্থনীতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটে না। এছাড়া প্রয়োজনীয় মার্জিনের হার অথবা সুদের হারে অথবা একই সাথে মার্জিন ও সুদের হারে যদি কোন পরিবর্তন হয়, তাহলে তা স্টক বাজারে নতুন করে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা বয়ে আনে। ব্যাক (Bach) বলেছেন, "If rising stock prices have been financed by borrowed money a downturn in the market may precipitate a major collapse in stock prices, as lenders call for cash, and may place serious financial pressure on banks and other lenders. A high market based on credit is thus far more vulnerable than a cash market and is more likely to be a cyclically destabilising force."[৫৯] "ঋণের অর্থ দ্বারা যদি চড়া বাজারে শেয়ার ক্রয় করা হয় তাহলে বাজার একটু কমতে শুরু করলেই তা স্টক মূল্যে ব্যাপক ধসের কারণ হতে পারে। কেননা দাম কমার সময় ঋণদাতাগণ তাদের

---

[৫৯] জি, এল, ব্যাক, *ইকোনোমিক্স ঃ এন ইনট্রোডাকশন টু এনালিসিস এন্ড পলিসি*, ১৯৭৭, পৃঃ ১৮২।

www.icsbook.info

অর্থ ফেরত দাবী করে এবং ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদাতাদের ওপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে। সুতরাং ঋণের ওপর ভিত্তিশীল চড়া বাজার নগদ ভিত্তিক বাজারের তুলনায় বেশি দুর্বল ও বিপদজনক এবং বাজারে চক্রাকারে অস্থিরতা সৃষ্টির কারণ।"

মার্জিনের হার এবং/অথবা সুদের হার হ্রাস পেলে শেয়ার-বাজার গরম হয়ে উঠে। ফটকা কারবারীরা অধিক পরিমাণে শেয়ার ক্রয় করতে শুরু করে। ব্যাংকাররাও ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে আশায়, স্বল্প মেয়াদী ফটকা শেয়ার কারবারীদের ঋণ দিতে এগিয়ে আসে; ফলে শেয়ার-বাজার আরও গরম হয়। এ সময়ে শেয়ার-বাজারে স্থিতিশীলতা বহাল করার লক্ষ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং সুদের হার ও মার্জিনের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে শেয়ারের বাজার কমে যাওয়ার আশংকায় ফটকা কারবারীরা দ্রুত তাদের শেয়ার বিক্রি করতে এগিয়ে আসে। বাজারে শেয়ারের সরবরাহ বেড়ে যায় এবং আশংকা ছড়িয়ে যাওয়ার দরুন শেয়ার-বাজারে হঠাৎ করে বিপর্যয় দেখা দেয়। রাতারাতি শেয়ারের দাম পড়ে যায়, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গোটা অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

শেয়ার-বাজারে এরূপ বিপর্যয়ের ফলে মুষ্টিমেয় কতিপয় বড় বড় ফটকা কারবারী রাতারাতি বিপুল মুনাফা করে নেয়। অপরদিকে অসংখ্য ছোট ছোট এবং নতুন কারবারী তাদের সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়। যারা ভিতরের লোক (Insiders) বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্বাহ্নে খবরাখবর (Insiders' Knowledge) পাওয়ার সুযোগ যাদের আছে, সে কারবারীরা সকল সুবিধা লুটে নিতে পারে। কিন্তু যারা ছোট এবং যারা নতুন, পূর্বাভাস পাওয়ার সুবিধা যাদের নেই, যারা কেবল গুজব এবং ঝোঁক-প্রবণতার দ্বারা তাড়িত হয়ে বেচাকেনা করে, তারাই মার খায়। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত রকওয়েল স্টাডি'তে দেখানো হয়েছে যে, "বড় ফটকাবাজরা ক্রমাগতভাবেই জয়ী হয়; আর ছোট কারবারীদের ধ্বংসের বিনিময়েই বড়রা তাদের মুনাফা লাভ করে থাকে।"[৬০] 'ব্লেয়ার স্টাডিতেও অনুরূপ মন্তব্য করে দেখানো হয়েছে যে, শেয়ার-বাজারে শতকরা ৭৫ ভাগ ফটকাবাজই লোকসান দিতে বাধ্য হয়।[৬১]

শেয়ার-বাজারে ভবিষ্যতে দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে বিপুল পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ারের দামকে অধিকতর ফাঁপিয়ে তোলা হয়; অপরদিকে ভবিষ্যতে দাম কমে যাওয়ার আশংকা থাকলে বিপুল সংখ্যক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে দামকে আরও নামিয়ে দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয়। আসলে ফটকা কারবারীর ফলেই এরূপ ঘটে। আন্দাজ-অনুমান এবং গুজব হচ্ছে ফটকা কারবারের প্রধান হাতিয়ার। কখনও কখনও ভিতরের লোক এবং স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব ছড়িয়ে দেয়, যার ওপর

---

৬০. আর, টি, টিওয়েল্‌স, সি, ভি, হ্যারলো এন্ড এইচ, এল, স্টোন: *দি কমোডিটি ফিউচার্স গেইম*, ১৯৬৫, পৃঃ ২৯৯ ও ৩০২।

৬১. উপরোক্ত, পৃঃ ২৯৬।

www.icsbook.info

ভিত্তি করে বাজারে এক একটি ঢেউ উঠে, আর সকলে ধাবিত হয় সে ঢেউয়ের পেছনে। তাছাড়া, ছল-চাতুরী এবং কারচুপিও শেয়ার-বাজারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে মার্চেন্ড সেজ-এর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "Intrigues, lethal competition, tense lunch-time deals, high stake gambles, the subterfuges, cover-ups, and huge payoffs that make Wall Street the greatest playground in the world[৬২] "গোপন ষড়যন্ত্র, গলা কাটা প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্ন ভোজকালে তীব্র উত্তেজনাকর লেনদেন, হার-জিতের মারাত্মক ঝুঁকি বহুল বাজি-জুয়া, এড়িয়ে যাবার কৌশল, ছল-চাতুরী, অতি মাত্রায় প্রতিশোধ স্পৃহা এবং বিপুল দেনা পরিশোধ এসব মিলে ওয়ালস্ট্রীটকে বিশ্বের বৃহত্তম লীলা মঞ্চে পরিণত করেছে।" এলান লেকনার এ সম্পর্কে লিখেছেন, "There are, "Safeguards against such rigging but they don't work", because, " Wall Street plays its games seriously, sometimes so well that neither you nor I–nor, seemingly, the Securities Exchange Commission–knows who is in there playing[৬৩] "এ কারচুপির বিরুদ্ধে প্রতিকার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো সবই অচল। কারণ, ওয়ালস্ট্রীট তার খেলা গুরুতরভাবেই খেলে, কখনও কখনও এত চাতুর্যের সাথে খেলে যে আমি, তুমি এবং আপাতদৃষ্টিতে যতদূর মনে হয়, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনও জানে না এই খেলা কে খেলছে।"

বর্তমান সুদী বিশ্বে ফটকাবাজারীর দরুন সৃষ্ট শেয়ার-বাজারের অস্থিরতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে রয়েছে। শেয়ার-বাজারে বিপর্যয় ঘটেছে বারবার। তবে এই বিপর্যয় সবচেয়ে বেশি মারাত্মক ও ব্যাপক রূপ নেয় একবার ১৯২৯ সালের ২৮শে অক্টোবর এবং আর একবার ১৯৮৭ সালের ১৯শে অক্টোবর। ঘটনাক্রমে ২৮শে অক্টোবর, ১৯২৯ সাল দিনটি ছিল সোমবার এবং ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৭ সালও ছিল সোমবার। মূলধন বাজারে এ দুটো দিনই 'কালো সোমবার' (Black Monday) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শেয়ার-বাজারে প্রথম ঐতিহাসিক ধস নামে ১৯২৯ সালের ২৮শে অক্টোবর। সেদিন নিউইয়র্কের বাজারে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় শতকরা ১২ ভাগ। এ সময়ে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী মহামন্দা ও দুর্ভিক্ষের চিত্র আজও বিশ্ববাসীর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে আছে। অতঃপর ১৯৮৭ সালের কালো সোমবারে নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীটে শেয়ারের মূল্য এক লাফে নেমে যায় ২২.৬ শতাংশ। টোকিওর বাজারে শেয়ারের দাম হ্রাস পায় ২৫ শতাংশ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, সর্বত্রই সেদিন শেয়ার-

---

৬২. মার্চেন্ড সেজ: *স্ট্রীট ফাইটিং এট ওয়াল এন্ড ব্রডঃ এন ইনসাইডার্স টেইল অব স্টক মেনিপুলেশন*, ১৯৮০।

৬৩. এলান লেকনার, *স্ট্রীট গেইমসঃ ইনসাইড স্টোরিজ অব দি ওয়াল স্ট্রীট হাস্টল*, পৃঃ ১০৪ ও ৮৪।

www.icsbook.info

বাজারে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং বিশ্বব্যাপী মারাত্মক অর্থ সংকটে রূপ নেয়। ১৯ ও ২০ শে অক্টোবর, দুদিনে ওয়াল স্ট্রীটে সর্বকালীন রেকর্ড ভঙ্গ করে ২৩০ লাখ শেয়ার বিক্রয় করা হয়। এতে ওয়াল স্ট্রীটের শেয়ার কারবারীদের লোকসান হয় কোটি কোটি ডলার। কথিত আছে, একজন শেয়ার বিনিয়োগকারী তার বিপুল অংকের লোকসানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে প্রথমে তার দালালকে গুলী করে হত্যা করে এবং পরে নিজেও আত্মহত্যা করে। লন্ডনে এই দু'দিনে বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় আট হাজার কোটি ডলার। ফলে জনগণ কাগুজে টাকার ওপর আস্থা হারিয়ে সোনা আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হয়।

বর্তমান বিশ্ব ছোট হয়ে এসেছে। আজকের দিনে নিউইয়র্ক বা লন্ডনের বাজারে কিছু ঘটলে অতি অল্প সময়েই তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াল স্ট্রীটের বাজারে ৮৭তে যে ধস নামে, বিশ্বের প্রায় সকল দেশের অর্থনীতিতেই তার আঘাত লেগেছে। অনেক দেশ এখনও সেই মহামন্দার ধকল কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি।

১৯৮৭ সালের সেই কালো সোমবারের বিপর্যয়ের পর বিদেশের বাজারে মার্কিন পণ্যের দাম কমে যেতে থাকে। এর ফলে বিদেশের বাজার ঠিক রাখা এবং নতুন নতুন দেশে পণ্য বিক্রি করার জন্য মার্কিনী পণ্যের দাম কমিয়ে দিতে হয়। এ জন্য আবার উৎপাদন ব্যয় কমানোর প্রয়োজন হয়, যার ফলে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ডিভিডেন্ডের হার কমানোর প্রয়োজন দেখা দেয়।

শেয়ারের দাম পড়ে যাওয়ায় বড় রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় শিল্প কারখানায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের ঝুঁকির তুলনায় শেয়ার-বাজারে সস্তায় শেয়ার কেনা যায় বিধায় এসময়ে নতুন বিনিয়োগ কমে যায় এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধির হারও কম হয়।

শেয়ার-বাজারে ধস নামার কারণ ব্যাখ্যা করে অর্থনীতিবিদগণ উচ্চ সুদের হারকে দায়ী করেছেন। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির অধ্যাপক লেস্টার সি থারোর মতে, শেয়ার-বাজারে ধস নামার প্রধান কারণ চড়া সুদের হার। ১৯৮৭ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকায় সুদের হার প্রায় ১০ ভাগ চড়ে যায়। ফলে ১০ ডলারের বন্ডে যেখানে আয় হয় এক ডলার, সেখানে ২০ ডলারের শেয়ারে লভ্যাংশ পাওয়া যায় এক ডলারের বেশি নয়। তাছাড়া শেয়ারে লভ্যাংশ পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। তাই বিনিয়োগকারীদের সুদ-প্রীতি মনোভাবের দরুন শেয়ার-বাজারে ভূকম্পন শুরু হয়।

সুদ প্রথা বিলোপ করা হলে শেয়ার-বাজারে ফটকা কারবার অবশ্যই কমে আসবে এবং প্রকৃত বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা পাবে। সুদের অনুপস্থিতিতে ব্যাংক এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানকে কারবারে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান যখন দেখবে যে, ফটকা কারবারে অর্থ খাটালে লাভ তো দূরের কথা আসলও

www.icsbook.info

খোয়া যেতে পারে, তখন এরা শেয়ার জামানত রেখে ঋণ দিতে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ফটকা কারবারে বিনিয়োগের জন্য ঋণের পরিমাণ কমে যাবে। ফলে মার্জিনের ভিত্তিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ও হ্রাস পাবে এবং ফটকা কারবার নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে। এ ব্যাপারে লারগে মন্তব্য করেছেন, "The empirical results support the priori hypothesis that banning the use of credit for transactions in individual issues is associated with a cooling off of speculative activity in these stocks."[৬৪] "গবেষণামূলক তথ্য একথাই (Priori hypothesis) প্রমাণ করে যে স্টক ক্রয়-বিক্রয়ে ঋণের ব্যবহার বন্ধ করার সাথে স্টক বাজারে ফটকাবাজি স্তিমিত হয়ে আসা ধনাত্মক সম্পর্কে বাধা রয়েছে।"

৫. সুদ পণ্য বাজারে ফটকা কারবারকে প্ররোচিত করে

সুদের হারের অস্থিরতা শেয়ার-বাজারে যে ফটকা কারবারের সৃষ্টি করে, তার প্রতিক্রিয়া পণ্য-বাজারকেও প্রভাবিত করে। সুদের হার কমলে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ফটকা কারবারের জন্য ঋণ দেয়। আর ফটকাবাজারীরা কম সুদের হারে ঋণ নিয়ে একদিকে বেশি করে শেয়ার ক্রয় করে, অন্যদিকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে মওজুদ করে রাখে। বাজারে দ্রব্য-পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয় এবং পণ্যের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। সেই সাথে আর্থিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে সুদের হার আবার বাড়ানো হয়। এতে দ্রব্যমূল্য আরও এক ধাপ চড়ে যায়। ফটকা কারবারীরা এই সুযোগের অপেক্ষায়ই থাকে এবং সুযোগ আসার সাথে সাথে তাদের মওজুদকৃত পণ্য উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়।

সুদ না থাকলে শেয়ার-বাজারে ফটকা কারবার নিম্নতম স্তরে নেমে আসবে এবং পণ্য-বাজারেও তার সুফল দেখা দেবে। তাছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে বিধায় বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সুদী অর্থনীতির ন্যায় অনিশ্চয়তা থাকবে না। উৎপাদনশীল বিনিয়োগের গতি সর্বদাই অব্যাহত থাকবে, পণ্যের উৎপাদন বাড়তে থাকবে এবং দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে।

৬. সুদের হার মুদ্রানীতিকে বিকল করে দেয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, দ্রব্যমূল্যকে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে আনা এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বহাল করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি চালু করে থাকে। কিন্তু সুদ এই মুদ্রানীতির কার্যকারিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ সুদের হারের বর্তমানে

---

[৬৪] চাপরা, এম, উমরঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

www.icsbook.info

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার প্রয়াস পায় এবং ব্যাংক হার (Bank Rate) বা বিধিবদ্ধ জমার হার (Statutory Reserve Ratio) বাড়িয়ে দেয়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের সুদের হার বৃদ্ধি করে। ফলে দেশে বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সুদের হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সুদের হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে যায়, তাহলে ফটকামূলক কারবারে ঋণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে; দ্রব্যসামগ্রীর দাম জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনশীল বিনিয়োগ না হওয়ায় দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মুদ্রার পরিমাণের ওপর এর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ড. উমর চাপরা তাই যথার্থই লিখেছেন, "The central bank can either control the rates of interest or the stock of money..... Experience has indicated that it is impossible to regulate both in such a balanced manner that inflation is checked without hurting investment".[৬৫] "কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অথবা কেবল মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে.....। অভিজ্ঞতা বলে যে, একই সাথে সুদের হার ও মুদ্রার পরিমাণ এমন ভারসাম্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব যাতে বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়াই মুদ্রাস্ফীতি সংযত থাকবে।" তাছাড়া সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে যা অর্থনীতিকে বাণিজ্য চক্রের উত্থাল-পাথালের মধ্যে খাবি খাওয়াতে থাকে। এ প্রসঙ্গে মাইকেল রোবোথাম বলেছেন, বস্তুতঃ এই পদ্ধতি হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল, একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু এই পদ্ধতিতে নতুন ঋণ ঠেকানোর লক্ষ্যে সুদের হার বাড়ানো হলে পূর্বের ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি ও কারবারের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে পড়ে, তাদের পূর্বের ঋণের ওপর অধিক হারে সুদ প্রদানে বাধ্য হতে হয়। এটি একটি বড় অবিচার ও জুলুম; কিন্তু সে অনুভূতি আজ হারিয়ে গেছে: ধর্মীয় প্রত্যয়ের মত এই আদর্শের চার পাশে পরিব্যাপ্ত কট্টর বিশ্বাসের মধ্যে তা বিলীন হয়ে গেছে।....

ব্যাংক, মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতি নিশ্চয়ই কাজ করে। তবে তা সেইভাবে কাজ করে যে ভাবে মুরগীর রোস্ট কাটার ক্ষেত্রে একটা স্লেজ হাতুড়ি (Sledge Hammer) কাজ করে। ... নির্বিচারে গোটা অর্থনীতিকে ফাঁদে বন্দী করা, অতঃপর একে মুগুর পেটা করা ব্যতীত আধুনিক অর্থনীতি আর কিছুই করতে পারে না।"[৬৬]

---

৬৫. চাপরা, এম, উমরঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

৬৬. মাইকেল রোবোথামঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭-২৮; উদ্ধৃত, তকি উসমানী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৭।

www.icsbook.info

৭. সুদ বিনিময় হারকে অস্থির করে তোলে

সুদের হারের ঘনঘন উঠা-নামা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের সকল প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেয়। যদি ফিক্সড প্যারিটি পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সুদের হার বাড়লে বর্ধিত সুদ পাবার আশায় বিদেশ থেকে গরম অর্থ (Hot Money) দেশে প্রবেশ করে। অপরদিকে সুদের হার কমলে দেশের অর্থ বাইরে চলে যায়। এমতাবস্থায় নির্ধারিত বিনিময় হার ঠিক রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে উল্লেখযোগ্য লোকসান দিতে হয়। ফলে নির্ধারিত বিনিময় হার বহাল রাখা সম্ভব হয় না।[৬৭]

অপরদিকে বিনিময় হার যদি পরিবর্তনশীল (floating rate) হয়, তাহলে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সমতার ভিত্তিতে বাজারে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুদের হারের উঠা-নামা এবং ফটকা কারবারের প্রভাবে উক্ত হার প্রতিনিয়তই উঠা-নামা করতে থাকে। দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থার সাথে এ হারের সংগতি থাকে না।

এই অবস্থায় ভবিষ্যত বিনিময় হার সম্পর্কে ধারণা করা দুরূহ হয়ে উঠে এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ ও উৎপাদন পরিকল্পনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতির যে সব খাতে প্রতিযোগিতা খুব তীব্র এবং মুনাফার হার কম, সেসব খাতে এর প্রতিক্রিয়া হয় অধিকতর বিরূপ। এছাড়া মন্দায় (Depression) নিপতিত দেশের জন্য অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। মন্দা কাটিয়ে উঠা এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যদি সুদের হার কমানো হয়, তাহলে দেশের অর্থ অধিক সুদ পাবার লোভে বাইরে চলে যায়, দেশীয় মুদ্রার মান হ্রাস পায় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়। পরিস্থিতি এতই নাজুক হয়ে পড়ে যে, সুদের হার না বাড়ালে অর্থের বহির্গমন ঠেকানো ও মুদ্রার মান বহাল রাখা যায় না; অন্যদিকে সুদের হার না কমালে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতি ফিরে আসে না, মন্দা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয় না। এই দুই বিপরীতধর্মী সমস্যার মুকাবিলায় সরকারকে প্রথমে মুদ্রার মান বহাল রাখার দিকেই নজর দিতে হয় এবং সুদের হার ঊর্ধে রাখতে হয়। এই পদক্ষেপ মন্দা থেকে উত্তরণের গতিকে মন্থর করে দেয় এবং মন্দাকে দীর্ঘায়িত করে। জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। বস্তুতঃ সুদের হারের উঠা-নামা বিনিময় হারে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশকে অধিকতর অনিশ্চিত করে তোলে; বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পুঁজি গঠনকে নিরুৎসাহিত করে এবং সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনকে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক পথে পরিচালিত করে।[৬৮]

---

৬৭. চাপরা, এম, উমর: প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০।
৬৮. উপরোক্ত, পৃঃ ১২১।

www.icsbook.info

৮. সুদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে

সুদী অর্থনীতিতে উদ্যোক্তাকে, কারবারে লাভ বা লোকসান যাই হোক, প্রথমে সুদ পরিশোধ করতেই হয়। এরপর আবার যদি সুদের হার পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে সুদের হার বেড়ে গেলে তাকে আরও অধিক সুদ দিতে হয়। সুতরাং সুদের হার পরিবর্তনশীল হলে উদ্যোক্তাকে দুধরনের ঝুঁকি সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করতে হয়। প্রথমত, সে যে পণ্য উৎপাদন করবে সে পণ্যের বাঞ্ছিত দাম বাজারে থাকবে কিনা। দ্বিতীয়ত, সুদের হার বেড়ে গিয়ে তার মুনাফা কমিয়ে দেবে কিনা। বস্তুতঃ সুদের হার বৃদ্ধি হলেই উদ্যোক্তার প্রাপ্য মুনাফা হ্রাস পায়; অভ্যন্তরীণ নগদ অর্থের প্রবাহ (Internal cash flow) কমে যায় এবং তারল্য ঘাটতি দেখা দেয়। উদ্যোক্তাকে অধিক সুদের হারে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হতে হয়। অধিক হারে সুদ প্রদান মুনাফাকে আরও সংকুচিত ও নিঃশেষ করে দেয় এবং ক্রমে কারবার দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এই অবস্থা দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের পরিবেশকে দূষিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে রুদ্ধ করে দেয়।

সুদের হার কমে গেলেও অবস্থা উন্নতির দিকে যায় না, বরং তা ভিন্নতর পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুদের হার কমলে সঞ্চয়কারীগণ বঞ্চিত হয়, ভোগ্য ব্যয় উৎসাহিত হয়, ফটকাবাজারী বৃদ্ধি পায় এবং অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ বেড়ে যায়। স্বল্প সুদের হার অকল্যাণকর খাতে ঋণ সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে ফাঁপিয়ে তোলে এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।

সুতরাং উদ্যোক্তা, পুঁজিপতি, সঞ্চয়কারী এবং ভোক্তা সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রবৃদ্ধির গতিকে এগিয়ে নেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সুদ বিলোপ এবং লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা চালু করা।[৬৯]

সুদের অর্থনৈতিক কুফল আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সুদ পুঁজিবাদী শোষণ, বৈষম্য ও জুলুমের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। সুদ অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়, বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং ফটকা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সুদের হার শূন্য না হওয়া পর্যন্ত এসব কুফল থেকে পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই।

ঘ) ভোগের ওপর সুদের প্রভাব

১. সুদ ভোক্তাদের অভাব অপূর্ণ রাখতে বাধ্য করে

পূর্বেই বলা হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের আকারে সুদ আসলে ভোক্তা জনগণের নিকট থেকেই আদায় করা হয়। ফলে ভোক্তাদের ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে জনগণ অতি প্রয়োজনীয় অভাবও অপূর্ণ রাখতে বাধ্য হয়। অর্থনীতিতে

---

৬৯. উপরোক্ত, পৃঃ ১২৪।

www.icsbook.info

এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, 'শার্টের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্রয়-ক্ষমতার অভাবে শার্ট ক্রয় করে পিঠ আবৃত করা সম্ভব হয় না।

২. সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে

পূর্বেই বলা হয়েছে, অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ সুদ। বস্তুতঃ বহুগুণ ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা বলে ৯০ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি ব্যাংকগুলোই সৃষ্টি করছে। ফলে একদিকে ক্রয়-ক্ষমতার অভাব ও ব্যাপক বেকারত্ব অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের আকাশচুম্বী অবস্থান এসব মিলে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

৩. সুদ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করার সুযোগ করে দেয়

সুদী ব্যবস্থায় সুদ প্রদানে রাজি হলেই ঋণ পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে সুদী ঋণপ্রাপ্তিকে আরও সহজ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ, ক্রেডিট কার্ড, ই-কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদির মাধ্যমে ঋণকে প্রত্যেক ভোক্তার হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করার নীতি বাক্য ভুলে গেছে এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঋণ নিয়ে আয়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ব্যয় করার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

৪. সুদ অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসিতামূলক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়

একদিকে সহজলভ্য ঋণ অন্যদিকে নানারূপ আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাকর বিজ্ঞাপন জনসাধারণকে কেবল বাহুল্য ব্যয় নয় বরং নৈতিকতা পরিপন্থী ব্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

৫. সুদ ভোক্তাদেরকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে সাধারণ মানুষ ক্রমে সুদ ও ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বস্তুতঃ সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণকারী ভোক্তা জনসাধারণ দুইভাবে সুদ প্রদানে বাধ্য হচ্ছে। একবার তাদেরকে গৃহীত ঋণের ওপর ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ করতে হয়, আবার সেই ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রীত পণ্য-সামগ্রীর দামের সাথে সুদ প্রদান করতে হয়। ফলে একদিকে ঋণের অর্থ পুরোপুরি ভোগ করা তাদের ভাগ্যে জুটছে না; অপরদিকে, ঋণের বোঝা ক্রমেই বড় হচ্ছে। এ ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসা আর কখনই সম্ভব হয় না।

www.icsbook.info

তৃতীয় অধ্যায়

সুদের রাজনৈতিক কুফল

ইতোপূর্বে সুদের নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে সুদের রাজনৈতিক কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

১. সুদ রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে

অনেক সময় লাভজনক কাজে লাগাবার জন্য সরকার নিজ দেশের জনগণ এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মূলতঃ সরকারের এ ধরনের ঋণ এবং ব্যবসায়ী ও কারবার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্যিক ঋণের মধ্যে প্রকৃতিগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। নির্ধারিত সুদের হারের ফলে বেসরকারী বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবসায়িক ঋণেও অনুরূপ কুফল দেখা দেয়। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এসব ঋণের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমান সঠিক হয় না। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ধার্যকৃত সুদের হারের চেয়ে বেশি হওয়া তো দূরের কথা, সুদের হারের সমানও হয় না। ফলে সরকারের পক্ষে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। সরকারকে নতুন ঋণ গ্রহণ করে তার দ্বারা পুরাতন ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ করতে হয়। নতুনভাবে বিভিন্ন লাভজনক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। জাতির ঋণের বোঝা বছর বছর বাড়তে থাকে এবং বিভিন্নমুখী বিনিয়োগের অভাবে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি নানা ধরনের রাজনৈতিক জটিলতা, অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনগণের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার ফলে জনমনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠে এবং সরকার ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। বিভিন্ন পেশা ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকে নানাবিধ দাবী-দাওয়ার শ্লোগান উত্থিত হয়। ক্রমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং অবশেষে একের পর এক রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও পট পরিবর্তনের পালা চলতে থাকে। পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক সময় দেশের বহু মানুষ ও বিপুল সম্পদ ধ্বংস হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার কোন সমাধান হয় না বরং কখনও কখনও সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয় মাত্র।

সুদ না থাকলে উক্ত রূপ অবস্থা হবার আশংকা তেমন থাকবে না। কারণ, সুদের অবর্তমানে অন্যান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় সরকারও দেশের ধনশালী লোক এবং ঋণদানকারী

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অংশীদারীর ভিত্তিতে পুঁজি গ্রহণ করতে পারবে। আর এ ধরনের অংশীদারী পুঁজি বিনিয়োগ করে লাভ কম হলে সরকার অংশীদারকে সেই কম মুনাফার অংশই প্রদান করবে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কোন পূর্বনির্ধারিত অংক ঋণদাতাকে দিতে হবে না। যদি বিনিয়োগে লোকসান হয়, তাহলে সে লোকসানের ভাগও সরকার এবং ঋণদাতা উভয়ে মিলেই বহন করবে। সুদী ব্যবস্থার ন্যায় পূর্বনির্ধারিত সুদ এবং সম্পূর্ণ আসল ফেরত দিতে গিয়ে নতুন ঋণে জড়িয়ে পড়তে সরকার বাধ্য হবে না। ফলে সুদী অর্থনীতিতে যেমন বছর বছর সরকারের ঋণের বোঝা বেড়ে যায়, সুদমুক্ত অর্থনীতিতে তা কখনও হবে না। তাছাড়া পুরাতন ঋণের সুদ পরিশোধ করতে নতুন ঋণকেও নিঃশেষ করতে হবে না। এক কাজে ব্যর্থ হলে বা লোকসান দিলে নতুন ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্নমুখী বিনিয়োগে যাওয়ার পথে সুদরূপী বাধা থাকবে না। সরকারের পক্ষে নতুন নতুন বিনিয়োগ সহজতর হবে এবং অর্থনীতি স্বচ্ছন্দ গতিতে সামনে চলতে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার আশংকা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

২. সুদ সমাজকল্যাণধর্মী কাজে বাধা সৃষ্টি করে

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই সমাজকল্যাণমূলক কিছু কাজ থাকে। এসব কাজ করা কেবল প্রয়োজনই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্যও। বিশেষ করে, আধুনিক সমাজে এসব সমাজকল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়ছে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রামীণ এলাকায় পথ-ঘাট নির্মাণ, আলো ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানির জন্যে গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসানো, অনুর্বর জমিকে উর্বর করা, গরীব ও স্বল্প বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ, দরিদ্র সাধারণ মানুষের সন্তানসন্ততির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এসব কাজের সামাজিক গুরুত্বের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে দেখতে গেলে এসব কাজ থেকে আর্থিক আয় পাওয়া সম্ভব নয়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্য হওয়াও উচিত নয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই এসব কাজ করতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এত অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় যে, সরকারের নিজস্ব আয় থেকে এত অর্থ জোগান দেওয়া সম্ভব নয়, বিশেষ করে, দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশের সরকারের পক্ষে তো নয়ই।

কোন সরকার যদি একান্ত বাধ্য হয়ে সুদী ঋণের দ্বারা এরূপ অলাভজনক সমাজকল্যাণধর্মী কোন কাজে হাত দেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, সরকার এ পর্যায়ের যাবতীয় সুদের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় বা চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আসল ঋণ ও তার সুদ পরিশোধ করার জন্য সরকার ট্যাক্স আরোপ করে প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ ও সুদের টাকা বের করে নেয়। বছরের পর বছর ধরে সরকার এভাবে জনগণের পকেট থেকে টাকা নিয়ে পুঁজিপতিদের সুদ পরিশোধ করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, সরকার ১৯৮৯ সালে সুদী ঋণের সাহায্যে পাঁচ কোটি টাকার একটি সেচ প্রকল্প কার্যকর করল। যদি সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৬.০০ টাকাও হয়,

www.icsbook.info

তাহলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সরকারকে প্রতিবছর ৩০ লাখ টাকা সুদ দিতে হবে, আর জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে এ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। যেসব চাষী এ সেচ প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করবে, সরকার তাদের ওপর সেচকর আরোপ করবে। এই করের সাথে সুদের অংশও যোগ করা হবে। চাষীও এ পর্যায়ের কর এবং সুদের অংশ নিজের পকেট থেকে পরিশোধ করবে না, বরং সে তার উৎপাদিত ফসলের দামের সাথে সুদ যোগ করে ভোক্তাদের কাছ থেকে এ অর্থ উসূল করবে। এরূপে পরোক্ষভাবে যারা শস্য ব্যবহার করবে, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এ সুদ আদায় করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দারিদ্র্য-পীড়িত ও অনাহার-ক্লিষ্ট লোকের ভাতের থালা থেকে কমপক্ষে কয়েকটি করে ভাত কেড়ে নেয়া হবে এবং তা একত্রিত করে এই ঋণদাতা পুঁজিপতির বিরাট উদরে ঢেলে দেয়া হবে। এভাবে উক্ত ঋণ আদায় করতে যদি ৫০ বছরও লেগে যায়, তাহলেও সরকারকে এ দীর্ঘকাল ধরেই গরীবদের নিকট থেকে এক পয়সা-দু'পয়সা করে চাঁদা সংগ্রহ করে ধনী পুঁজিপতির পকেট ভারী করার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। ঋণের ওপর সুদ দিতে হয় বলে এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে সুদ দেয়ার মত আর্থিক আয় পাওয়া যায় না বলে সরকার সুদী ঋণের সাহায্যে এসব কাজ করতে আগ্রহী হয় না; আর যদিও বা কখনও এ কাজে হাত দেয়, তাহলে জনগণের ওপর কর আরোপ করে সে সুদের অর্থ আদায় করতে সরকার বাধ্য হয়। আর এ কর দ্রব্যমূল্য বাড়ায় এবং জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধির কারণ হয়।

এরূপ কর আরোপ করার ফলে সরকার অনেক সময়ই বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়, জনপ্রিয়তা হারায় অথবা কখনও কখনও গণ-অসন্তোষের মুখে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ব্যর্থও হতে পারে। তাই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এসব কাজের জন্য সরকারকে সাহায্য, অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারও দয়া হলে সাহায্য, অনুদান ও সুদমুক্ত ঋণ পাওয়া যায় এবং এসব কাজ করা হয় অন্যথায় এসব কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। এভাবে সুদের হার অলাভজনক বা কম মুনাফাকর অথচ অত্যধিক সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সমাজকে যদি সুদমুক্ত ছাঁচে গড়ে তোলা হয়, তাহলে সরকার পূর্বনির্ধারিত সুদ হতে মুক্ত এবং মুনাফায় অংশীদারীর ভিত্তিতে পুঁজি পাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে লাভজনক কাজে বিনিয়োগে অনাগ্রহী হবার কোন কারণ থাকবে না। তবে অতি কম মুনাফা বা মুনাফাহীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় অর্থ সংস্থান করতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের তলবী আমানতের ওপর মুনাফা দিতে হয় না বিধায় এর একটা অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারকে প্রদান করা হলে সমস্যা অপসারিত হতে পারে।

৩. জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণ পাওয়া যায় না

অনেক সময় সরকারকে জাতীয় জরুরী প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। এসব কাজে আর্থিক মুনাফার প্রশ্ন তো থাকেই না, বরং অনেক সময় বিপুল পরিমাণ অর্থ

www.icsbook.info

কেবল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সুদী সমাজের এমনই ব্যবস্থা যে, যুদ্ধের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য, যেখানে কেবল অর্থ ব্যয়ই করতে হয়, পুঁজিপতিগণ সুদমুক্ত ঋণ দিতে রাজি হয় না। পুঁজিপতিদের এহেন আচরণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সমাজ যে পুঁজিপতির জন্ম দিয়েছে, যাকে লালন-পালন করেছে, যাকে অর্থোপার্জনের যোগ্য বানিয়েছে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে, সর্বোপরি শান্তিতে বসবাস করা ও কাজ-কারবার চালাবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিরন্তর যার সেবা করে যাচ্ছে, সেই সমাজের বিপদ মুহূর্তে সেই পুঁজিপতিই আর্থিক লাভ বিমুক্ত কাজে সুদহীন ঋণ দিতে রাজি হচ্ছে না। অথচ সমাজের এসব প্রয়োজন পূরণ হবার সাথে সেই পুঁজিপতিদের নিজেদের স্বার্থও জড়িত রয়েছে। পুঁজিপতি যেন তার প্রতিপালনকারী সমাজকে বলছে, "তুমি ঐ অর্থের সাহায্যে মুনাফা কর বা না কর, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি আমার দেওয়া অর্থের ওপর বিশেষ পরিমাণ সুদ অবশ্যই নিতে থাকব।" যুদ্ধের সময় জাতি যে অর্থ ব্যয় করে তা আসলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। মুনাফা তো দূরের কথা, আসলও সেখানে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যুদ্ধে সফলকাম হলে, বিপুল সম্পদ ও প্রাণের বিনিময়ে জাতি রক্ষা পায়, তার সাথে জাতির পুঁজিপতিরাও বেঁচে যায়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হলে বিপুল যুদ্ধ ব্যয়ের সাথে সাথে গোটা জাতিই ধ্বংস হয় বা পরাধীন হয়ে পড়ে, যা থেকে পুঁজিপতিরাও বাদ যায় না। জাতির এহেন জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে জাতির অন্যান্য লোকেরা নিজেদের ধন-প্রাণ-সময় ও শ্রম সব কিছু ঢেলে দিয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। তাদের কেউ এ প্রশ্ন উঠায় না যে, তাদের এ ভূমিকা ও ত্যাগের জন্য তারা বার্ষিক কত হারে মুনাফা পাবে। কিন্তু পুঁজিপতিদের কথা আলাদা। জাতীয় এমন দুর্যোগ মুহূর্তে, যার সাথে তাদের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নও জড়িত, পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদ দেবার পূর্বে এ শর্ত আরোপ করে যে, যত দিন জাতি তাদের এ ঋণ পরিশোধ করতে না পারবে, ততদিন প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ তাদের দিতে হবে। এতে যদি শত বছরও লেগে যায়, তাতেও তাদের দাবীর নড়চড় হবে না। বলা বাহুল্য যে, পুঁজিপতিদের থেকে গৃহীত ঋণের সাকল্য অর্থই যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুড়িয়ে নিঃশেষ করার পরই জাতি কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। এ যুদ্ধে কত লোক তাদের হাত-পা খুইয়েছে, কত লোক তাদের বাপ, ভাই ও স্বামীকে হারিয়েছে, এদের কেউ আর তাদের হারানো ধন ফিরে পাবে না। কিন্তু পুঁজিপতিরা তাদের ভস্ম করে দেওয়া অর্থ তো ফেরত পাবেই, তার সাথে বছর বছর সুদও তাদের দিতে হবে। আর সরকারকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত জনগণের কাছ থেকেই আসল ও সুদের অর্থ সংগ্রহ করে দিতে হবে। এমনকি, হাত-পা খোয়ানো এবং বাপ-ভাই ও স্বামীহারা লোকেরাও এ সুদ সংগ্রহের আওতা থেকে বাদ পড়বে না। আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) তাঁর সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত দুটি বাস্তব ঘটনা পেশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সে ঘটনা দুটো এখানে তুলে ধরা হলোঃ

www.icsbook.info

"আজ থেকে সোয়াশ বছর আগে তৎকালীন ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সে যুদ্ধে ইংরেজ পুঁজিপতিরা যে যুদ্ধ-ঋণ দিয়েছিল আজও ইংরেজরা তার সুদ পরিশোধ করে যাচ্ছে।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আমেরিকার। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তার ব্যয় বাবদ যে ঋণ করা হয়েছিল, এ যাবত আমেরিকার অধিবাসীগণ সুদ হিসেবে সে ঋণের চারগুণ অর্থ পরিশোধ করেছে। কিন্তু ঋণ এখনও রয়ে গেছে এবং এখনও তাদেরকে আরও একশ কোটি ডলার সুদ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।[১]

সুদমুক্ত অর্থনীতিতে অবস্থা অবশ্যই ভিন্নতর হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমানকালে সংঘটিত যুদ্ধের অধিকাংশই দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য সুদের ভিত্তিতে সহজে ঋণ পাওয়ার কারণে কায়েমী স্বার্থ ভবিষ্যত চিন্তা না করেই এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সুদ রহিত করা হলে এরূপ ঋণ পাওয়া যাবে না। যে কোন সরকারকে তখন যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য জনগণের ওপর কর আরোপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আর এভাবে সংগৃহীত অর্থে ব্যয় সংকুলান না হলে জনগণের বিত্তশালী অংশের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হবে। অতঃপর যুদ্ধ শেষে কয়েক বছর পর্যন্ত অল্প অল্প করে কর আদায় করে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। দেশের পুঁজিপতি ও ধনী ব্যবসায়ীদের পক্ষে সরকারকে বিনা লাভে এ ধরনের বাধ্যতামূলক যুদ্ধ-ঋণ প্রদান করার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, যুদ্ধের সময় অন্যান্য নাগরিকগণ অকাতরে তাদের আরাম-আয়েশ পরিহার করে জাতিকে রক্ষা করার কাজে লেগে যায়; অনেকে তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে দান করে এবং অনেকে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় ধনীগণ জাতি ও দেশের জন্য নিজেদের সম্পদের কল্পিত মুনাফাটুকু ছাড়তে না পারার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া যুদ্ধের সময়ে পণ্য-সামগ্রীর চাহিদা ও দাম বৃদ্ধির ফলে ধনিক শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অতিরিক্ত মুনাফা পায়, তার দ্বারা ঐ ত্যাগের বেশকিছু ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। সর্বোপরি, ধনীরা সরকারকে ঋণ হিসেবে যে অর্থ দেয়, তার ওপর সরকার সাধারণতঃ আয়কর ধার্য করে না। এতেও সুদমুক্ত ঋণ দানের ত্যাগজনিত ক্ষতি পুষিয়ে যায়।

সুদ রহিত করা হলে এবং উল্লেখিত ব্যবস্থার মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা চালু হলে, যুগের পর যুগ ধরে কেবল সুদের বোঝা বয়ে চলার গ্লানি থেকে জাতি মুক্তি লাভ করবে এবং মাত্র কয়েক বছর কিছুটা বাড়তি কর দিয়ে সাকুল্য ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় লাভ হবে, বিশ্বে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং সামরিক খাতে বাহুল্য ব্যয়ও অনেকাংশে কমে আসবে। ড. উমর চাপরা এ

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

www.icsbook.info

দিকটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, "Present-day wars are at times the product of external or internal vested interests and the discipline of not financing them through the easy resort to the interest based public debt method should help eliminate unnecessary wars. It would also minimise the wasteful defence build-up which is made possible in both the industrial and developing countries by the easy availability of borrowed funds. The drying up of this source of finance should force nations to explore more seriously all the possible ways of peaceful co-existence."[২] "বর্তমানকালে যুদ্ধ হচ্ছে বাইরের অথবা ভেতরের কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি। সরকার কর্তৃক অতি সহজেই সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ ব্যয় সংকুলান করার ব্যবস্থা বন্ধ করা হলে তা বহু অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। এছাড়া শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহে সহজ প্রাপ্য ঋণের অর্থ দ্বারা অপচয়মূলক প্রতিরক্ষা সম্ভার গড়ে তোলার বাহুল্য ব্যয় কমিয়ে দেবে। অর্থায়নের এই সহজ উৎস নিঃশেষ হয়ে গেলে তা রাষ্ট্রগুলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাধ্য করবে এবং এজন্য সম্ভাব্য সকল পথ-পন্থা খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করবে।"

৪. সুদ ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে

ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, সুদ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে; কিছু সংখ্যক পুঁজিপতিকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক বানিয়ে দেয় এবং সাধারণ মানুষকে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে। উপরে এটাও দেখানো হয়েছে যে, সুদ জনগণের ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকেও ব্যাংকের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং পুঁজিপতিগণ উক্ত অর্থ সুদের ভিত্তিতে খাটিয়ে বিপুল সুদ অর্জন করে। সুদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিগণ এভাবেই ব্যাংকের মাধ্যমে অন্য লোকদের মূলধন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বস্তুতঃ ব্যাংকের ওপর প্রভাবশালী কতিপয় সুবিধাভোগী লোক নানাবিধ কূটকৌশলের মাধ্যমে এমন সব ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ করে থাকে যা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুরূহ। প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে এসব লোকেরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব খাটায় এবং সমাজের অতিশয় ক্ষমতাবানদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নেয়।[৩] এভাবেই সুদী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির সাথে সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে ডি, এম, কোজ বলেছেন যে, "পুঁজিবাদে দক্ষতা নয়, পুঁজির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি। ডি, এম, কোজ দেখিয়েছেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রের

---

২. চাপরা, এম, উমরঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৫।

৩. চাপরা, এম, উমরঃ *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, পৃঃ ১৪।

www.icsbook.info

উৎপাদন সংস্থাসমূহের শতকরা ৬০ ভাগই মাত্র দু'শ বৃহৎ সংস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে এই দু'শ বৃহৎ সংস্থাই দেশের রাষ্ট্রীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রভাব খাটিয়ে থাকে; আর এ সংস্থাসমূহের ঋণদাতা হচ্ছে ব্যাংক। ফলে সেখানে যাবতীয় ক্ষমতা আসলে ব্যাংকারদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।"[৪] ড. এম, উমর চাপরা তাঁর ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা নামক নিবন্ধে 'প্যাটম্যান রিপোর্ট' ও 'দি সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রিপোর্টের' উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এত বলা হয়েছে, "এ দেশে (যুক্তরাষ্ট্র) বৃহৎ ব্যাংকগুলো অর্থনীতি ক্ষেত্রে একক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।" রিপোর্টে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, ব্যাংকের এই ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ফলে প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং মারাত্মক স্বার্থদ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। 'দি সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের রিপোর্টের' উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আমেরিকার বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ব্যাংকসমূহ প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। সেখানকার কোম্পানী, বিশেষ করে বৃহৎ কাম্পানীগুলোর সিকিউরিটিই হচ্ছে ব্যাংকগুলোর প্রধান বিনিয়োগ এবং এজন্য ব্যাংকগুলো এসব কোম্পানীর ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটিয়ে থাকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের দু'শ অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত জরিপের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই বৃহৎ অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এক বিরাট অংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্টক (শেয়ার) ক্রয় করে অথবা এদেরকে মূলধন যোগান দেয় এবং এদের ওপর নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে থাকে। ডি, এম, কোজ তাই মন্তব্য করেছেন যে, "এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সর্বাধিক ধনশালী এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান পুঁজিপতিরা ব্যাংকের মাধ্যমেই কাজ করে এবং ক্ষমতা খাটিয়ে থাকে। রকফেলার ও মেলোন'রা তাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে।"[৫]

সুদী সমাজে সম্পদ ও ক্ষমতা কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে কুক্ষিগত হয়। সাধারণ মানুষ নিঃস্ব ও সর্বহারা হবার কারণে তাদের কোন ক্ষমতাই থাকে না। এ অবস্থায় সেখানে গণতন্ত্রও আর গণতন্ত্র থাকে না এবং সবকিছু পুঁজিপতিদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। সুদী সমাজের অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় প্রেস, প্ল্যাটফরম, এমনকি, রাজনৈতিক দলগুলোও পুঁজি ও ক্ষমতার হাতে বন্দী হয়ে পড়ে এবং তাদের ইচ্ছাতেই চলতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতিরা যেভাবে চায় সে ধরনের সরকারই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সরকারের যাবতীয় পলিসিও পুঁজিপতিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

---

[৪] ডি, এম, কোজঃ *ব্যাংক কন্ট্রোল অব লার্জ কর্পোরেশনস ইন ইউ*, এস, ১৯৭২ পৃঃ ১৪৮।

[৫] চাপরা, এম, উমরঃ উপরোক্ত, পৃঃ ১৪।

www.icsbook.info

চতুর্থ অধ্যায়

সুদের আন্তর্জাতিক কুফল

সুদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কুফল আলোচনার পর এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, সুদের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দুনিয়াব্যাপী সুদের প্রচলন তথা বৈদেশিক ঋণে সুদের লেনদেনেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

কোন দেশের সরকার যখন অন্য সরকার বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, সেই ঋণকেই বলা হয় বৈদেশিক ঋণ। আন্তর্জাতিক বাজারের বড় বড় পুঁজিপতি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ সরকারের মধ্যস্থতায় সাধারণত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এ ধরনের ঋণ দেয়। এসব ঋণের অংক সাধারণত বড় হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা হাজার কোটি টাকারও অধিক হয়। এরূপ ঋণে সুদের হার স্বাভাবিকভাবে ৬% থেকে ১০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। সারা দুনিয়ার ওপর এ ধরনের সুদী ঋণের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ইতোপূর্বে সুদের যেসব ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের লেনদেন সেসব কুফলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সুদী ঋণ আরও এমন কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, যা অধিকতর মারাত্মক। নিম্নে সুদের এসব আন্তর্জাতিক ক্ষতির কিছু পেশ করা হলো ঃ

১. সুদ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে সমস্যা সৃষ্টি করে

উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কারণে বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে। অন্যান্য যেসব কারণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে ঃ

১) ***সংকট মোকাবিলা ঃ*** দেশে কোন অস্বাভাবিক সংকট সৃষ্টি হলে এবং সে সংকট মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দেশের ভেতর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে সরকারকে বাধ্য হয়ে অন্য দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এ ধরনের ঋণের অর্থ সংকট মুকাবিলা করতেই ব্যয় হয়ে যায়। এ অর্থের দ্বারা বাড়তি কোন উৎপাদন হয় না। ফলে এরূপ ঋণের আসল অর্থ পরিশোধ করতে হলেও জনগণের ওপর বাড়তি কর ধার্য করতে হয়। এরপর আবার সুদ দিতে হলে তা জনগণের ওপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

www.icsbook.info

২) *অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় ঃ* দ্বিতীয়ত, জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, ইত্যাদির ঘাটতি থাকলে এবং এসব দ্রব্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যন্তরীণভাবে যোগান দেয়া সম্ভব না হলে, সরকারকে বহির্বিশ্ব থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে এসব পণ্য আমদানি করে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে হয়। এই সব কারণে গৃহীত ঋণের অর্থ ভোগের কাজে ব্যয় করা হয় এবং এর দ্বারা কোন পণ্য উৎপাদন করা যায় না। ফলে এ ঋণের আসল ও সুদ এর আয় থেকে পরিশোধ করার কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এ ঋণের সাকুল্য সুদ ও আসল জনগণের ওপরই বোঝা হয়।

৩) *প্রতিরক্ষা ব্যয় সংকুলান ঃ* দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অথবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়। এ অর্থের দ্বারা সম্পদের উৎপাদন বাড়ে না অথচ তার আসল ও সুদ জনগণের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসে।

৪) *রাজনৈতিক কারণে ঃ* অনেক সময় জনসমর্থনহীন সরকারকে ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে এমন সব খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা অভ্যন্তরীণভাবে যোগাড় করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সরকারকে বিদেশের কাছে হাত বাড়াতে হয়। আর এ সরকার টিকে থাকলে বিদেশীদের স্বার্থ উদ্ধার হবে, এ কারণে তারা এরূপ সরকারকে দেদার ঋণ দিয়ে থাকে। এসব ঋণও উৎপাদন বাড়ায় না, কিন্তু সুদে-আসলে জনগণের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়।

৫) *বিনিয়োগ করার জন্য ঃ* সরকারকে অনেক সময় দেশের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহের উদ্দেশ্যেও ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল কাজে খাটানো হয়, সেহেতু এর আয় থেকে আসল ও সুদ পরিশোধ করতে পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহের এই আশা সফল হচ্ছে না; বরং দরিদ্র দেশগুলো ক্রমে দরিদ্রতর হচ্ছে এবং তাদের বিদেশী ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সুদ।

বস্তুতঃ অনুন্নত বিশ্বের উন্নয়নের পথে সুদ এক দুরূহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঋণের ওপর উচ্চহারে সুদ দিতে হয় বলে বহু অনুন্নত দেশ বিদেশী ঋণ ব্যবহার করে লাভবান হতে পারছে না; বিদেশী ঋণ অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে না। ঋণ পরিশোধের সমস্যা আজ সব অনুন্নত দেশের জন্য মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য নতুন ঋণে জড়াতে হচ্ছে; এই নতুন ঋণ আবার সুদে আসলে আগের ঋণকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ছাড়াই ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছে। সত্য বলতে গেলে এ কথাই বলতে হয় যে, এসব ঋণগ্রহীতা দেশ তাদের প্রকৃত স্বার্থ হাসিলে ব্যর্থ হচ্ছে। তাছাড়া ধনী দেশগুলো যখন দরিদ্র দেশকে কোন ঋণ দেয়, তখন

www.icsbook.info

তারা নিজের কিছু শর্তও আরোপ করে থাকে। এসব শর্ত গ্রহীতা নয়, বরং দাতা দেশের স্বার্থেই আরোপ করা হয়। ঋণের ব্যবহার, প্রযুক্তি আমদানি, প্রযুক্তি নির্বাচন ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে দাতা দেশের শর্ত মেনে চলার জন্য ঋণগ্রহীতা দেশকে বাধ্য করা হয়, যা দাতা দেশগুলোর স্বার্থই রক্ষা করে থাকে।

সুদ অনুপস্থিত হলে বা সুদ রহিত করে মুনাফার অংশের ভিত্তিতে বৈদেশিক ঋণের লেনদেন চালু হলে, অবস্থা অবশ্যই ভিন্নরূপ হবে। প্রথমতঃ ঋণগ্রহীতা দেশ প্রকৃত উৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ খাটিয়ে যত বেশি উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভ করতে পারবে তার অংশ ঋণদাতা দেশকে দেবে। এতে তার কোন বাড়তি বোঝা টানার দরকার হবে না। তাছাড়া কোন বিশেষ কারণে যদি লোকসান হয় এবং ঋণের অর্থের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতি হয়, তাহলেও গ্রহীতার ওপর ক্ষতির আনুপাতিক অংশই বর্তাবে; গোটা ঋণের আসলসহ সুদ পরিশোধ করার বোঝা তাকে বহন করতে হবে না।

অপরদিকে দাতা দেশও যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত উৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে পুঁজি দিবে। একদিকে ক্ষতির আশংকা এবং অন্যদিকে উৎপাদন বেশি হলে লাভ বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা এ অবস্থায় তারা উৎপাদন যাতে বাড়ে এবং ক্ষতি যাতে এড়ানো যায়, তার জন্য সচেষ্ট থাকবে। এভাবে উভয় পক্ষ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় তদারকী ও সতর্কতা অবলম্বন করার ফলে উৎপাদন বেশি হবে। দরিদ্র দেশের উন্নয়ন দ্রুততর হতে থাকবে; ঋণদাতা দেশও বেশি লাভ পেয়ে উপকৃত হবে।

২. সুদ ঋণ-দাসত্ব প্রথার জন্ম দেয়

সুদ অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোকে চিরদিন ধনী দেশগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য করে। দরিদ্র দেশগুলো খুব কমই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস পায়। যে দেশ একবার সুদী ঋণের বোঝা ঘাড়ে তুলে নেয়, তার পক্ষে এ বোঝা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর কখনও সম্ভব হয় না। নতুন উৎপাদনের জন্য না হলেও পুরাতন ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে তাকে ধনী দেশগুলোর কাছে যেতেই হয় এবং তাদের জুড়ে দেওয়া জোয়াল কাঁধে বয়ে অবশ্যই চলতে হয় এবং যতই দিন যায় এ বোঝা ততই ভারী হতে থাকে। এ সম্পর্কে বিচারপতি তকি উসমানী তার রায়ে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো[১]:

অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ না হয়েও পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে, প্রতিনিয়ত আমরা গোটা জাতিকে বিদেশী ঋণদাতাদের দাসত্বের অধীনে ঠেলে দিচ্ছি। প্রতিবছর আমরা বড় বড় অংকের ঋণ করছি; আর এভাবে আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের অনাগত ভবিষ্যৎ ঋণের কাছে বাঁধা (Mortgage) রাখছি। ধারণা করা হয় যে,

[১] উসমানী, মুহাম্মদ তকি: পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮-১২২।

www.icsbook.info

বৈদেশিক ঋণ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহৃত হয় এবং এসব দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের ক্ষেত্রে এ ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এ সত্য আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। সুসান জর্জ একজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ। তৃতীয় বিশ্বের ঋণের ফলাফলের ব্যাপারে তিনি বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছেন। এই ফলাফলের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার সারসংক্ষেপ পেশ করা হলো:

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD)-র মতে ১৯৮২ হতে ১৯৯০ সময়কালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি মোট সম্পদ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সম্পদের মধ্যে ছিল ওইসিডি-এর বিভিন্ন শ্রেণীর অফিসিয়াল উন্নয়ন ফাইন্যান্স, রফতানি ঋণ ও বেসরকারী অর্থ প্রবাহ; অন্য কথায় যাবতীয় অফিসিয়াল দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় (bilateral and multilateral) সাহায্য, বেসরকারী দাতব্য অনুদান, বাণিজ্যিক ঋণ ও সরাসরি বেসরকারী বিনিয়োগ এবং ব্যাংক ঋণ। এই সম্পদের বেশির ভাগই ছিল ঋণ, সাহায্য বা অনুদান নয়; স্বাভাবিকভাবেই এ ঋণের ওপর ভবিষ্যতে লভ্যাংশ (dividend) বা সুদ পাওনা হবে।

সম্পদ প্রবাহের প্রকৃত চিত্র (true picture) পেতে হলে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত আরও অনেক কিছু যোগ করতে হবে। যেমন, রয়ালটি, লভ্যাংশ, প্রত্যাবর্তিত মুনাফা (repatriated profit), কাঁচামালের জন্য যথোচিত দামের পরিবর্তে কম দাম দেওয়া ইত্যাদি অনুরূপ আরও অনেক বিষয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রদত্ত সম্পদ ১৩৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তাদের প্রাপ্ত সম্পদ ৯২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে বিত্তশালী দেশসমূহের অনুকূলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হচ্ছে ৪১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তুলনা করার জন্য, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যান ১৯৪৮ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে হস্তান্তর করেছে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯১ সালে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এভাবে ১৯৮২-৯০ এর আট বছরে দরিদ্র দেশগুলো কেবল তাদের ঋণ পরিশোধের (debt servicing) মাধ্যমে ধনীদের জন্য ছয়টি মার্শাল প্ল্যানের অর্থ যোগান দিয়েছে।

এই অস্বাভাবিক (extraordinary) অধিক পরিমাণ অর্থ ফেরত প্রদান সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট ঋণের বোঝা কি বিন্দুমাত্রও হ্রাস পেয়েছে? দুর্ভাগ্য যে তা হয়নি। বরং ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ১৯৮২ সালের তুলনায় শতকরা পূর্ণ ৬১ ভাগ অধিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ১৯৯০ দশকের যাত্রা শুরু করেছে। এ সময় সাব-সাহারান আফ্রিকার ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১১৩%; আর অতি দরিদ্র, তথাকথিত এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১১০ ভাগ।

নিরপেক্ষ অনেক লেখকের অভিমত হচ্ছে যে, তৃতীয় বিশ্বের ঋণের বিষয়টি কেবল আর্থিক বিষয় নয়; বরং এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

www.icsbook.info

ও বিশ্ব ব্যাংকের (WB) ঋণ সর্বদাই কঠোর শর্ত সম্বলিত হয়ে থাকে। 'প্রকল্প সহায়তা' (Program aid) ঋণের ক্ষেত্রে যদিও ঋণগ্রহীতা দেশকে ঋণের অর্থ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করার নিশ্চয়তা বিধান করার লক্ষ্যে আরোপিত কতিপয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় কর্মসূচী গ্রহণের শর্তে (package) সম্মত হতে হয়, তবু প্রকল্প যখন ব্যর্থ হয় এবং ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন প্রকল্প সহায়তা ঋণকে 'কাঠামোগত সংস্কার (Structural Adjustment) ঋণে' রূপান্তর করা হয়। আর এতে ঋণবদ্ধ দেশের গোটা অর্থনীতি তদারক করার শর্ত আরোপ করা আছে। এভাবে ঋণদাতাগণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকারের বৈধতা প্রতিপাদন করে নিয়েছে। এতদসত্ত্বেও এসব নীতিমালা ও কর্মসূচী যখন ঋণের গতি পরিবর্তনে ব্যর্থ হয় তখন 'কৃচ্ছ্রতা কর্মসূচি'র (Austerity Programs) আশ্রয় নেয়া হয় এবং সমাজ সেবা, সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষাখাতের ব্যয়কে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেওয়া হয়। সুসান জর্জ এবং ফ্যাব্রিযিও স্যাবেলী এই কর্মসূচী ও নীতিমালার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে,

১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সময়কালে আফ্রিকার তেত্রিশটি দেশ মোট ২৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একই সময়ে দেশগুলোর মাথা পিছু মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ২.১% হ্রাস পেয়েছে। মাথা পিছু খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের গতি ছিল আরও বেশি ও অদম্য (steady); নিম্নতর মজুরীর প্রকৃত মূল্য হ্রাস পেয়েছিল ২৪%-এর বেশি হারে। সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে নেমে আসে ৭ বিলিয়নে; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ১৯৮০ সালে ৮০% থেকে ১৯৯০ সালে ৬৯%-এ কমে আসে; এসব দেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ১৯৮৫ সালে ১৮৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে ২১৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়।

খোদ বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব মূল্যায়ন অনুসারে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সাফল্যের হার ৫০%-এরও কম, যদিও এ হিসাবের ব্যাপারে বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এরপরেও, ১৯৮৯ সালে কৃত পর্যালোচনায় বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ এমন একটি প্রকল্পেরও উল্লেখ করতে পারেননি যেখানে প্রকল্পের প্রয়োজনে বাস্তুচ্যুত লোকদের জন্য পুনরায় বসতি স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের এমনভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে যাতে বাস্তুচ্যুত হওয়ার পূর্বে তাদের জীবনযাত্রার যে মান ছিল কমপক্ষে সে মানে জীবনযাপন করার সুযোগ তারা আবার পেয়েছে।

এমনকি, যেসব প্রকল্পকে সফল বলে বলা হয়েছে, সে প্রকল্পগুলোও ঋণগ্রস্ত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে অবদান রাখতে কদাচিৎ সক্ষম হয়েছে। সে ব্যাপারে মাইকেল রোবোথাম লিখেছেন: "তৃতীয় বিশ্বের ঋণের ওপর এত বেশি লেখালেখি

www.icsbook.info

হয়েছে যে, এ বিষয়ে সাহিত্যের সয়লাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের যাবতীয় যুক্তি ও নীতিমালাকে বাহ্যত যুক্তিসংগত তত্ত্বের ওপরই ভিত্তিশীল করা হয়েছে; কিন্তু এসব স্টাডিতে ঘটনার পর ঘটনা, দেশের পর দেশের নজীর তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে, বাস্তবে এ তত্ত্ব কাজ করছে না। কোথাও দেখা যাচ্ছে ঋণের দ্বারা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ঠিক, কিন্তু তা ঋণ পরিশোধকে অসম্ভব প্রমাণিত করেছে; কোথাও অর্থায়নকৃত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশটি বিরাট ঋণের তলায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, যা পরিশোধ করার আর কোন আশাই অবশিষ্ট নেই; কোথাও আবার পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ করার জন্য বারবার নতুন ঋণ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

অনেক সমালোচক তৃতীয় বিশ্বের ঋণকে ভূমিদাস প্রথা (Peonage) বা মজুরী দাস প্রথার (Wage Slavery) সাথে তুলনা করেছেন। চেরিল পেয়ার এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা হলো:

এই ব্যবস্থার (বর্তমান আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থা) এক একটি দফার সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমিদাস প্রথার তুলনা করা যেতে পারে। ভূমিদাস প্রথা বা ঋণ দাসত্ব পদ্ধতিতে.....নিয়োগকর্তা/ঋণদাতা/ব্যবসায়ীদের সামনে কখনও এ উদ্দেশ্য থাকত না যে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পাওনা ঋণ একেবারে উসূল করে ফেলবে; আবার ঋণগ্রহীতা খেতে না পেয়ে মরে যাক সেটাও তারা চাইত না; বরং তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে মজুরদেরকে চিরকালের জন্য নিয়োগকারীর ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে রাখা.....। যথাযথ অর্থে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ব্যবস্থা চলছে.....। বস্তুত এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঋণ-দাসত্ব প্রথা। এই ব্যবস্থার অধীনে থাকলে ঋণগ্রস্ত দেশগুলো চিরকাল অনুন্নত থেকে যাবে অথবা তারা যদি উন্নয়নের মুখ কখনও দেখেও তাহলে তা হবে কেবল তাদের রফতানি খাতে যা হবে বহুজাতিক উদ্যোক্তাদের সেবায় নিয়োজিত। নিজ দেশের জনগণের প্রয়োজন পূরণে বাঞ্ছিত উন্নয়নের বিনিময়েই এ উন্নয়ন কিনতে হবে।

১৯৮৭ সালে ইন্সটিটিউট ফর আফ্রিকান অলটারনেটিভ-এর সম্মেলনে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিলুপ্তি দাবী করা হয়; তারা ব্রেটন উড আন্তর্জাতিক মুদ্রা পদ্ধতির প্রাধান্যেরও পূর্ণ অবসান দাবী করে। কনফারেন্সে কেইজ স্টাডির ফলাফল সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো:

ফলত সকল ক্ষেত্রেই এসব (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংক) প্রকল্পের মৌলিক প্রভাব হচ্ছে নেতিবাচক। ব্যাপক বেকারত্ব, প্রকৃত আয়-হ্রাস, মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, অতিরিক্ত আমদানি, অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতি, নীট পুঁজির বহির্গমন,

www.icsbook.info

বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, কঠোর দুর্দশা এবং শিল্পায়ন ব্যাহত করা (deindustrialization) এ সবই হচ্ছে এর অশুভ ফল। এমনকি, ঘানা ও আইভরি কোস্ট সম্পর্কে তথাকথিত সাফল্যের যে কাহিনী বলা হয়েছে তাও স্থায়ী সাফল্য হতে পারেনি; বরং সাময়িক উপশম ছাড়া তা আর কিছুই দিতে পারেনি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি, শিল্প (Manufacturing) এবং সমাজ সেবা খাতসমূহ, আর ঋণ সমন্বয়ের (Adjustment) যাবতীয় বোঝা প্রত্যাবর্তিত হয়ে গিয়ে পড়েছে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর ওপর।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ বিদেশী ঋণ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না- এই মোহাচ্ছন্ন ধারণার ভ্রান্তি উপলব্ধি করার জন্য উল্লেখিত তথ্যাবলীই যথেষ্ট হওয়া উচিত। আসলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কারা লাভবান হচ্ছে? একজন কানাডীয় স্কলার, জ্যাকস বি. গেলিনাস অত্যন্ত গভীরভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'ফ্রিডম ফ্রম ডেবট্' নামক গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

বিদেশী ঋণনির্ভর উন্নয়ন মডেল কোন একটি দেশকেও অর্থনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা থেকে বের করে আনায় নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রমাণ করেছে। তবে এ মডেল তৃতীয় বিশ্বের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদ অর্জনের উৎসে পরিণত হয়েছে; ফলে এখানে নব্য এক শক্তি এবং সামাজিক রাজনৈতিক শ্রেণীর উত্থান ঘটেছে যাকে যথার্থ অর্থে সাহায্যতন্ত্র (Aidocracy) নামকরণ করা যেতে পারে।

৩. সুদ দাতা দেশের স্বার্থ হাসিল করে

বিশ্বের শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোই দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশকে ঋণ দেয়। এই ঋণ বরাদ্দ ও বিতরণ ক্ষেত্রে প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে, তাদের শিল্পের জন্য কাঁচামালপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান এবং শিল্পপণ্য রফতানীর জন্য বাজার ঠিক রাখা ও নতুন বাজার সৃষ্টি করা। এরা এমন কৌশল ও শর্ত আরোপ করে যাতে ঋণগ্রহীতা দেশ স্বাবলম্বী হওয়ার পরিবর্তে ক্রমে ঋণদাতাদের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় এবং দাতা দেশ যেন অধিক স্বার্থ হাসিল করতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ সমরাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্নত দেশসমূহ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরী করে। এসব পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করা জরুরী। তাই কোন অনুন্নত দেশ অস্ত্র তৈরীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক সে জন্য কোন ঋণ উন্নত দেশগুলো দেয় না, বরং তাদের বরাদ্দকৃত ঋণের এক বিরাট অংশ অস্ত্র আকারে দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে আরও চমকপ্রদ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে; বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এদেশে জনসংখ্যা খুবই

বেশি এবং শতকরা ৮০ জনই অশিক্ষিত ও অদক্ষ। এই বিরাট জনসমষ্টিকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমুখী শিক্ষা দিয়ে দক্ষ করে তুলতে পারলে এরা জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং এভাবে দেশটির পক্ষে স্বাবলম্বী হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলো এদেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার জন্য ঋণ দেয় খুব কমই; বরং তারা কোটি কোটি টাকার মঞ্জুরী দেয় জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য যার এক বিরাট অংশ আবার তাদের দেশে উৎপাদিত জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিক্রয় করে বিরাট লাভ নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ বিপুল অর্থ মানব সম্পদের উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা হলে দেশের অবস্থা বর্তমানের তুলনায় উন্নততর হতো কিনা, তা অবশ্যই মূল্যায়নের দাবী রাখে। এমনিভাবে বৈদেশিক সুদী ঋণ আসলে দাতা দেশসমূহের স্বার্থই হাসিল করে, গ্রহীতা দেশের উপকার এর দ্বারা খুব স্বল্পই হয়।

৪. সুদ সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও বিলাসিতা বাড়িয়ে দেয়

বর্তমান দুনিয়ায় সুদসহ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিলেই ঋণ পাওয়া যায়। ঋণের অর্থ কি কাজে ব্যবহার করা হবে এবং এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পদ উৎপাদন করা হবে কিনা, ঋণদাতা দেশ বা সংস্থা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে দরিদ্র দেশগুলো অনেক সময় তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের অর্থ অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসিতামূলক কাজে ব্যবহার করে থাকে। তারা আয় বুঝে ব্যয় করার পরিবর্তে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে তোলে। মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় এবং পরিশ্রমের পথ পরিহার করে সহজ ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক ঋণ-ব্যবস্থা দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ঋণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থা অপরিণামদর্শী এবং স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। বস্তুতঃ সুদ ভিত্তিক ঋণ-ব্যবস্থার কারণেই কোন কোন দেশ বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে আবার ঋণ গ্রহণ করতে পারে; পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য নতুন ঋণ নেয় এবং ঋণ পরিশোধের তারিখ বারবার পিছিয়ে বছরের পর বছর সুদসহ ঋণের বর্ধিত বোঝা বহন করে চলে।

সুদ বিলোপ করা হলে সুদ ও আসল ফেরত দানের প্রতিশ্রুতিতে ঋণ পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় ধনী দেশ কর্তৃক দরিদ্র দেশকে আর্থিক সহযোগিতা দানের জন্য দুটো পথই কেবল খোলা থাকবে: প্রথমত, সরাসরি সাহায্য প্রদান করা (Transfer payment) এবং দ্বিতীয়ত, লাভ-ক্ষতির অংশীদারীর ভিত্তিতে দরিদ্র দেশের উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ করা। এ অবস্থায় অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় এবং বিলাসিতামূলক কাজে ব্যয় করার জন্য অর্থ পাওয়া যাবে না। দরিদ্র দেশের অনুৎপাদনশীল ও বিলাসিতামূলক কাজে ব্যয় হ্রাস পাবে এবং এ উদ্দেশ্যে কৃত ঋণের বোঝা কমে যাবে।

www.icsbook.info

৫. সুদ আন্তর্জাতিক শোষণ ও বৈষম্য সৃষ্টি করে

দেশের ভেতরে সুদ যেমন অধিকাংশ মানুষকে শোষণ এবং কতিপয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সুদ ঋণগ্রহীতা দেশগুলোকে শোষণ করে বিশ্বের প্রায় সব সম্পদ দাতাদেশসমূহে এনে পুঞ্জীভূত করে দেয়। ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিবছর দেশের বর্তমান সম্পদের একটা অংশ সুদ আকারে ধনী ঋণদাতা দেশের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে দেশের সম্পদ হ্রাস করে এবং ধনী দেশের সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত বর্তমান বিশ্বে ধনী দেশগুলোর ক্রমে আরও ধনী হয়ে উঠা এবং দরিদ্র দেশসমূহ আরও দরিদ্র হওয়ার প্রধান কারণ সুদ। ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী লিখেছেন, "The regime of interest has been a major factor responsible for the worsening distribution of income and wealth within and between nations."[২]

---

[২]. ড. মুহাম্মদ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *ইস্যুজ ইন ইসলামিক ব্যাংকিং*, সিলেকটেড পেপারস, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ, কে, ১৯৮৩, পৃঃ ৮২।

www.icsbook.info

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন

আল্লাহ নিজের নাম নিয়ে নিজেই বলেছেন, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন।" (আল-কুরআন: ২: ২৭৬)। আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা 'ইয়ামহাকু' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মূল হচ্ছে 'মাহক'। 'মাহক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, "decrease after decrease, a continuous process of diminishing"[১](হ্রাসের পরে হ্রাস, ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত ক্ষয় হওয়া)। পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ প্রতিদিন একটু একটু করে ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হওয়াকে আরবীতে বলা হয় 'মাহক'। সুদ এভাবেই সমাজ ও অর্থনীতিকে নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস করে। এটাই হচ্ছে সুদের প্রবণতা, পরিণতি বা বিধি।

বস্তুতঃ এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর একটি প্রাকৃতিক (natural) চিরন্তন ও শাশ্বত বিধান মানবজাতিকে অবহিত করেছেন। এ হচ্ছে সুদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত প্রবণতা। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের প্রবণতাকে বলা হয় বিধি (Law)। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতিতে দাম হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে চাহিদা উঠা-নামার প্রবণতাকে বলা হয়েছে চাহিদা বিধি (Law of Demand); অনুরূপভাবে যোগান বিধি (Law of Supply); গ্রেশামের বিধি ইত্যাদি আরও অনেক বিধি রয়েছে। সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানেই এইরূপ বহু বিধি আছে। বিজ্ঞানীরা অনেক বিধি খুঁজে পেয়েছেন; হয়তো এখনও অনেক বিধির কথা জানা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেও তার নিজের অনেক বিধির কথা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন"- এটা হচ্ছে সুদ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধি; বলা যায় এটা হচ্ছে সুদ বিধি বা Law of Riba/Interest। বস্তুতঃ আল্লাহ সুদের মধ্যে এমন প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা রেখেছেন যা অবশ্যই মানব সমাজ ও অর্থনীতিকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সুদ সমৃদ্ধি আনে; কিন্তু সুদের আসল পরিণতি হলো অভাব ও সংকোচন।" (মুসনাদে আহমদ)। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "যিনা ও সুদ জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।" (মুসনাদে আহমদ)। তিনি আরও বলেছেন, "সুদের অর্থ যতই বর্ধিত হোক না কেন তার পরিণতি হবে দারিদ্র্য।" (উদ্ধৃত, উসমানী, শাব্বীর আহমদ)।

---

১. *সিদ্দিকী, মুহাম্মদ নাজাতুল্লাহ*, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ৪৩।

www.icsbook.info

তাফসীরকার, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের আলোচনায় সুদের যে ভয়াবহ ধ্বংসকর চিত্র বিধৃত হয়েছে ওপরে তা বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সুদ হচ্ছে পরের সম্পদ বিনামূল্যে খাওয়া, গ্রাস করা, আত্মসাৎ করা। চুরি, ডাকাতি, জুয়া, ঘুষ-দুর্নীতির চেয়েও মারাত্মক জুলুম ও শোষণ হচ্ছে সুদ। এসব অন্যায় ভক্ষণ জাতিকে ধ্বংস করে এতে সন্দেহ নেই; আর সুদ তার চেয়ে আরও অধিক ভয়াবহ ধ্বংস বয়ে আনবে এটাই স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী আলোচনায় একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে সুদ মানুষকে সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলে, নৈতিক মূল্যবোধের বিকৃতি সাধন করে, অর্থলিপ্সা, স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতার জন্ম দেয়। স্বার্থদ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানির সয়লাব বইয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে কমিয়ে দেয়, ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে যাবতীয় সম্পদ কতিপয় হাতে কুক্ষিগত করে দেয়, ভোক্তা জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা শোষণ করে নিয়ে অর্থনীতিকে মন্দা-মহামন্দায় নিক্ষেপ করে এবং বিনিয়োগ উৎপাদনকে স্থবির করে দেয়। বেকার ও দেউলিয়াদের কাতার দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে তোলে। হাজার হাজার ব্যাংকে লালবাতি জ্বলে উঠে, লক্ষ লক্ষ শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। একদিকে ক্রয়-ক্ষমতাহীন অভুক্ত কাফেলার হাহাকারে আকাশ ভারি হয়ে উঠে অন্যদিকে সম্পদ ধ্বংসের মহাযজ্ঞ চলতে থাকে। একদিকে ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি, কৃত্রিম অর্থের পিরামিড ও পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলে। অর্থনীতি বাণিজ্য-চক্রের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে উথাল-পাথাল করতে থাকে। শেয়ার বাজার, মুদ্রা বাজার, পণ্য বাজার সর্বত্রই চলতে থাকে ঠকবাজি আর ফটকাবাজির মহা-মহড়া। মুদ্রা বিনিময় হারে দেখা দেয় অস্থিরতা আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি হয়ে পড়ে বিকল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আশা হয় সুদূর পরাহত। অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতাও কতিপয় হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। চলে দাবী-দাওয়া, হরতাল, ধর্মঘট, লকআউট; চলে ক্ষমতার পালা বদল; কিন্তু তিমির আর কাটে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদ বিত্তহীন ও বিত্তশালী দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে ঋণ-দাসত্ব প্রথার জন্ম দেয়; বিশ্বশান্তির পথে হুমকি সৃষ্টি করে; দেশে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, এমনকি, স্বার্থদ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে চরম ধ্বংস বয়ে আনে।

উপরে উল্লেখিত হাদীস স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছে যে, সুদের ধ্বংস আসে অভাব ও সংকোচনের মধ্য দিয়ে। সুদের সৃষ্ট উপরোক্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, সুদ ক্রেতাসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা শোষণ করে নেয়, জনগণ চরম অভাবে নিপতিত হয়; চাহিদা পড়ে যায়, মন্দা সৃষ্টি হয় এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত ও স্থবির হয়ে পড়ে। হাদীসটিতে এই অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.icsbook.info

বিশ্বে এ যাবত বিভিন্ন স্থান ও দেশে, কখনও বা বিশ্বব্যাপী বহুবার ব্যাংকিং সংকট, মন্দা ও মহামন্দা সৃষ্টি হয়েছে যাতে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ প্রধানত সুদকেই এজন্য দায়ী করেছেন। এসব সংকট ও মন্দার তালিকা পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ দেওয়া হলো।

ধ্বংসের বিবরণ

তালিকায় উল্লেখিত প্রতিটি সংকটে বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংস সাধিত হয়েছে, কোনটিতে কিছু কম আর কোনটিতে বেশি। এখানে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি সংকটের ক্ষতির বিবরণ অথবা সকল সংকটের ক্ষয়-ক্ষতির যোগফল তুলে ধরলে ভাল হতো। কিন্তু এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য ১৯২৯-৩৯ সালের মহামন্দা, ১৯৯৭-৯৮ সালের এশিয়ায় সৃষ্ট ব্যাপক আর্থিক সংকট এবং ২০০৭-১০ সালে সৃষ্ট বিশ্বমন্দায় যে ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

ক) বিশ্ব মহামন্দা ঃ ১৯২৯-৩৯ (Great Depression)

উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে ১৯২৯ সালে এই মহামন্দা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তীব্রভাবে বহাল থাকে। অতঃপর এর তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং ১৯৩৯ সালে গিয়ে শেষ হয়। এটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোরতম মন্দা। এই মন্দার আঘাত দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালের ২৮ অক্টোবর কালো সোমবারে নিউইয়র্ক ওয়ালস্ট্রীটে শেয়ার বাজার বিপর্যয়ের মাধ্যমেই চার মাস পূর্বে শুরু হওয়া এ মন্দা মহামন্দার বিভীষিকায় রূপ নেয়। এই মহামন্দার ধ্বংস যেমন বিপুল বিস্তৃতিও ছিল তেমনি ব্যাপক। এ মহামন্দায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তার পর জার্মানী এবং যুক্তরাজ্য। মহামন্দার ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ ঃ

যুক্তরাষ্ট্র

১. **শেয়ার বাজার বিপর্যয়:** ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ১৯২৯ সালে শেয়ারের যে মূল্য ছিল তার ৮০% হ্রাস পায়; অর্থাৎ ১৯২৯ সালের মূল্যের ২০%-এ নেমে আসে। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে, এক মাসে ক্ষতি হয় ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২. **ব্যাংক দেউলিয়া :** সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান মোট ২৫,০০০ ব্যাংকের মধ্যে ১১,০০০ ব্যাংকের পতন হয়।

৩. **শিল্পোৎপাদন হ্রাস :** ১৯২৯ সালের উৎপাদন থেকে ৫৪% কমে যায়; **অর্থাৎ** ৩ বছরে অর্ধেকেরও বেশি উৎপাদন হ্রাস পায়।

৪. **বেকারত্ব :** ১২ থেকে ১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ মোট কর্মশক্তির ২৫-৩০% **শ্রমিক** বেকার হয়/কর্ম হারায়।

www.icsbook.info

৫. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য** : ১৯৩২ সালের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯২৯ সালের ২/৩ ভাগ হ্রাস পায়।

৬. **ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা** : সর্বস্তরের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে চাহিদার ব্যাপক পতন ঘটে। এতে করে উৎপাদিত পণ্যের বেশীর ভাগই অবিক্রীত থেকে যায়।

৭. **রাজনৈতিক পরিবর্তন** : ১৯৩২ সালে ফ্র্যাংকলিন ডি. রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের পরাজয় হয়।

৮. **অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মৌলিক পরিবর্তন** : মহামন্দায় প্রমাণিত হয় বাজার উপাদান (market forces) নিজেই অর্থনীতিতে বাঞ্ছিত সংশোধন/উত্তরণ আনতে পারে না। বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে প্রাপ্ত এ অভিজ্ঞতার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোয় কর, শিল্প নিয়ন্ত্রণ, পাবলিক ওয়ার্কস, সামাজিক বীমা, সমাজ সেবা কার্যক্রম অথবা ঘাটতি ব্যয় আকারে সরকারী হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়।

৯. **মুদ্রা ব্যবস্থার পতন** : স্বর্ণমান ব্যবস্থা (gold standard) ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে।

১০. **মোট দেশজ উৎপাদন (GNP)** : ১৯৩২ সালেই ১৩.৪% হ্রাস পায়। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত ৩ বছরে হ্রাস হয় ৩১%।

১১. **শিল্প পণ্যের মূল্য** : ১৯৩০ সালের মূল্য ৮০% হ্রাস পায়।

১২. **ব্যাংক ডিপোজিটের ক্ষতি** : ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে ২.০০ বি. মা. ডলার মূল্যের ডিপোজিট ক্ষতি হয়।

১৩. **মুদ্রা সরবরাহ** : ১৯২৯ সালের চেয়ে ৩১% হ্রাস করা হয়।

১৪. **পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ** : ১৬.২ বি. মা. ডলার থেকে ১ বি. মা. ডলার হ্রাস পায় বা ১/৩ এ নেমে আসে।

১৫. **কৃষি পণ্যের মূল্য** : ১৯২৯ সালের চেয়ে ৫৩% হ্রাস পায়।

১৬. **করের হার** : টপ ট্যাক্সের হার ২৫% থেকে ৬৩% উন্নীত করা হয়, ১৯৩৬ সালে এ হার ৭৯% উন্নীত হয় এবং ১৯৪৫ সালে ৯১% এ উন্নীত হয়; অত:পর ১৯৬৩ সালে ৮৮% এবং ১৯৬৩ সালে ৭০% ভাগে নেমে আসে।

জার্মানী

১. **বেকারত্ব** : ১৯২৯ সালের শেষ ভাগ হতে ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ৬ মিলিয়ন কর্মশক্তি কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে যা মোট শ্রমশক্তির ২৫%।

২. **রাজনৈতিক** : এডলফ হিটলার ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়।

৩. **ব্যাংকিং বিপর্যয়** : ব্যাংকিং পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়ে।

www.icsbook.info

যুক্তরাজ্য

১. যুক্তরাজ্যে মন্দার ক্ষয়-ক্ষতি ততটা মারাত্মক ছিল না। তবে দেশের শিল্প ও রফতানী খাতে সৃষ্ট মন্দা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বহাল ছিল।

২. **রাজনৈতিক** : চরমপন্থী শক্তিগুলোর তৎপরতা বেড়ে যায় এবং উদার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুত্ব হেয় করার প্রয়াস পায়।

খ) এশীয় আর্থিক বিপর্যয়– ১৯৯৭

১৯৯৭ জুলাই মাসে থাইল্যান্ডের মুদ্রা থাই বাথ-এর মূল্য পতনের মাধ্যমে বিপর্যের সূচনা হয় এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড। হংকং, মালয়েশিয়া, লাওস ও ফিলিপাইনও বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়; চায়না, ভারত, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই এবং ভিয়েতনাম স্বল্প ক্ষতির মধ্য দিয়েই কাটিয়ে উঠে। নিচে ক্ষয়-ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

থাইল্যান্ড ঃ মুদ্রার মূল্য দ্রুত হ্রাস পায় এবং ৫০%-এর বেশি কমে যায়। ১৯৯৮ সালে বাথের মূল্য সর্বনিম্ন ৫৬ বাথ = ১.০০ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। স্টক বাজার ৭৫% হ্রাস পায়। দেশের বৃহত্তম ফাইন্যান্স কোম্পানী "ফাইন্যান্স ওয়ান'-এর পতন হয়। লেঅফের কারণে অর্থ, রিয়েল এস্টেট এবং নির্মাণ খাতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক গ্রামাঞ্চলে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ৬ লাখ বিদেশী শ্রমিককে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ১৯৯৭ সালে মার্কিন ডলারের মাথা পিছু নমিনাল GDP হ্রাস পায় ২১.২%। সংকট উত্তরণের জন্য আইএমএফ প্রথম দফায় (আগ: ১২, ১৯৯৭) ১৭.০০ বি. মার্কিন ডলার এবং দ্বিতীয় দফায় (আগ: ২০, ১৯৯৭) আরও ৩.৯ বি. মার্কিন ডলার উদ্ধার প্যাকেজ দেয়। সংকট রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আঘাত হানে এবং প্রধানমন্ত্রী জেনারেল চ্যাভালিত উংচাইওধকে পদত্যাগ করতে হয়। ২০০১ সালে দেশটি সংকটমুক্ত হয়।

ইন্দোনেশিয়া ঃ সংকটের পূর্বে ১.০০ মার্কিন ডলার ক্রয় করতে ইন্দোনেশিয়ার ২,৬০০/- রূপিয়া লাগতো, সংকটে রূপিয়ার মূল্য এত হ্রাস পায় যে, ১৯৯৮ সালের ৯ জানুয়ারীতে ১.০০ মা. ডলারের দাম হয় ১১,০০০/- রূপিয়া; স্পট বাজারে তা হয় ১৪,০০০/- রূপিয়া। ইন্দোনেশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এর ক্ষতি হয় ১৩.৫%। ১৯৯৭ সালে মার্কিন ডলারে মাথাপিছু নমিনাল GDP হ্রাস পায় ৪২.৩%। গণদাবীর মুখে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সুহার্তোকে তাঁর পদ থেকে ইস্তিফা দিতে হয়। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়ে আসে।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ অতিমাত্রার ঋণের বোঝায় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বহু সংখ্যক কর্পোরেট কোম্পানী দেউলিয়াত্ব বরণে বাধ্য হয়। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম মোটর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কিয়া মোটরস্ জরুরী ঋণ চাইতে বাধ্য হয়। এদিকে এশিয়ায় বাজার

www.icsbook.info

পতনের প্রেক্ষাপটে ক্রেডিট রেটিং-এ সাউথ কোরিয়াকে A1 থেকে ক্রমান্বয়ে B2 তে রেটিং করা হয়। এ অবস্থা শেয়ার বাজারে বিপর্যয় ঘটায়। ১৯৯৭ সালের ৭ নভেম্বরে স্টক বাজারে ৪%, ৮ নভেম্বরে ৭% এবং ২৪ নভেম্বরে আরও ৭.২% দর পতন হয়। ১৯৯৮ সালে হুন্দাই মোটরস্ কিয়া মোটরস্ কিনে নেয়। স্যামসাং মোটরের ৫ বি. মার্কিন ডলার ঋণ মওকুফ (dissolved) করতে হয় আর দায়েউহ্ মোটরকে মার্কিন কোম্পানীর কাছে বিক্রি করতে হয়। দেশের মুদ্রা প্রতি মার্কিন ডলার ৮০০ একক থেকে ১৭০০০ এককে নেমে যায়। দেশের ঋণের পরিমাণ GDP-এর ১৩% থেকে ৩০% উন্নীত হয়। ১৯৯৭ সালে মার্কিন ডলারের হিসাবে মাথাপিছু নমিনাল GDP হ্রাস পায় ১৮.৫ %।

ফিলিপাইন ঃ থাইল্যান্ড সংকটের প্রেক্ষাপটে ফিলিপাইন সেন্ট্রাল ব্যাংক তাদের মুদ্রাকে রক্ষা করার প্রয়াস হিসেবে ১৯৯৭ সালের মধ্য জুলাইয়ে ওভার নাইট সুদের হার ১৫% থেকে ৩২% উন্নীত করে। সংকটের শুরুতে ২৬ পেসোর দাম ছিল ১.০০ মা. ডলার: ১৯৯৯ সালে এ হার হয় ১ মা. ড. = ৩৮ পেসো, ২০০১ সালে তা হয় ১ মা. ড. = ৫৪ পেসো। ১৯৯৭ সালে ফিলিপাইন স্টক এক্সচেঞ্জে ধস নামে এবং সূচক ৩০০০ পয়েন্ট থেকে ১০০০ পয়েন্টে নেমে আসে। মার্কিন ডলারে মাথাপিছু নমিনাল GDP হ্রাস পায় ১২.৫%। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রেসিডেন্ট অ্যাসট্রাদার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়া হয়; অত:পর সংসদীয় ভোটে রক্ষা পেলেও শেষ পর্যন্ত গণবিক্ষোভের মুখে তাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং গ্লোরিয়া ম্যাকাপ্যাগাল আরোয় প্রেসিডেন্ট হন।

হংকং ঃ ১৯৯৭ সালে হংকং ডলার ফটকাবাজির শিকার হয়। এসময় দেশের মুদ্রামান সংরক্ষণে হংকং মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে ১ বি. মা. ডলার খরচ করে নিজেদের মুদ্রা ক্রয় করতে হয়। ১৯৯৮ সালে ১৫ ভাগ ওভার নাইট সুদের হার ৮% থেকে ১৫% এবং এক পর্যায়ে তা ৫০০% বৃদ্ধি করা হয়। এদিকে স্টক বাজার ক্রমেই অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠে এবং ২০ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে হ্যাং সেং সূচক ২৩% নিচে পড়ে যায়। সরকার ১২০ বি. হ. ডলার অর্থাৎ ১৫ বি. মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে এবং দেশের সবচেয়ে বড় শেয়ার হোল্ডারে পরিণত হয়।

মালয়েশিয়া ঃ ১৯৯৭ সালে থাইল্যান্ড মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে মালয়েশিয়ার রিঙ্গিত ফটকাবাজদের আক্রমণে পড়ে। ওভার নাইট সুদের হার ৮% থেকে এক লাফে ৪০% এ উঠে যায়। কুয়ালালামপুর স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ১২০০ এর ওপর থেকে ৬০০ নেমে আসে এবং রিঙ্গিতের মূল্য ৫০% অবমূল্যায়ন করতে হয়; অর্থাৎ ১ মা. ডলারের মূল্য যেখানে ছিল ২.৫০ রিঙ্গিত সেখানে ১ মা. ডলারের মূল্য দাঁড়ায় ৪.৫৭ রিঙ্গিত (জানু ২৩, ১৯৯৮)। বহু বছরের মধ্যে ১৯৯৮ সালে প্রথম মন্দা দেখা দেয় এবং প্রকৃত অর্থনীতিতে (real economy) উৎপাদন, বিশেষ করে, নির্মাণ খাতে ২৩.৫%, শিল্পখাতে ৯% এবং কৃষি খাতে ৫.৯% হ্রাস পায়। এ বছর রিঙ্গিতের মূল্য নেমে আসে ৪.৭; আর কুয়ালালামপুর স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ২৭০ এর নিচে পড়ে যায়।

www.icsbook.info

সিঙ্গাপুর ঃ সিঙ্গাপুর অর্থনীতির ওপর মন্দার আঘাত ছিল মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী। দেশের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ ক্রমান্বয়ে ২০% পর্যন্ত মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে। শিল্প-কারখানায় শ্রম ব্যয় হ্রাসকল্পে জাতীয় মজুরী কাউন্সিল পূর্বাহ্ণেই কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তনে সম্মত হয়। শেয়ার বাজারে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে Straits Times Index অনুমোদন করা হয় যাতে সূচক মাত্র ৬০% নিচে নামে। এক বছরেরও কম সময়ে অর্থনীতি সম্পূর্ণ মন্দামুক্ত হয়।

চায়না ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় সংকটকালে চায়না মোটামুটি অক্ষত ছিল বলা যায়। তবে ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি সামান্য মন্থর হয়ে পড়েছিল। আর সেটাও ছিল অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সমস্যার দরুন।

জাপান ঃ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে জাপান সর্ববৃহৎ অর্থনীতির অধিকারী এবং প্রায় সবকটি এশীয় দেশেরই জাপানের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বিদ্যমান। জাপানের মোট রফতানির প্রায় ৪০% যায় এশীয় দেশগুলোতে। সুতরাং এসব দেশের সংকট জাপানকে স্পর্শ না করে পারে না।

আঘাতে জাপানী ইয়েন ১৪৭-এ নেমে আসে। কিন্তু এসময়ে জাপানের রিজার্ভ ছিল বিশ্বের সকল দেশের চেয়ে বেশি। ফলে জাপান সরকার সহজেই পরিস্থিতি সামাল দেয় এবং তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে। হঠাৎ করে ১৯৯৭ সালে জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হার ৫% থেকে ১.৬% নেমে আসে। এমনকি, ১৯৯৮ সালে মন্দায় রূপ নেয় এবং বহু কারবার দেউলিয়াত্বের শিকার হয়।

এশিয়ার বাইরে

যুক্তরাষ্ট্র ঃ এশীয় সংকটের হাওয়া যুক্তরাষ্ট্রেও লেগে যায়। এ দেশের বাজারে ধস না নামলেও ১৯৯৭ সালের ২৭ অক্টোবর 'ডো জোনস' শিল্প সূচক ৫৫৪ পয়েন্ট বা ৭.২% নেমে যায়। এছাড়া ভোক্তা ব্যয়ের আস্থা হ্রাস পায়। পরোক্ষভাবে এশীয় সংকটের প্রভাব 'ডট-কম বাবল' এবং পরবর্তী 'হাউজিং বাবল' ও 'সাবপ্রাইম মর্টগেজ' সংকটের ওপর গিয়ে পড়ে।

অন্যান্য দেশ

এশীয় আর্থিক সংকটের ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা উন্নয়নশীল দেশে ঋণ প্রদানে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে অনেক উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক মন্থরতা নেমে আসে। এছাড়া এ সংকটের প্রভাবে ১৯৯৮ সালে তেলের দাম বেরেল প্রতি ১১.০০ মা. ডলারে নেমে আসে। এতে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো আর্থিক চাপে পড়ে যায়। তাছাড়া তেলের এই মূল্য পতনের ফলে ১৯৯৮ সালে রুশীয় আর্থিক সংকট (Russian Financial Crisis) দেখা দেয় যার ফলে প্রকারান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি ব্যবস্থাপনা (Long-term Capital Management) প্রতি

www.icsbook.info

মাসে ৪.৬ বি. মা. ডলারে লোকসান দেয় এবং দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এছাড়া এশীয় আর্থিক সংকটের ফলে অগ্রসরমান অর্থনীতি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাও ১৯৯০ দশকের শেষে গিয়ে সংকটে নিপতিত হয়।

উপসংহার ঃ ফলাফল ঃ উল্লেখিত তথ্যে প্রতীয়মান হচ্ছে এশীয় আর্থিক সংকটের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মুদ্রামান হ্রাস করতে হয়েছে; শেয়ার, স্টক ও অন্যান্য সম্পদ বাজারে ধস নেমেছে; এবং আসিয়ান দেশসমূহে জিডিপি ১৯৯৭ সালে ৯.২ বি. মা. ডলার এবং ১৯৯৮ সালে ২১৮.২ বি. মা. ডলার কমে গেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে বহু কারবার দেউলিয়ার শিকার হয়েছে, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে এসেছে। এশিয়ার ব্যাঘ্রগুলোর থাবার ধার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

গ) বিশ্ব আর্থিক সংকট ঃ ২০০৭-২০১০

২০০৭-২০১০-এর মন্দায় কম-বেশি সকল দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্স বুলেটিনের মতে, ইউক্রেইন, আর্জেন্টিনা ও জামাইকার ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, মেক্সিকো, হাঙ্গেরী, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ; যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য, চায়না, জাপান, ভারত, ইরান, পেরু ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষতি হয়েছে কম।

অর্থনীতির এমন খাত নেই যেখানে এ মন্দা আঘাত হানেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন, আর্থিক বাজার, ব্যাংক, বীমা, ভ্রমণ, শ্রম বাজার, ক্ষুদ্র-ব্যবসায়িক ঋণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সংকোচন ও মন্দা ভীষণ রূপ নেয়। নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

১) ব্যবসা-বাণিজ্যঃ ২০০৮ সালের মধ্য অক্টোবরে এক সপ্তাহের মধ্যে বাল্টিক ড্রাই ইন্ডেক্স (a measure of shipping volume) ৫০% নীচে নেমে যায়। এ সময়ে ব্যাংকগুলোয় ঋণ সংকোচনের ফলে ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণপত্র খোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রফতানিমুখী শিল্পসমূহে উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ২০০৮ জানুয়ারী থেকে ২০০৯ জানুয়ারীর মধ্যে জাপানে ৩১%, কোরিয়ায় ২৬%, রাশিয়ায় ১৬%, ব্রাজিলে ১৫%, ইটালিতে ১৪%, জার্মানীতে ১২% উৎপাদন (GDP) কম হয়। এ সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু কারবার ও শিল্প প্রতিষ্ঠান অতি স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয় যা মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও চীনের ক্রেতারা কিনে নেয়।

২) চাকরীচ্যুতি ঃ আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO)-এর মতে, এ সংকটকালে, বিশেষ করে নির্মাণ শিল্প, রিয়েল এস্টেট, আর্থিক সেবা এবং অটোখাতে ২০ মি. শ্রমজীবী তাদের চাকরী হারায়। এর ফলে প্রথম বারের মত বিশ্বে বেকারের সংখ্যা ২০০ মি. পৌঁছে যায়।

www.icsbook.info

২০০৭ এ ডিসেম্বরে আমেরিকার বেকারত্বের হার ছিল ৪.৯%। কিন্তু ২০০৯-এর অক্টোবরে এ হার ১০.১%-এ উঠে যায়। খণ্ডকালীন ও অন্যান্য সাময়িক বেকার শ্রমিকদেরসহ এ হার দাঁড়ায় ১৬.৩%। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে বেকারত্বের হার প্রায় একই রূপ ছিল। তবে কয়েকটি দেশে মন্দার ধাক্কা বেশি লাগায় সেখানে বেশি সংখ্যক শ্রমিককে চাকরী হারাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সালের মে মাসে স্পেনে বেকারের হার দাঁড়ায় ১৮.৭%। মন্দায় একমাত্র আমেরিকাতে মজুরীর ক্ষতি হয় ৩৬০ বি. মা. ডলার; গড়ে পরিবার প্রতি লোকসান দাঁড়ায় ৩,২৫০ মা. ডলার।[২]

৩) **আর্থিক বাজার ঃ** ২০০৮-এর ২১ জানুয়ারী সোমবার বিশ্ব শেয়ার বাজারে ধস নামে। পত্র-পত্রিকায় এ দিনটিকে কালো সোমবার আখ্যায়িত করা হয়। এই দিন যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে ব্যাপক দর পতন হয় এবং পরদিন কিছুটা কম হলেও এ পতন চলতে থাকে। সাংহাই শেয়ার বাজারেও এর ধাক্কা লাগে। ফলে সাংহাই কম্পোজিট ইনডেক্স ৫.১৪% নিচে নেমে যায়। কোন কোন কোম্পানীর শেয়ারে এই পতন আরও বেশি হয়; যেমন Ping An Insurance ১০% এবং China Life ৮.৭৬% মূল্য হারায়। ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী স্টক মার্কেটে কয়েকবার করে ধস নামে; একবার জানুয়ারীতে, একবার আগস্টে, একবার সেপ্টেম্বরে এবং আর একবার অক্টোবরের প্রথম দিকে। এ সালের অক্টোবরের আঘাতে উত্তর আমেরিকায় ইউরোপ ও এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় ৩০% মূল্য পতন হয়। আর Dow Jones Industrial Averages ৩৭% দর হারায়। তেলের দাম বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন রাশিয়ায় পূর্ব থেকেই স্টক বাজার নেমে আসছিল; অতঃপর এ আঘাতে তা ১০% পড়ে যায়। অন্যান্য উন্নয়নশীল বাজারগুলোও লোকসান দিতে বাধ্য হয়। ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ব্ল্যাকস্টোন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী অফিসার Stephen Sehwarzman বলেন, "বিগত এক থেকে দেড় বছরে বিশ্ব সম্পদের প্রায় ৪৫% ধ্বংস (written off) হয়ে গেছে।" (NEWS.com.au., March 11, 2009)

৪) **ব্যাংকিং খাত ঃ** ২০০৭-২০১১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট ৩৯৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়। এসব ব্যাংকের মোট সম্পদের (asset) পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৭৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট ডিপোজিট ছিল ৪৮১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আন্তর্জাতিক ঋণের অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে যুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধের তিরিশ বছর পর বিশ্বের ২৮টি দেশের ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৭,৭৪১,৫৪৭,০০০ আমেরিকান ডলার। এই ঋণের প্রধান দাতা ছিল আমেরিকা। এ ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় গ্রহীতা

---

[২]. Phillip Swaget, *The cost of the Financial Crisis: The Impact of the September 2008 Economic Collapse from Interest.*

www.icsbook.info

দেশের সাথে আমেরিকার সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে এই ঋণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ হ্যারল্ড জি, মোল্টন এবং তার সাথী লিও পসভস্কি মন্তব্য করেছেন যে, যুদ্ধকালে প্রদত্ত আন্তঃসরকারী ঋণ আদায় করা হলে তা দাতা দেশসমূহের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, বরং ক্ষতি বয়ে আনবে। অপরদিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণসহ যাবতীয় ঋণ মওকুফ করা হলে, তা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত নয়, বরং ত্বরান্বিত করবে। তারা আরও লিখেছেন যে, যুদ্ধ-ঋণের মৌলিক অর্থনৈতিক তাৎপর্য অতি স্পষ্ট। যুদ্ধ ঋণের সাকল্য অর্থ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় ব্যয় করা হয়েছে, এর দ্বারা উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন আদৌ হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত ঋণ আদায় বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিঘ্নিত করেছে।[৩]

বস্তুতঃ যুদ্ধ-ঋণ বিশ্ব অর্থনীতিতে উদ্যম ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বিনষ্ট করে বিশ্বে সৃষ্ট নজীরবিহীন মহামন্দাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। যুদ্ধ-ঋণের পরিমাণ ছিল বিরাট। ঋণগ্রহীতাদের পরিশোধ-ক্ষমতার মধ্যে আনার জন্য বারবার এ ঋণ বিন্যাস করা হয়। অবশেষে ১৯৩১ সালে প্রেসিডেন্ট হুভার এ ঋণ স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ১৯৩৫ সালে হিটলার ক্ষমতায় এসে সকল ঋণ অস্বীকার করেন।

ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায়, সুদখোরদের অর্থলিপ্সা বিশ্বের বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেছে। জি, ফেরো তাঁর 'দি গ্রেটনেস এন্ড ডিক্লাইন অব রোম' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন সুদখোরদের অশুভ তৎপরতা কিভাবে রোম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে। তিনি বলেন, "Italian society had become an inextricable labyrinth of debt and credit, through the agency of "Syngraphac' or letters of credit, which were renewed as soon as they fell due, they were negotiated in the same way as securities and bills of exchange to-day, because the scarcity of capital relative to the debt-structure and the frequent oscillation in prices should have made it ruinous for them to be renewed frequently. The desperate competition for wealth in which all Italy was engaged .....(all which ended) as it seems that all such competition will always end, in a gigantic accumulation of vested interests which it needed nothing less than a cataclysm, to break down. The empire was broken by usurers and usury."[৪] "ঋণপত্র সম্পাদনকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ইতালীয় সমাজ ঋণ ও দায়ের অলংঘনীয় এক গোলকধাঁধার অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছিল। এই এজেন্সিগুলোর কাজ ছিল মেয়াদপূর্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে দিয়ে সেগুলো স্বাক্ষর করিয়ে নবায়ন করানো। আজকের

৩. মোলট্ন ও পসভস্কি: *ওয়ার ডেটস এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রসপ্যারিটি*, উদ্ধৃত করেছেন, ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট, পৃঃ ১৬১।

২. ড.. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী: *ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট*, পৃঃ ১৬৬।

www.icsbook.info

দিনে সিকিউরিটিজ ও বিল অব এক্সচেঞ্জ যেভাবে লেনদেন হয় তখনকার দিনেও একইভাবে ঋণপত্রসমূহ সম্পাদিত হতো। দায় কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট মূলধনের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ঘনঘন মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে এগুলো নবায়ন না হলে অধমর্ণের জন্য তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারতো। ইতালীতে সকলেই সম্পদ অর্জনের বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়েছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিশাল কায়েমী স্বার্থের সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটতো, একটি মহা প্রলয় ছাড়া যাকে আর কোন কিছুই ধ্বংস করতে পারতো না। চড়া সুদের লেনদেন ও সম্পদের অন্যায় ভক্ষণ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। বস্তুতঃ সুদখোর ও সুদই এ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে।"

সুদী ঋণের এই ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে আর্থার কিনস্টন বলেছেন, "I am against usury in every form. Usury has been the curse of the world from the beginning; it has broken other empires than this, and it is going to break this empire. There is not a single great moral or religious teacher who has not denounced it.[৫] "আমি সকল ধরনের সুদের (ইউসারী) বিরুদ্ধে। প্রথম থেকেই ইউসারী বিশ্বের জন্য এক মহা অভিশাপ হয়ে উঠেছে; সুদ অন্যান্য সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে আর এখন এই সাম্রাজ্যকেও ধ্বংস করতে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এমন কোন নৈতিক বা ধর্মীয় বড় শিক্ষক নেই যিনি সুদের নিন্দা করেননি।"

Napoleon's love story'-এর লেখক ম্যাকনায়ার উইলসন ফরাসী সাম্রাজ্য ও নেপোলিয়নের পতনের জন্য সুদের প্রভাবকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, "It cannot be too strongly insisted that finance and not territorial aggrandizement is the key to Napoleon's ruin. Had the French Emperor consented to abandon his financial system in favour of the system of London that is, in favour of the loans by the money market– he could have had peace at any time."[৬] "একথা অতি জোর দিয়ে বলা যায় যে, দেশজয়ের উচ্চাভিলাষ নয়; বরং অর্থই নেপোলিয়ানের ধ্বংসের কারণ। ফরাসী সম্রাট যদি লন্ডনের অর্থ ব্যবস্থার পক্ষে তথা অর্থ বাজারে ঋণ পদ্ধতির পক্ষে নিজেদের অর্থ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে সম্মত হতেন, তাহলে যে কোন সময়ে নেপোলিয়ান শান্তিচুক্তি সম্পাদনে সম্মত হতেন।"

সুদী ঋণ ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ধ্বংস করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সুদ ধনী দেশের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি, এমনকি, বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তদানীন্তন 'লীগ অব নেশনস'-এর নিয়ন্ত্রণে দানিয়ুব ও বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহে সুদী ঋণ দেয়া হয়েছিল। ত্রিশ দশকের মহামন্দার সময় সেসব দেশের সরকারকে আরও অধিক হারে ট্যাক্স ধার্য করতে বাধ্য করা হয়। মানুষের

৫. উপরোক্ত, পৃঃ ১৬৮-১৬৯।
৬. উপরোক্ত, পৃঃ ১১৬।

www.icsbook.info

দুর্দশা ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। বর্তমানে সুদী ঋণ ব্যবস্থার ফলে উত্তরের কয়েকটি ধনী দেশের সাথে দক্ষিণের বিপুল সংখ্যক দেশের বৈষম্য ক্রমেই বেড়েছে। এই অবস্থা বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মন্তব্য

সমগ্র আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ 'সুদ খাওয়া' বলেছেন। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, জুয়া, ঘুষ, জবর দখল– এ সবই হচ্ছে পরের সম্পদ বিনামূল্যে খাওয়া, গ্রাস করা, ভক্ষণ করা, হরণ করা, আত্মসাৎ করা। মানুষ এসবকে ঘৃণা করে, সামাজিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় মনে করে। এসব অন্যায় ভক্ষণের বিরুদ্ধে আইন আছে, শাস্তির ব্যবস্থাও আছে। সমাজে এসব অন্যায় ভক্ষণ বেড়ে গেলে জনগণ হৈচৈ করে, সুশীল সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠে, মিডিয়া তৎপর হয়, সংবাদপত্র লেখালেখি করে, রাজনীতির মাঠ গরম হয়, মিটিং, মিছিল, শ্লোগানমুখর হয়ে উঠে, আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়, কখনও কখনও সরকারের পতনও ঘটে। সুদ এগুলোর চেয়ে আরও মারাত্মক শোষণ ও জুলুম; সুদের ধ্বংস অধিকতর ব্যাপক, বিস্তৃত ও সাংঘাতিক। দুনিয়ায় এমন কোন ধর্ম নেই যা সুদকে নিষিদ্ধ করেনি, উল্লেখযোগ্য কোন দার্শনিক নেই যিনি সুদের নিন্দা করেননি; এমন কোন অর্থনীতিবিদ নেই যিনি সুদকে ভাল বলেছেন। জনগণ সুদকে ঘৃণা করে, সুদখোরদের গালি দেয়, শোষক বলে। এতদসত্ত্বেও সুদ চলছে, বিস্তৃত হচ্ছে, জনগণকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিচ্ছে। সুদ ছাড়া অর্থনীতি চলে না, সুদ উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে প্রচারণা ব্যাপকতর হচ্ছে। সুদের পক্ষে নতুন নতুন আইন তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কেন এমন বৈপরীত্য- Double standard ?

কারণ চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানির মাধ্যমে বিত্তশালীদের সম্পদ খায় নিঃস্ব-গরীবরা। এদের না আছে ধনের জোর, আর না প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাদের পক্ষে সমাজ ও আইনকে প্রভাবিত করার কোন হাতিয়ারই তাদের নেই। তাই সমাজ তাদের বিরুদ্ধে, আর আইন তাদের বিপক্ষে। কিন্তু সুদ খায় পুঁজিপতিরা। গোল্ডস্মিথ থেকে শুরু করে মহাজন, আর মহাজনদের যৌথ কোম্পানী ব্যাংকগুলোই সুদখোর ও সুদের বড় বড় কারবারী। এদের পুঁজি আছে, আছে পুঁজির প্রভাব; রাজনীতি, রাজনৈতিক দল এদের হাতের তলায়, সরকার, মন্ত্রী, এমপি, পার্লামেন্টে তারাই। গবেষণা তাদের অর্থে, তাদের মতেই চলে; মিডিয়া-পত্র-পত্রিকা তাদেরই হাতে। সুতরাং যারা সুদ খায়, শোষণ করে, তারা সুদকে শোষণ বলবে, শোষণের বিরুদ্ধে আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা করবে, তা হয় না। কিন্তু সুদের ধ্বংস পুঁজিপতিদেরও ছাড়ে না। তাই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। শোষণ-ধ্বংসের পথ ছেড়ে বিনিয়োগ-উৎপাদনের পথে চলতে হবে; এতেই উন্নতি, এতেই কল্যাণ। ইসলামী ব্যাংকিং আশার আলো দেখিয়েছে। কিন্তু পুঁজির ছোবল ফণা তুলে আছে চারদিকে, ভেতরে-বাইরে, ওপরে-নিচেও। সাবধান! সাবধান! শোষণের অবসানে আল্লাহ সকলকে সাহায্য করুন। আমীন!

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট-১

১. ব্যাংকিং সংকটের তালিকা

১৮শ শতক

- ১৭৬৩– আমস্টারডাম ব্যাংকিং সংকট: আমস্টারডামে "Leendert Pieter de Neufville" ব্যাংক পতনের মাধ্যমে বিপর্যয় শুরু হয় এবং জার্মানী ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।
- ১৭৭২-১৭৭৩– লন্ডন ও আমস্টারডাম ব্যাংকিং সংকট: লন্ডন ও আমস্টারডামের "Neal" James, Fordyee ও Down ব্যাংকগুলোর পতন হয়।
- ১৭৯২– ব্যাংকিং আতঙ্ক।
- ১৭৯৬-১৭৯৭– ব্যাংকিং আতঙ্ক।

১৯শ শতক

- ১৮১৯– আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতনের সাথে মন্দা দেখা দেয়।
- ১৮২৫– আতঙ্ক : যুক্তরাজ্যে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়; অনেকগুলো ব্যাংক দেউলিয়া হয়। এমনকি, Bank of England-ও পতনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।
- ১৮৩৭– আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতনের মাধ্যমে মন্দা সৃষ্টি হয়; পরবর্তী ৫ বছর মন্দা চলতে থাকে।
- ১৮৪৭– ব্যাংকিং আতঙ্ক :
- ১৮৫৭– ব্যাংকিং আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতন ও মন্দা সৃষ্টি হয়।
- ১৮৬৬-ব্যাংকিং আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতন ও মন্দা সৃষ্টি হয়।
- ১৮৭৩-ব্যাংকিং আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতনের সাথে মন্দা সৃষ্টি হয় এবং এ মন্দা ৪ বছর স্থায়ী হয়।
- ১৮৮৪– ব্যাংকিং আতঙ্ক :
- ১৮৯০– ব্যাংকিং আতঙ্ক :

- ১৮৯৩– ব্যাংকিং আতঙ্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক দেউলিয়া হয় ও মন্দা দেখা দেয়।
- ১৮৯৩- ব্যাংকিং আতঙ্ক : অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাংকিং খাতে সংকট দেখা দেয়।

বিংশ শতক

- ১৯০৭ : যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতনের সাথে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।
- ১৯২৯-১৯৩৯ : বিংশ শতকের মহামন্দা (Great Depression)
- ১৯৭৩-১৯৭৫ : যুক্তরাজ্যে সেকেন্ডারী ব্যাংকিং সংকট সৃষ্টি হয়।
- ১৯৮৬-২০০৩ : জাপানী asset বাজারে সৃষ্ট বুদ্‌বুদ্‌ (asset price bubble)
- ১৯৮০-১৯৯০ : যুক্তরাষ্ট্রে দুই দশক ব্যাপী স্থায়ী সঞ্চয় ও ঋণ সংকট দেখা দেয়।
- ১৯৯০-এর দশক : ফিনল্যান্ডে ব্যাংকিং সংকট দেখা দেয়।
- ১৯৯০-এর দশক : সুইডেনে ব্যাংকিং সংকট হয়।
- ১৯৯৪ : ভেনিজুয়েলায় ব্যাংকিং বিপর্যয় হয়।
- ১৯৯৭ : এশিয়ায় আর্থিক বিপর্যয় ঘটে।
- ১৯৯৮ : যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ে।
- ১৯৯৮ : রাশিয়ায় আর্থিক সংকট হয়।
- ১৯৯৯-২০০২ : আর্জেন্টিনায় অর্থনৈতিক সংকট হয়।
- ১৯৯৮-১৯৯৯ : ইকুয়েডোরে ব্যাংকিং বিপর্যয় ঘটে।

একবিংশ শতক

- ২০০২ : উরুগুয়ে ব্যাংকিং সংকট।
- ২০০০ দশকের শেষার্ধে নিম্নের সংকটসহ ব্যাপক আর্থিক সংকট-বিপর্যয় দেখা দেয়ঃ

- ২০০৭ : যুক্তরাষ্ট্রে subprime mortgage সংকট হয়।
- ২০০৮ : যুক্তরাজ্যে ব্যাংক উদ্ধার প্যাকেজ (bank rescue package)
- ২০০৮-২০০৯ : বেলজিয়ামে আর্থিক সংকট হয়।
- ২০০৮-২০০৯ : আইসল্যান্ডে আর্থিক সংকট হয়।
- ২০০৮-২০০৯ : রাশিয়ায় আর্থিক সংকট হয়।
- ২০০৮-২০০৯ : স্পেইনে আর্থিক সংকট হয়।
- ২০০৮-২০০৯ : ইউক্রেনে আর্থিক সংকট হয়।
- ২০০৮-২০১১ : আয়ারল্যান্ডে ব্যাংকিং সংকট হয়।

(সূত্র: Laeven L. Valencia F (2008) (PDF). Systematic Banking Crisis: a new database.)

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট-২

অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দার তালিকা

তৃতীয় শতক

- ২৩৪-২৮৪ সাল—রোম সাম্রাজ্যের সংকট : ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে; সাম্রাজ্য পণ্য বিনিময় প্রথা ভিত্তিক প্রাকৃতিক অর্থনীতিতে (natural economy) প্রত্যাবর্তন করে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

১৪শ শতক

- ১৪শ শতকের ব্যাংকিং সংকট: (১৩৪৫ সালে পেরুজী এবং বারদি ফ্যামিলি কম্পেগনিয়া ডি বারদি-এর পতন)।

১৭শ শতক

- ১৬৩৭- টিউলিপ ম্যানিয়া।

১৮শ শতক

- ১৭২০- সাউথ সী বাবল (South Sea bubbles)
- ১৭৭২- এর সংকট।
- ১৭৯২-এর সংকট।
- ১৭৯২-এর আতঙ্ক।
- ১৭৯৬-১৭৯৭-এর আতঙ্ক।

১৯শ শতক

- নেপোলিয়ানোত্তর মন্দা;
- ১৮১৩- ড্যানিশ রাষ্ট্রীয় দেউলিয়াত্ব;
- ১৮১৯- যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা, ব্যাংক পতন;
- ১৮২৫- যুক্তরাজ্যে ব্যাপক মন্দা, বহু সংখ্যক ব্যাংকের পতন;
- ১৮৩৭- যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা, ব্যাংক পতন, ৫-বছর স্থায়ী মন্দা;
- ১৮৪৭-এর আতঙ্ক;
- ১৮৫৭-এর আতঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা, ব্যাংক পতন;
- ১৮৬৬-এর আতঙ্ক;
- ১৮৭৩-১৮৯৬- দীর্ঘ স্থায়ী মন্দা;
  - ১৮৭৩- যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক পতন, ৪ বছর স্থায়ী মন্দা;
  - ১৮৮৪-এর আতঙ্ক;
  - ১৮৯০-এর আতঙ্ক;
  - ১৮৯৩- যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা, ব্যাংক পতন;
  - ১৮৯৩- অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাংকিং সংকট।

www.icsbook.info

২০শ শতক

- ১৯০৭ : যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাংক পতন।
- ১৯২৯ : ওয়ালস্ট্রীট বিপর্যয়।
- ১৯২৯-১৯৩৯ : বিশ্বব্যাপী মহামন্দা (Great Depression)।
  : ওপেক তেলমূল্যাঘাত (Shock)।
- ১৯৭৩-১৯৭৫ : যুক্তরাজ্যে সেকেন্ডারী ব্যাংকিং সংকট।
- ১৯৮৬-২০০৩ : জাপানে সম্পদ বাজারে বুদ্‌বুদ (Asset price bubble)।
- ১৯৮৩ : ইসরাঈলে ব্যাংক-স্টক সংকট (Bank stock crisis)।
- ১৯৮৭ : কালো সোমবার।
- ১৯৮০এর দশক—১৯৯০-এর দশক : যুক্তরাষ্ট্রে সঞ্চয় ও ঋণ সংকট।
- ১৯৯০-এর দশক : ফিনল্যান্ড ব্যাংকিং সংকট।
- ১৯৯০-এর দশক : সুইডেন ব্যাংকিং সংকট।
- ১৯৯৪ : মেক্সিকো অর্থনৈতিক সংকট।
- ১৯৯৭ : এশীয় আর্থিক বিপর্যয়।
- ১৯৯৮ : যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজি ব্যবস্থাপনা বিপর্যয়।
- ১৯৯৮ : রুশীয় আর্থিক সংকট।
- ১৯৯৯-২০০২ : আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক সংকট।

২১শ শতক

- ২০০৭-২০১০ : এশীয় আর্থিক সংকট;
- ২০০৮-২০০৯ : আইসল্যান্ড আর্থিক সংকট;
- ২০০৮-১০ : আয়ারল্যান্ড ব্যাংকিং সংকট;
- ২০০৮-২০০৯ : রাশিয়া আর্থিক সংকট;
- ২০১০ : পর্তুগাল ও গ্রীস ঋণ সংকট।

(সূত্র: Galbraith, J. K. (1990), *A Short History of Financial Euphoria*, New York, Penguin Books, ISBN 0-670-85028-4.)

www.icsbook.info